সমগ্র কিশোর-সাহিত্য

চতুর্থ খণ্ড

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex Inc., email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.11.08 20:48:39 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

সূচী

ঘোড়ামামার অবদান ৯
স্বয়ং তিনিই ১২
সদা হাস্যমুখে থাকিবে ১৬
বল্টুদার উৎসাহ লাভ ১৯
গজকেষ্টবাবুর হাসি ২৫
সাহেবের উপহার ৩০
দি গ্রেট ছাঁটাই ৩৪
অন্যমনস্ক চোর ৪০
লঙ্কানাথম কটুসুন্দরম ৪৪
ঘণ্টাদার কাবলুকাকা ৪৮
জার্নি বাই কার ৫২
টিকেট ৫৪
পরের পয়সায় ৫৭
পিসেমশায়ের মামার গল্প ৬১
কবিতার জন্ম ৬৩
শয়তানের সাঁকো ৬৮
ঘোড়ামামার কাটলেট ৭২
খাঁড়ামশাই ৭৭
নাম রহস্য ৮১
রচনার রহস্য ৮৬
হাতে হাতেই ৯০
হরিদাস আর নীল মাছি ৯৪
একদিনের উপোস ১০০
প্রতিদ্বন্দ্বী ১০২
হলদে বাস ১০৪
লাল ঘোড়া ১০৯
সেই ছেলেটা ১১৭
ক্রিকেট মানে ঝিঁঝি ১২০
করিম মিঞা ১২৫
ডক্টর জাকির হোসেন (স্মৃতিকথা) ১২৮
ছোটবেলার স্মৃতি (আত্মজীবনী) ১২৯
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ১৩৬

ঘোড়ামামার অবদান

সেদিন রাস্তায় বেরিয়েই আমার ঘোড়া-মামার সঙ্গে দেখা হল। ঘোড়া-মামা আসলে কারো মামা নন, তাঁর কোনো ভগ্নে-টাগ্নেকে আমরা কোনদিন দেখিনি ; আর ঘোড়া তো তিনি নিশ্চয়ই নন, কারণ খুরওয়ালা চারটে পা তাঁর নেই, তিনি কখনো চিহিঁ চিহিঁ করেও ডাকেন না। তবু সবাই তাঁকে সামনে মামা বলে, আড়ালে 'ঘোড়া-মামা' বলে ডাকে।

ঘোড়া-মামা রাস্তা থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন। সেটা কাঁধের একটা থলের মধ্যে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর আমাকে বললেন, 'এই যে পেলারাম, কী বেপার ?'

ঘোড়া-মামার জিভে একটু গণ্ডগোল আছে। 'চ্যাঁচানা'-কে বলে 'চিঁচানো','হাতি'কে বলেন 'হেতি', 'বিউটি'-কে বলেন 'বেউটি'। লোকটি যে খুব খারাপ তা নন, কিন্তু দুটো ব্যাপারে তাঁর একটু স্বাধীন মতামত আছে। এক নম্বর—কখনো দাড়ি কামাবেন না আর চান করবেন না, কারণ দাড়ি নাকি মুখের 'বেউটি'—'ঝিমোন পাতায় ঢাকা গোলাপ ফুল।' তাঁর মুখ গোলাপ ফুলের মতো কিনা তা নিয়ে আলোচনা করে অবশ্য লাভ নেই—কিন্তু একরাশ ঝব্বু দাড়িতে তাঁকে যা দেখায় সে আর কী বলব। আর চান করলে ? ঘোড়া-মামা বলেন, 'একটা গামছা তিনদিন জলে ভিজিয়ে রাখলে কী হয় ? পচে যায়। তিমনি রোজ চান করলে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোক্ষম যুক্তি—সন্দেহ কী !

ঘোড়া-মামার দু' নম্বর কাজ হল, রোজ সকালে থলে কাঁধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া। শ্যামবাজারে শুরু করেন, এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত আসেন, কখনো কখনো ভবানীপুর পর্যন্ত এগিয়ে যান। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, রাস্তা থেকে এটা-ওটা কুড়োতে থাকেন। যেমন সিগারেটের খালি বাক্স, জুতোর সোল, টিনের চাকতি, আলপিন, পেরেক, ছেঁড়া দড়ি—আরো নানারকম।

আমরা জিজ্ঞেস করি : 'ঘো—সরি মামা, এসব করেন কেন ?'

উত্তরে মামা বলেন, 'লোকে না বুঝে কত দরকারী জিনিস ফেলে দেয়। আমি কুড়িয়ে জমা করি। কখন কী কাজে লাগে কে জানে !'

'তাই বলে জুতোর সোল ?'

'হেঁ-হেঁ—জুতোর সোল ! আজ জুতোর সোল পেলাম, কাল খানিক চামড়া পাব, পরশু একটা ফিতে পাব, ঘরে অনেক পিরেক আছে, তাই দিয়ে ঠুকে লাগিয়ে নেব। ব্যাস, বিনি পয়সায় জুতো হয়ে যাবে। বুঝলে না পেলারাম ?'

এ বোঝা আর শক্ত কী ! কিন্তু এভাবে কবে যে এক জোড়া সম্পূর্ণ জুতো তৈরি হবে, মানে ঘোড়া-মামার সারা জীবনেও সেটা সম্ভব হবে কিনা—এসব কথাও যে মনে আসে না তা নয়। ঘোড়ামামাকে অবশ্য তা বলা যাবে না, তর্ক তিনি একদম পছন্দ করেন না।

তিনবার ক্লাস সেভেনে ফেল করেও খাওয়ার ভাবনা ঘোড়া-মামার নেই। তাঁর বাবা খানতিনেক বাড়ী রেখে গেছেন শ্যামপুকুরে, তার ভাড়া থেকেই তাঁর চলে। কাজেই নিশ্চিন্তে কলকাতার রাস্তায় তিনি দরকারী জিনিস কুড়িয়ে বেড়ান আর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেগুলি জমা করেন।

আজও ঘোড়া-মামা পথে বেরিয়েছিলেন। আমাকে দেখে বিকট দাড়ির ভেতর থেকে তাঁর

www.boiRboi.blogspot.com

সেই গোলাপ ফুলের মতো মুখে, একটা বত্রিশ ইঞ্চি হাসি ফুটে বেরুল।

—কোথায় যাচ্ছ পেলারাম ?

বললুম, আমার বন্ধু হাবুল সেনের ওখানে।

—হেঁঃ, হেবুল সেন ! গিয়ে তো খালি আড্ডা দিবে।

বললুম, তা এই ছুটির দিনে একটু গল্প-টল্প—

—গোল্‌পো ? গোল্‌পো আবার কি ?—ঘোড়া-মামা আমাকে ধিক্কার দিলেন : গোল্‌পো তো ছোট ছোট ছিলেমেয়েরা শোনে। কাজ করো—কাজ। লেইফ্ ইজ শর্ট এণ্ড—এণ্ড—

আমি আন্দাজে বাকীটা জুড়ে দিলুম : ওয়ার্ক ইজ লং।

—হেঁ—লং। ডেরি লং। এস্‌প্ল্যানেড্ পর্যন্ত। চলো আমার সঙ্গে। আজ আর তোমায় ছাড়ব না।

এই সেরেছে ! ঘোড়া-মামার পাল্লায় পড়লে কারো যে আর ছাড়ান নেই, সে আমি হাড়ে হাড়ে জানি। একবার আমাদের পাড়ার ভজা ওরফে ভজসত্য ভাদুড়ী ঘোড়া-মামার প্যাঁচে পড়ে যে কী নাজেহাল হয়েছিল, সে কথা মনে করে ভজা তো এখনো কাঁদেই, আমাদেরও কান্না পায়। আমি তিন পা পিছিয়ে গিয়ে বললুম, আমার ভারী খিদে পেয়েছে ঘোড়া-মামা। হাবুল আমায় খাওয়াবে।

—হেঁ, কী খাওয়াবে তোমাকে হেবুল সেন ? আমি খাওয়াব— যত চাও, তত খাওয়াব। কী রাজী ?

ঘোড়া-মামা খাওয়াবে ? শুনে, আমার চোখ তড়াং করে কপালে লাফিয়ে উঠল। আজ পর্যন্ত দু' পয়সার চীনে বাদামও তো কাউকে খাইয়েছে বলে শুনিনি।

আমি বললুম, কী খাওয়াবেন ঘো—মানে মামা ? চপ-কাটলেট ?

—ছেঃ, চোপ্-কেটলেট ! কী থাকে চোপ-কেটলেটে ? পোচা মাংস—খেলেই অসুখ করে। রসগোল্লা খাবে ?

আমি বললুম, আলবাৎ খাব।

—কৈঁচাগোল্লা ?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাঁচাগোল্লাও আমি খুব পছন্দ করি।

—তালশাঁস সন্দেশ ?

আমি সুড়ুৎ করে জিভে খানিকটা জল টেনে বললুম, খুব খাই মামা, পেলেই খাই।

—পাবে, পাবে, সোব পাবে। আচ্ছা, ছেনার জিলিপি ?

এবার আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করল। ঘোড়া-মামা যদি মাঝে মাঝে চান করতেন আর ওঁর গায়ে ও-রকম গন্ধ না থাকত, তাহলে আমি দু-হাতে মামাকে জাপটে ধরতুম। বললুম, বললে বিশ্বাস করবেন না মামা, ছানার জিলিপি খাওয়ার জন্যে আমি সাত মাইল রাস্তা হেঁটে যেতে পারি !

ঘোড়া-মামা হাসলেন। একরাশ জংলা দাড়ির ভেতর তাঁর মুখখানাকে সত্যিই এবার গোলাপ ফুলের মতো 'বেউটিফুল' মনে হল আমার। ঘোড়া-মামা বললেন, তাহলে হাঁটো—হাঁটো আমার সঙ্গে। সব খেতে পাবে। বিনা কোষ্টে কি পাওয়া যায় হে পেলারাম ?

কিন্তু এখন এই পটলডাঙার মোড় থেকে রাস্তা কুড়োতে কুড়োতে এস্‌প্ল্যানেড্ পর্যন্ত হন্টন ! আমি মাথা চুলকে বললুম, মামা—কী বলে ইয়ে—মানে, আজকে ওয়ার্কটাকে একটু শর্ট করা যায় না ? মানে, বেশ খিদেও পেয়েছে—

ঘোড়া-মামা কট্ কট্ করে আমার দিকে চাইলেন। গম্ভীর মোটা গলায় বললেন, নো ওয়ার্ক, নো ইটিং—হেঁ-হেঁ- !

বুঝতে পারলুম, ঘোড়া-মামা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। কিন্তু রসগোল্লা, তালশাঁস সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, ছানার জিলিপি তখন আমার চোখের সামনে লাফাতে শুরু করেছে। এমন মওকা জীবনে ক'বার আসে ? একটু কষ্ট করলেই যদি—

আমি বললুম, চলুন ঘোড়া—আই মীন মামা—যা থাকে কপালে !

—কোপাল তোমার আজ খুবই ভালো হে, শিয়াল বাঁয়ে করে বেরিয়েছিলেন !—বলেই ঘোড়া-মামা খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরলেন : নাও টু এক্‌শন !

অ্যাকশন তো বটেই। দুজনে দেশলাইয়ের খাপ, ভাঙা টিনের বাক্স, কার একটা ফেলে দেওয়া টুথব্রাস, পেরেক, এইসব সমানে কুড়িয়ে যেতে লাগলুম। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভীষণ ঘেন্না করছিল, আরো খারাপ লাগছিল, যখন রাস্তার লোকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগল : কী মশাই, কী হারিয়েছে ?' আমি দু' একবার বলেওছিলুম, 'ঘোড়া-মামা, আজ বরং থাক, অনেক তো হল—' উত্তরে ঘোড়া-মামার এক জবাব : কোষ্টো ছাড়া কিষ্টো মিলে না হে পেলারাম, রসগোল্লা, ছেনার জিলিপি কি এতই সস্তা ?

শেষে পিঠ টন্ টন্ করতে লাগল, হাঁটু ব্যথা করতে লাগল, খিদেটা আরো বিচ্ছিরিভাবে পেটে মোচড় দিতে লাগল। আমি আর থাকতে না পেরে বললুম, ঘোড়া-মামা, কী লাভ হবে এসব কুড়িয়ে ?

ঘোড়া-মামার চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল। হাতের মুঠো খুলে বললে, কী দেখছ ?

—একটা ফাউন্টেন পেনের ভাঙা নিব।

—হেঁ, নিব। আজ নিব পেলাম, কাল বডি পাব, পরশু হয়তো ক্যাপটাই পেয়ে যাব। ব্যাস পুরো একটা ফেউন্টেন পেন হয়ে গেল।

আমি মাথা চুলকে বললুম, কিন্তু—

তোর্ক করো না পেলারাম—এক্‌শন !

অগত্যা আবার সেই অ্যাকশন ! সেই সন্দেশ কাঁচাগোল্লা-ছানার জিলিপির লোভে রাস্তায় যা পাচ্ছি কুড়োচ্ছি আর ঘোড়া-মামার ঝোলায় ভর্তি করে দিচ্ছি ! বাড়ী গিয়ে কার্বলিক সাবান মেখে চান করতে হবে, হাতে আবার একজিমা না হলে বাঁচি !

শেষ পর্যন্ত এস্‌প্ল্যানেড্।

তখন মাথা ঘুরছে—চোখে শর্ষের ফুল দেখছি, পিঠের ওপর তিনটে কুঁজ গজিয়েছে এমনি মনে হচ্ছে, পা দুটো যেন হাঁটু থেকে ছিড়ে পড়তে চাইছে, খিদের জ্বালায় পেটের ভেতর যেন তিরিশটা চামচিকে দাপাদাপি করছে। আমি ধপাস করে ফুটপাথেই বসে পড়লুম।

ঘোড়া-মামা সেই 'বেউটিফুল' মুখে এক গাল হেসে আমার পিঠে হাত রাখলেন।

—সাবাস পেলারাম, খুব খেটেছ। এইবার তোমার পুরিস্কার !

আমি বললুম, চলুন, শিগ্‌গীর চলুন ওই মিষ্টির দোকানে। খিদেয় মরে গেলুম !

—মিষ্টির দোকান ? কী হবে ?—ঝুলি থেকে পায়ে দড়ি বাঁধা কী একটা ছোট্ট প্রাণীকে টেনে বের করলেন ঘোড়া-মামা, সেটা শূন্যে তিড়িং তিড়িং করে নাচতে লাগল। একটা নেংটি ইঁদুর ! কখন কুড়িয়ে নিয়েছেন—কে জানে !

ঘোড়া-মামা বললেন, এই নাও। ইতেই সোব হয়ে যাবে !

তিনটে খাবি খেয়ে আমি বললুম : নেংটি ইঁদুর !

—নিশ্চয় !—ঘোড়া-মামা বত্রিশ ইঞ্চি হাসি ছড়িয়ে বলে চললেন, ইটাকে নিয়ে তোমাদের ভাঁড়ারে ছেড়ে দাও। অনেক বাচ্চা হবে, উৎপাত করবে, তখন তোমার বাবা বেড়াল নিয়ে আসবে। বেড়ালকে দুধ খাওয়াতে হবে, তোমার বাবা গরু কিনবে। সেই গরু দুধ দিবে, সেই দুধে সন্দেশ হবে, কৈঁচাগোল্লা হবে, ছেনার জিলিপি হবে, ক্ষীরের পেঁড়া হবে, পিঠে

www.boiRboi.blogspot.com

হবে—দ্যাখো, আরো কত জিনিস তোমায় খাইয়ে দিলাম। খুশি হয়েছ তো পেলারাম ?

বলে, দড়িশুদ্ধ নেংটি ইঁদুরটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে, শুট করে যেন কোন্‌দিকে হাওয়া হয়ে গেলেন ঘোড়া-মামা।

স্বয়ং তিনিই

—এ লালগোলা লাইন মশাই, ডেঞ্জারাস্ চোরের জায়গা—বলতে বলতে ঢুকলেন ভদ্রলোক। এক হাতে একটি ছোট অ্যাটাচি—এত ছোট যে পরামাণিকের বাক্স বলে সন্দেহ হয়। আর এক হাতে সতরঞ্জি জড়ানো একটি সংক্ষিপ্ত বিছানা।

লালগোলা লাইনের মহিমা আমি জানতাম। অনেক দিন এ পথে আসিনি বলে, তবুও কথাটা মনে আনবার একটি সকরুণ কারণ আছে। বছর পাঁচেক আগে একখানা সিল্কের চাদর আর খানকয়েক ধুতি-পাঞ্জাবী শুদ্ধ একটি সুটকেস আমার এই লাইনেই মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে।

আজ হুঁশিয়ার হয়ে আছি। রাণাঘাটের আগে নো ঘুম—নট কিচ্ছু। দুটো রক্ত জল করা ডিটেকটিভ্ উপন্যাস নিয়েছি সঙ্গে। মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়—এমনি একখানা ভূতুড়ে বিলিতী বইওহাতেরকাছে রেখেছি। গোয়েন্দা যদি ঘুম তাড়াতে না পারে—ভূতের শরণ নেওয়া যাবে তখন।

আরো কি আশ্চর্য, বহরমপুরে আসতে না আসতেই সঙ্গী দুজনও নেমে গেলেন। এখন আমি একেবারে একা। বলতে গেলে, চোরের নির্বিঘ্ন শিকার হয়ে আছি। চারটে কড়া চুরুট বের করে একটা কোণায় ঠেসান দিয়ে বসলাম, তারপর গোয়েন্দা কাহিনী খুলে নিলাম। প্রথম অধ্যায়ের নামই "ভয়ঙ্কর ঘাতক।" বেশ জমে যাবে বলে মনে হচ্ছিল।

এমন সময় তিনি এলেন। আমার সহযাত্রী। আর গাড়িতে উঠেই মনে করিয়ে দিলেন : এ লালাগোলা লাইন—ডেঞ্জারাস চোরের জায়গা।

মাঝখানের বেঞ্চটা ছেড়ে দিয়ে ওদিকের বেঞ্চিতে তিনি ছোট বিছানাটা ছড়িয়ে দিলেন। তারপর একটা কাঁচি সিগারেট ধরিয়ে ফস-ফস্ করে গোটাকয়েক টান দিয়ে বসে রইলেন ঝিমন্ত বকের মতো। তারও পরে : কোথায় যাবেন দাদা ?

দাদা সম্ভাষণটা শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। দুনিয়া শুদ্ধ লোককে ছোট ভাই বলে স্বীকার করতে আমার নিদারুণ আপত্তি আছে। ভ্রূ কুঁচকে আমি বললাম, কলকাতা।

—যাক্ বাঁচা গেল।—লোকটি শ্বাস ফেললেন : আমিও যাব কলকাতায়। দুজন থাকলে তবু খানিক ভরসা আছে। গাড়ি খালি দেখে প্রাণ চমকে উঠেছিল। এ লাইনে ইন্টারক্লাশের টিকিট করাই ভুল মশাই—আরো এই ট্রেনে।

বললাম, তা বটে !

www.boiRboi.blogspot.com

—জুতো রেখেছেন কোথায় ? ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

—নিচে। পায়ের কাছেই আছে।

—ওটি করবেন না দাদা। বালিশের তলায় রাখুন—স্রেফ নিশ্চিন্দি।

—বলেন কী ! পুরোনো জুতো—তাও চুরি হবে নাকি ?

—পুরোনো জুতো কী বলছেন ! ভাঙা খড়ম রেখে দিয়ে দেখুন না—তাও লোপাট্ হয়ে যাবে। এ লাইনে চোরের ওই একটি গুণ আছে মশাই, কিছুতে অরুচি নেই। সিগারেটের একটা খালি খাপ ফেলে দিন, সকালে দেখবেন তাও হাওয়া। অভ্যেস রাখে আর কি— বুঝলেন না ? সামলান—জুতো সামলান ! হোক পুরোনো, তবুও মুচিকে বেচে দিলে কোন্-না ছ'গণ্ডা পয়সা আসবে।

—আপনি বুঝি এ লাইন সম্বন্ধে খুব ওয়াকিবহাল ?

—ওয়াকিবহাল মানে ? গাঁজার কল্‌কের মতো হাতের মুঠোয় সিগারেটটাকে ধরে চৌ করে একটা টান দিলেন ভদ্রলোক : প্রায় ডেলিপ্যাসেঞ্জার বলতে পারেন। প্রমাণ চান ? এই দেখুন—বলতে বলতে রোগা একখানা পা সটান আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

পা দেখে ডেলিপ্যাসেঞ্জার চেনা যায় এ থিয়োরীটা জানা ছিল না। বোকা হয়ে বললাম, কী দেখব ?

—জুতো—জুতো, দেখছেন তো, মিলিটারী বুট !

তাইতো ! ধুতি-পাঞ্জাবী পরা মানুষটি—কাকের মতো কালো একখানা জীর্ণ-শীর্ণ পা, অথচ সে পায়ে প্রকাণ্ড এক মিলিটারি বুট। সেই বুটপরা বেড়ালের গল্পটা মনে পড়িয়ে দেয় !

ভদ্রলোক সগর্বে বললেন, নিন্ তো খুলে। এমন করে বেঁধেছি যে, আমাকে শুদ্ধ কিড্‌ন্যাপ না করলে আর জুতোটি নিতে হচ্ছে না।

—খুলবেন না ?

—ক্ষেপেছেন ?

—ওইটে পরেই শোবেন ?

—আলবাৎ। এ লাইনে চলতে হয় বলে অভ্যেস করে নিয়েছি। বাড়িতে পর্যন্ত বুট পরে ঘুমুই। আমার স্ত্রী আগে আপত্তি করতেন, তাঁকেও একজোড়া করে দিয়েছি। এখন বেশ কমপ্রোমাইজ হয়ে গেছে। আজকাল বুট পরে ঠাকুর পুজো পর্যন্ত করেন—একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নেন জুতোয়। বুট পরে ঠাকুর পুজো করছেন একটি ভদ্রমহিলা ! ছবিটা কল্পনা করতে গিয়ে আমার বিষম লাগল। —তবে—ভদ্রলোকের মুখ বিষাদের ছায়া পড়ল : এ লাইনের চোর তো ! অসাধ্য কিছুই নেই। একদিন যে খুলে নেবে না একথাও গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় না।

—বলেন কি, এমন ?—আমি ডিটেকটিভ্ উপন্যাসটা নামিয়ে রাখলাম !

—সত্যি কথা বললে ভাববেন গপ্প করছি। সেদিন জঙ্গীপুরের এক জমিদার ভদ্রলোকের দাড়ি চুরি গেল মশাই এই ট্রেনে।

—দাড়ি ?—মনে হল, ভুল শুনছি।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ দাড়ি। নকল নয়, একেবারে ওরিজিন্যাল। মানে, ওঁর নিজের মুখের চামড়াতেই গজিয়েছিল সেটা। আর সে একখানা কী দাড়ি মশাই ! আজকাল থুতনির নিচে যে ছাগল-ব্র্যাণ্ড দেখা যায়—তা নয়। মানে, খাঁটি ঘি-দুধ খাওগা দাড়ি—দাল্‌দা-ফালদার কোনো কারবার নেই। প্রায় হাতখানেক লম্বা—আর তেমনি ঘন। লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়াতে হয়, সেলুলয়েডের দাঁত তাতে দন্তস্ফুট করতে পারে না। সে দাড়ি নিয়ে গেল।

—কী করে ?

—কামিয়ে। সকালে উঠে ভদ্রলোক দেখলেন, মুখ একেবারে পরিষ্কার। কোনো দাড়ি সেখানে কখনো গজিয়েছিল বলেই মনে হয় না।

—কিন্তু দাড়ি! দাড়ি নিয়ে কী করবে?

—বলেন কি!—ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন: থিয়েটারওলারা তা লুফে নেবে। একটা হিস্টরিক্যাল মুঘলস্টোরির আগাগোড়া মেক্‌আপ হয়ে যাবে এই একখানা দাড়িতে।

এবারে আমি হেসে ফেললাম।

—বিশ্বাস করছেন না?—সহযাত্রী উত্তেজিত হয়ে আর একটা কাঁচি সিগারেট বের করলেন: আর্ট মশাই, সবটাই আর্ট! এরই নাম হাতের গুণ! পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখেছেন? এও তাই। ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে পড়লেন: দাঁড়ান—দরজা-জানালাগুলো লক্ করি।

—সে কি করে হয়? রিজার্ভ গাড়ি তো নয়। পথে অন্য প্যাসেঞ্জার এসে ধাক্কা-ধাক্কি করবে।

—করুক না! করে করে হয়রাণ হয়ে অন্য গাড়িতে গিয়ে উঠবে। জায়গার তো অভাব নেই।

খুব মন দিয়ে দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করতে লেগে গেলেন। ওঁর বুট-পরা পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার রোমাঞ্চ হতে লাগল।

ফিরে এসে গেলেন নিজের বেঞ্চিতে। হাসলেন আত্মপ্রসাদের হাসি।

—এবার নিশ্চিন্দি। কী বলেন?

আমি বললাম, যে রকম দুর্দান্ত চোরের গল্প বলছেন, কিছুতেই কি নিশ্চিন্ত হওয়ার জো আছে?

—তা যা বলেছেন! এ লালগোলা লাইনের চোর, সিগারেটে একটা টান দিয়ে আবার ঝিমন্ত বকের মতো খানিকটা চিন্তা করলেন, ভদ্রলোক:

ভালো মনে করিয়ে দিয়েছেন।

আবার উঠলেন: 'বাথরুমটা' ম্যানেজ করা যাক।

—বাথরুম?

—হুঁ। ওটাও ওদের চলাচলের একটা রাস্তা কিনা! দিব্যি তলাটি খুলে আসেন, তারপর সেই পথেই আবার অন্তর্ধান। দেখেছেন? পকেট থেকে জড়ানো সুতোর দড়ি বের করলেন খানিকটা।

—ওটা আবার কী?

—অ্যামেরিকান কর্ড। ডিসপোজালের জিনিস। হাতী পর্যন্ত বাঁধা যায় মশাই।

—ওটা দিয়ে কী করবেন?

—মেঝের বেঞ্চির সঙ্গে আর ওর লকের সঙ্গে বেঁধে রাখব। যদি কখনো যেতে চান, ফাঁসটা খুলে চলে যাবেন। কিন্তু ওর ভেতর থেকে কেউ যদি হাজার টানাটানিও করে, তাহলে খুলতে হচ্ছে না তাঁকে! স্যাণ্ডো কিংবা ভীম ভবানী হলেও না।

এবার আমি দস্তুরমতো মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

—সবরকম ব্যবস্থাই তো আপনার সঙ্গে দেখছি।

—কী করব, বলুন!—লকের সঙ্গে অ্যামেরিকান কর্ড বাঁধতে বাঁধতে বললেন: নেসেসিটি ইজ দি মাদার অব্ ইনভেনশন।— জানেন তো! আজ আনতে ভুলে গেছি, আমার সঙ্গে ব্যাণ্ড-বাজনা পর্যন্ত থাকে।

—ব্যাণ্ড-বাজনা? সে আবার কী?

—দেখেননি? ওই যে মাটির খুরির ওপরে পাতলা চামড়া দেওয়া, তার ওপরে দুটো কাঠি? দড়ি ধরে টানলেই প্যাং প্যাং করে বাজতে থাকে? মানে, ছেলেপুলেরা রাস্তা দিয়ে টানে।

—বুঝেছি! কিন্তু কী হয় ও দিয়ে?

—বড় সুটকেস-টুটকেশ থাকলে—মানে যা মাথায় দিয়ে শোওয়া যায় না—তার সঙ্গে বেঁধে রাখি। কেউ ধরে টান দিয়েছে কি ট্যাং ট্যাং করে সাড়া দিয়ে উঠবে। একবার চিংড়ি মাছ দিয়ে ঘণ্ট খাব বলে দেশ থেকে এক মস্ত লাউ নিয়ে যাচ্ছিলাম কলকাতায়। মাঝ রাতে সেই লাউ ধরে চোরে টান দিয়েছে। ভাগ্যিস ব্যাণ্ড-বাজনা বাঁধা ছিল-ব্যস্ টের পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই। আর চোরও তেমনি! যেন ইনভিজিবুল ম্যান—সঙ্গে সঙ্গে গন উই থ্রু দি উইণ্ড! দড়ি বাঁধা শেষ হল। ফিরে এসে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। সেই বুটশুদ্ধুই।

—শোবেন না?

বললাম, না!

—জেগে জেগে পাহারা দেবন নাকি?—ভদ্রলোক হাসলেন!

—ঠিক পাহারা দেওয়া নয়,—মানে এখনো আমার ঘুম পায়নি।

—তবে বসে থাকুন! আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল কলকাতায় পৌঁছেই আবার একরাশ কাজ!

—ভদ্রলোক একটা হাই তুললেন, মুখের কাছে তুড়ি বাজালেন।

তারপর সোজা চীৎ হয়ে পড়লেন। ডিটেক্‌টিভ্ বইটা পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমি শুনতে লাগলাম ব্যাণ্ড-বাজনা বাজছে। মানে, নাক ডাকছে ওঁর।

আমি একটার পর একটা অধ্যায়ের রহস্যের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু নাক-ডাকা জিনিসটা ছোঁয়াচে। ওঁর মুখটা বার বার খুলে বন্ধ হতে লাগল, আর শব্দ উঠতে লাগল, ফোঁ—ফর্-র—ফোঁ—ফর্—র—

আমি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম সেদিকে। তারপর হিংসে হতে লাগল, তারও পরে মনে হতে লাগল, সব ব্যবস্থাই যখন উনি পাকা করেই রেখেছেন, তখন আমিও আর—জুতোটা একেবারে অন্ধকার তলার দিকে ঠেলে দিয়ে লম্বমান হয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দুটো জিনিস আবিষ্কার করলাম। প্রথমতঃ ভদ্রলোক অদৃশ্য হয়েছেন—আমার সুটকেশ, পুরোনো জুতো জোড়া, এমনকি অ্যামেরিকান কর্ড পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। আর দ্বিতীয়তঃ—সেইটেই সবচেয়ে বিস্ময়কর!

যাওয়ার আগে, আমার অবিশ্বাস ভাঙবার জন্যেই কিনা কে জানে, ফেলে গেছেন নিজের ছোট অ্যাটাচিটা। সেইটে খুলে দেখলাম: আর কিছু নেই—একখানা চকচকে ক্ষুর। এখন আর আমার বিশ্বাস করতে বাধা নেই—এই ক্ষুরেই জঙ্গীপুরের সেই ভদ্রলোকের দাড়ি নিশ্চিহ্ন আর নিরুদ্দেশ হয়েছে।

লালগোলা লাইনের শ্রেষ্ঠ গুণীর সঙ্গে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে দেখা হয়েছে, আপাততঃ এইটেই আমার সান্ত্বনা।

www.boiRboi.blogspot.com

সদা হাস্যমুখে থাকিবে

পর পর দু'বার আই-এ ফেল করলে কার আর মেজাজ ভালো থাকে ? তার ওপর বড়দা যখন বললেন, ওর আর পড়ে দরকার নেই—এবার গলির মোড়ে বিড়ির দোকান করে দেব, তখন ডাবু স্রেফ উড়ন্-তুবড়ীর মতো ছিটকে পড়ল বাড়ি থেকে।

ময়দানে বসে বসে যখন ভাবছে আত্মহত্যা করবে না সিনেমা দেখতে যাবে, ঠিক সেই সময় স্বামী ঘুর্ঘুরানন্দের আবির্ভাব।

ইয়া জটা, অ্যায়সা দাড়ি—চোখ দুটো লাটুর মত ঘুরছে। ডাবুর সামনে এসেই বাজখাঁই গলায় বললেন, এই ছোকরা, তোমার পকেটমে কেত্না হ্যায় ?

আওয়াজ শুনেই ডাবু ভেবড়ে গেল। একটা চিনে-বাদাম চিবুচ্ছিল, কটাৎ করে গলায় আটকে গেল সেটা। হুস্ করে বলে ফেলল, বারো আনা হ্যায়।

—তব্ ছ আনা দে দো।

—কেন ?

—কেন আবার কেয়া ! আমি ঘুর্ঘুরানন্দ হ্যায়। ছ' আনা দে দো। বহুৎ আচ্ছা উপদেশ দেগা—তোমার খুব ভালো হোগা।

উপদেশের আশায় নয়—ঘুর্ঘুরানন্দের চেহারা দেখেই ছ' আনা পয়সা পকেট থেকে বের করে দেয় ডাবু। না দিলে জোর করে হয়তো বারো আনাই কেড়ে নেবে। আরো এখন কাছাকাছি লোকজন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

ছ' আনা গুণে নিয়ে ঘুর্ঘুরানন্দ হাসলেন। তারপর তেমন বাজখাঁই গলায় বললেন, সব সময় হাসি মুখমে থাকে গা—বুঝেছ ?

সদা হাস্যমুখে থাকিবে। দেখবে সব ঠিক হো যায়ে গা।

এই বলেই সুড়ুৎ করে কোন দিকে চলে গেলেন ঘুর্ঘুরানন্দ। সন্ধ্যার অন্ধকারে ডাবু সেটা ভালো করে ঠাহর করতে পারল না।

একবার মনে হল লোকটা জোচ্চোর—একদম মাথায় চাঁটি বসিয়ে ছ' গণ্ডা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে গেল। তারপর ভাবল—কে জানে কোনো মহাপুরুষই হয়তো বা ! ডাবুর মনের ব্যথার খবর পেয়ে তার সঙ্গে ছলনা করে গেলেন।

সে যাই হোক—উপদেশটা মেনেই চলা যাক না। সদা হাস্যমুখে থাকিবে। মন্দ কী ? আই-এ ফেল করে তিনদিন তো সমানে কাঁদতেই হয়েছে—একদিন হেসেই দেখা যাক না, না হয় ! কী থেকে যে কী হয় কেউ বলতে পারে সে কথা ?

চীনেবাদাম খেতে খেতে ডাবু উঠে পড়ল। হাস্যমুখেই। এস্প্ল্যানেড গুমটির সামনে এসে ট্রামের জন্যে দাঁড়াতে হল ডাবুকে। শ্যামবাজারের গাড়ী ধরতে হবে তাকে। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুর্ঘুরানন্দের কথাই সে ভাবছে—ঠিক এই সময় কাণ্ড হল একটা।

—কী মশাই, হাসছেন যে ?

ডাবু চমকে ফিরে তাকালো। ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা প্রচণ্ড মোটা এক ভদ্রলোক তার সামনে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় একটা খইয়ের বস্তার একটা মাথা আর গোটাকয়েক হতা-পা গজিয়েছে। দুটো কুৎকুতে চোখের দৃষ্টি ডাবুর ওপর ফেলে ঘ্যাঁস-ঘেঁসে গলায় ভদ্রলোক বললেন, হাসছেন

কেন মশাই ?

—এমনি।

—এমনি ?—ভদ্রলোক প্রায় তেড়ে উঠলেন : তখন থেকে সমানে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন—বললেই হল এমনি ?

—আমি তো স্যার দেখতে পাইনি আপনাকে।

—দেখতে পাননি—বটে ? এই কলকাতা শহরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল দেখবার আগে লোকে আগে আমায় দেখতে পায়—আর আপনি পাননি ! দেখুন মশাই—মোটা লোক দেখলে কক্ষনো হাসবেন না। মোটা হওয়ার যে কী দুঃখু—যে হয়েছে সেই জানে। তা'ছাড়া সবদিন সমান যায় না মশাই। আজ আপনি শুঁটকি মাছের মতো রোগা আছেন, তাই ভারী ফুর্তি। কিন্তু দু'দিন পরে আপনিই যে ট্যাপা মাছের মতো মোটা হয়ে যাবেন না—কে বলতে পারে ?

—বলছি, আপনাকে দেখে আমি হাসিনি—

—হাসেননি মানে ? এখনো তো হাসছেন। জানেন, আমি কী করতে পারি ? চেঁচিয়ে লোক জড়ো করতে পারি—পুলিশ ডাকতে পারি—

—তাই ডাকুন—বলতে বলতেই ডাবু সামনের ট্রামগাড়ীটায় লাফিয়ে উঠে পড়ল।

সদা হাস্যমুখে থাকিবে—ঘুর্ঘুরানন্দের উপদেশ। কিন্তু প্রথম থেকেই কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তা হোক। আজকের দিনটা সে পরীক্ষা করেই দেখবে।

পকেট হাতড়ে আবার সে গোটাকয়েক চীনে-বাদাম বের করলে। ট্রাম চলেছে আর সেই সঙ্গে চলছে বাদাম খাওয়া। ঘুর্ঘুরানন্দের কথাটা ঘুরছে মাথার মধ্যে। এমন সময় সামনের সীটের লোকটি হাউ-মাউ করে উঠলেন।

—দাদা ! ও—দাদা !

ডাবু খেয়াল করেনি প্রথমটায়। কিন্তু পরক্ষণেই ডাক এল, এবার রীতিমত আর্তনাদ যেন।

—ও চীনে-বাদাম খাওয়া দাদা, শুনছেন ?

ডাবু ফিরে তাকালো।

সামনের সীটে কালো লম্বা লোকটি প্রায় তেড়ে উঠেছেন ততক্ষণে।—বলি, আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে খুব যে হাসা হচ্ছে ! না হয় চোখ দুটো আমার ট্যারাই আছে, তাতে হাসির কী পেলেন এত ?

—আমি তো সেজন্যে হাসিনি।

—তবে কিজন্যে ? ল্যাম্প পোস্ট দেখে হাসছেন ? ট্রামগাড়ী দেখে হাসছেন ? না জুতোর দোকান দেখে হাসি পাচ্ছে আপনার ? আমি দর্জিপাড়ার বেচু গড়গড়ি—বেশি চালাকি করবেন না আমার সঙ্গে।

—কেন খামোকা চালাকি করতে যাব আপনার সঙ্গে ? কী দায় আমার ?

—বটে ! বটে !—বেচু গড়গড়ি প্রায় রুখে উঠলেন : তা'হলে হাসছিলেন কেন আমার ট্যারা চোখ দেখে ? ন্যাকা পেয়েছেন আমাকে ?

—কী মুশকিল ! ওটা আমার অভ্যেস।

—অভ্যেস ? এর পরে হয়তো আমার নাকটাকে খিমচে দিয়ে বলবেন, ওটাও আমার অভ্যেস ! হয়তো কটাং করে কান কামড়ে দিয়ে বলবেন, ওটাও আপনার অভ্যেস ! নইলে ঝটাং করে একটা ক্ষুর বের করে আমার চাঁদিটা চেঁছে দিয়ে বলবেন—ওটাও আপনার অভ্যেস ? কী—তবুও হাসছেন ? ভালো হবে না দাদা—ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমার ছোট মামা বক্সিং লড়তে পারে—মনে থাকে যেন সে কথা !

—আহা যেতে দিন—যেতে দিন—ট্রামের দু' চারজন এতক্ষণে মাঝখানে এসে পড়লেন।

www.boiRboi.blogspot.com

—যেতে দেব কী !—বেচু গড়গড়ি আবার আর্তনাদ করে উঠলেন : ওই দেখুন না, এখনো হাসছে।

ডাবু কী জবাব দিতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ট্রামের দরজার গোড়ায় সোরগোল উঠল একটা।

—পকেট মেরেছে—পকেট মেরেছে !

হায়—হায় ! পাঁচ শো টাকা নিয়ে গেছে আমার—পাঁচ শো টাকা—একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ডুকরে উঠলেন।

ঝড়াং করে ট্রাম থেমে গেল।

—কী করে নিলে মশাই—কে নিলে ? কখন নিলে ?

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন।

—নেবে আর কী করে—পকেট থেকে পাঁচশো টাকা তুলে নিয়েছে ব্যাগ শুদ্ধ।

—কে নিলে তাই বলুন।

—কে নিলে তা জানতে পারলে আর চিন্তাব কেন মশাই ? ফ্যাঁক করে তক্ষুনি তো তার টুঁটিটা চেপে ধরব !—ভদ্রলোক হাহাকার করতে লাগলেন ; রেসের মাঠে খেলতে গিয়ে মুফৎ রোজগার হয়েছিল টাকাটা—হায় হায় !

—অধর্মের টাকা ও-ভাবেই যায়—কে একজন জুড়ে দিলে মাঝখানে।

হঠাৎ বেচু গড়গড়ি লাফিয়ে উঠলেন সীট ছেড়ে। ক্ষিপ্ত জিঘাংসা তার ট্যারা চোখে।

—নির্ঘাৎ এই লোকটাই আপনার পকেট মেরেছে শেঠজী। তখন থেকে মিটমিট্ করে হাসছে সেইজন্যে।

ডাবু একেবারে আকাশ থেকে পড়ল : আমি ?

—তাছাড়া কী ? মনে ফুর্তি না থাকলে অমন খামোকা হাসি পায় কারো ? আর নগদ পাঁচশো টাকা হাতে পেলে কার মনে ফুর্তির বান ডেকে না যায় ? বলুন স্যার—আপনারাই বলুন।

—ঠিক ঠিক।

—কষে লাগিয়ে দিন দু ঘা। পুলিশে দিন—

প্রায় মার্ মার্ করে সারা ট্রামের লোক ডাবুর দিকে ছুটে এল।

—দেখছেন, এখনো মুখে হাসি।

—নির্ঘাৎ পাকা পকেটমার—

কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক নিজেই।

—হায় হায় মোশা, আপনারা কি পাগল হলেন ? ওহ ভদ্রলোক অত দূরে বসে আছেন, দশ গজ লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে আমার পকেট মারবেন নাকি ?

—ঠিক ঠিক। তাও তো বটে।

—ওঁর হাতটা মেপে দেখুন না ক'গজ লম্বা।

—হায়—হায় !—মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাহাকার করতে লাগলেন : আমি টাকার শোকে মরছি, আর আপনারা পাগলামি শুরু করলেন।

—সত্যিই তো কী পাগলামি করছেন আপনারা, এত দূর থেকে উনি কি করে পকেট মারবেন ?—বেচু গড়গড়ি আর একজনকে বললেন।

—আপনিই তো গোড়াতে বললেন মশাই !—সে ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠলেন।

—বা রে, আমি তো ঠাট্টা করছিলাম।

—ঠাট্টা ! এ কোন্‌দিশি ঠাট্টা ? সাদাসিদে একজন নিরীহ লোককে—গাঁটকাটা বলা ? ট্যারা

লোকগুলোর বুদ্ধিই এমনি।

কী বললেন, ট্যারা !—বেচু গড়গড়ি চেঁচিয়ে উঠলেন : জানেন, আমি দার্জিপাড়ার লোক ? জানেন, আমার ছোট মামা বকসিং করে।

ট্রামটা চলছিল, আবার কড়াং করে থেমে পড়ল। কণ্ডাক্টার ঘণ্টি মেরে দিয়েছে। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের হাহাকার ; বেচুর আর্তনাদ প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

কিন্তু আর নয়—ডাবু ভাবল : এই বেলাই মানে মানে গাড়ী থেকে নেমে পড়া ভালো।

সামনে ওয়েলিংটন স্কোয়ার। ট্রাম থেকে নেমে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল ডাবু। উঃ—সদা হাস্যমুখ থাকাটা কী ভয়ঙ্কর ! আধ ঘন্টাও চেষ্টা করতে হয়নি—এরই মধ্যে বারকয়েক ফাঁড়া কেটে গেল। আর একটু হলে পকেটমার বলে ঠেঙিয়ে ঠোঙা করে দিত।

স্বামী ঘুর্ঘুরানন্দকে হাতে কাছে পেলে হয় একবার। আসত জোচ্চোর লোকটা। স্রেফ ভোগা দিয়ে ছ'আনা পয়সা মেরে দিলে। তিনদিন পাঁটার ঘুঘনি খাওয়াই বরবাদ।

ঘাসের ওপর বসে পড়তে যাবে, এমন সময় হাফশার্ট পরা বেঁটে লোকটা এগিয়ে এল। একেবারে পাশ ঘেঁষেই দাঁড়ালো ডাবুর।

—আমি গাঁড়াতলার গাঁড়ালাল, আমাকেও আপনি জব্দ করেছেন স্যার।

—মানে ? কী বলছ তুমি !

—কেন স্যার ছলনা করছেন ? ওই মিটমিটে হাসি, পেছনে পছনে আসা, বুঝতে কি বাকী থাকে ? যাক্ স্যার—ওটা চেপেই যান, পুলিশে আর খবর দেবেন না। আমি অর্ধেক শেয়ার দিচ্ছি আপনাকে।

বলেই, ডাবুর হাতে মধ্যে কী কতকগুলো কাগজ গুঁজে দিয়ে সুরুৎ করে অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল হাফশার্ট পরা বেঁটে লোকটা। যেমন করে স্বামী ঘুর্ঘুরানন্দ মিলিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই রকম।

কিন্তু হাতের কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে ডাবুর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। মিটমিটে হাসি একদম বন্ধ হয়ে গেল এতক্ষণে।

সেগুলো কাগজ নয়—একতাড়া দশ টাকার নোট !

www.boiRboi.blogspot.com

বন্টুদার উৎসাহলাভ

আমি বরাবর দেখেছি, আমাদের বন্টুদার যখন তেজ এসে যায়, তখন তাকে ঠেকানো ভারী মুশকিল।

রবিবার সকালে দিব্যি চাটুজ্জেদের রকে বসে আছি আর একটা কাকের পালক কুড়িয়ে নিয়ে আরামে কান চুলকোচ্ছি, হঠাৎ কোত্থেকে বন্টুদা এসে হাজির। বললে, চল্ প্যালা—একটু বেরোনো যাক।

—কোথায় যেতে হবে ?

—মানে বন্ধু-বান্ধবদের একটু উৎসাহ দেওয়া দরকার। দেখছিস্ নে সব কেমন মিইয়ে যাচ্ছে ?

শুনে কানের ভেতর আচমকা একটা পালকের খোঁচা লেগে গেল।

—সে আবার কী ? কাকে তুমি উৎসাহ দেবে ?

—যাকে পাই। বুঝলি, চারদিকে সবাই যেন কি রকম দমে যাচ্ছে। এই তো সেদিন তোর বন্ধু হাবুল সেনকে বললুম, 'চল হাবলা, একটা অ্যাডভেঞ্চারের ফিলিম হচ্ছে—দুজনে মিলে দেখে আসি। তোর পকেটে যদি পাঁচ সিকের পয়সা থাকে, তা হলেই হয়ে যাবে এখন।' বললে বিশ্বেস করবি না প্যালা, হাবুল একেবারে খ্যাঁক করে উঠল। আমার নাকের সামনে হাত নেড়ে বললে 'থাউক, অত আহ্লাদ করতে হইবো না। যাইতে হইলে একাই যামু—তোমারে নিমু ক্যান্ ? শুনলি একবার কথাটা ? দেশের এ কী অবস্থা হল বল্ দিকি ?

আমি বললুম, হুঁ—দেশের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু তাই বলে যদি আমাকে উৎসাহ দিতে এসে থাকো, তবে সুবিধে হবে না বলে দিচ্ছি। আমার পকেটে ঠিক তিনটে নয়া পয়সা আছে। চাও তো তা থেকে একটা তোমায় দিতে পারি।

বন্টুদা নাকটাক কুঁচকে মুখটাকে মোগলাই পরোটার মত করে বললে, থাক থাক, তোকে আর দয়া করতে হবে না। তুই যে এক নম্বরের ট্যাঁক-খালি জমিদার সে কি আর আমি জানিনে ? চল্—আমাদের অভিলাষকে একটু উৎসাহ দিয়ে আসি।

অভিলাষের নাম শুনে আমার কান খাড়া হয়ে উঠল।

—কোন্ অভিলাষ ? ওই যে সিনেমার সামনে নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে ?

বন্টুদা বললে, আবার কে ? উৎসাহ দিতে হলে ভালো ভালো লোককেই দেওয়া উচিত—আজে বাজে লোককে দেওয়া আমি পছন্দ করি না। নে—উঠে পড়—

তক্ষুণি উঠে পড়লুম।

—কী রকম উৎসাহ দেবে বন্টুদা-?

—চল্ না, দেখতেই পাবি।

পরমানন্দে উঠে পড়লুম। আমার আর ভাবনা কী। পকেটে তো মোট তিনটে নয়া পয়সা। তা ছাড়া বন্টুদার মনে যখন একবার উৎসাহ দেবার তেজ এসে গেছে তখন আর ওকে ঠেকাবে কে !

—ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—বলতে বলতে বন্টুদার পেছু নিলুম।

অভিলাষ আমাদের পাড়ার ছেলে। ওর বাবার মস্ত বড় পটোলের ব্যবসা। তাই অভিলাষকে বেশি লেখাপড়া না শিখিয়ে পটোলের ব্যবসায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন। দু-বছর ধরে অভিলাষ এমন ব্যবসা করলে যে পটোলের দোকান পটোল তোলে আর কি ! তখন ওর বাবা রেগে মেগে ওকে কষে দুটো থাপ্পড় দিলেন। অভিলাষ তাই শেষ পর্যন্ত এই রেস্তোরাঁ খুলেছে আর মনের দুঃখে পটোল ভাজা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

আমরা যখন গেলুম, তখন ওর দোকানে বিশেষ লোকজন নেই।' একজন ঝাঁটাগুঁফো ভদ্রলোক তারিয়ে তারিয়ে ডিমের পোচ খাচ্ছেন আর এক বুড়ো নাকের ডগায় খবরের কাগজটা ধরে বসে আছেন।

আমাদের দেখেই অভিলাষের হাসি কান ছাপিয়ে, নাকের ডগা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

—এই যে এসো বন্টুদা—আয় প্যালা—

বন্টুদা আর আমি ততক্ষণে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছি। বন্টুদা বললে, আরে

আসব বই কি ! তুই বললে আসব, না বললে আসব, তাড়িয়ে দিলেও ফিরে আসব।

শুনে অভিলাষ 'হেঁ—হেঁ' করল।

—আরে তাড়াব কেন ? তোমরা হলে খদ্দের—দোকানের লক্ষ্মী ! কী খাবে বলো এখন।

বন্টুদা বললে, কী খাব না, তাই বল্। তোকে উৎসাহ দেবার জন্যেই তো প্যালাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম। তোর কেক খাব, বিস্কুট খাব, টোস্ট খাব, ওমলেট খাব, চপ—কাটলেট—মাংস—ও, সেগুলো বুঝি এবেলা হয় না ? আচ্ছা বেশ—চপ—কাটলেটগুলো সন্ধেবেলায় এসেই খাওয়া যাবে তা হলে। এখন চা খাব, কফি খাব—

আমি বললুম, যদি আরো বেশি উৎসাহ পেতে চাস, তা হলে তোর কাপ—ডিশ-চামচে—কাঁটাগুলোও খেতে পারি।

অভিলাষ দারুণ খুশি হতে যাচ্ছিল, কিন্তু এবারে যেন একটু নার্ভাস্ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললে, না—না, কাপ-ডিশগুলো বরং—

—তুই আপত্তি করছিস্ ?—বন্টুদা বললে, আচ্ছা, ওগুলো তবে থাক। আর যদ্দূর মনে হচ্ছে কাপ-ডিশ খেতে খুব ভালো লাগবে না, কাঁটা-চামচে খাওয়াও বেশ শক্ত হবে। তবে প্যালার যদি খুবই ইচ্ছে হয়ে থাকে, একটা ভাঙা পেয়ালা বরং ওকে দে—বসে বসে চিবোক। আর আমার জন্যে দুখানা প্লাম কেক, চারটে টোস্ট, দুটো ডবল ডিমের ওমলেট—

আমি ভীষণ প্রতিবাদ করে বললুম, না, আমি কক্ষনো ভাঙা কাপ খাব না। আমিও কেক, টোস্ট, ওমলেট এইসবই খেতে চাই।

অভিলাষ বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুইও খাবি। একটু বোস—আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

প্রায় নাচতে নাচতে চলে গেল অভিলাষ। বোধ হয় ভাবছিল সকালে কার মুখ দেখেই উঠেছে আজকে। কমসে কম তিন টাকা করে ছ'টাকার খদ্দের। কিন্তু আমি যদি বন্টুদাকে চিনে থাকি তা হলে—

এদিক বুড়ো ভদ্দরলোক উঠে যেতেই ছোঁ মেরে খবরের কাগজটা তুলে এনেছে বন্টুদা। একমনে খেলার খবর পড়ছে।

বললুম, বন্টুদা—

—উঁ !

—পকেটে টাকা-ফাকা আছে তো ? না তোমার পাল্লায় পড়ে ঠ্যাঙানি খাব শেষ পর্যন্ত ?

বন্টুদার নাকের ডগায় একটা মাছি অনেকক্ষণ ধরে পজিশন নেবার চেষ্টা করছিল। খবরের কাগজের ঘা খেয়ে সেটা পালালে। বন্টুদা আমার কথা শুনে উঁচুদরের একটা হাসি হাসল—বাংলায় যাকে বলে হাই ক্লাস।

—কে ঠ্যাঙাবে ? অভিলাষ ? না ও তেমন ছেলে নয়।

—তাই নাকি ?—আমার খটকা তবুও যেতে চায় না। জিজ্ঞেস করলুম, কী করে জানলে ?

—ও যখন পটোলের দোকানে বসত—জানিস্ তো ? সেই যখন দোকানের পটোল তোলার জো হয়েছিল ? সেই সময় একদিন ও একা দোকানে বসে রয়েছে, দুজন লোক এসে হাজির। একজন বললে, 'খোকন, আমায় পঁচলডাঙার টেনিদার বাড়িটা চিনিয়ে দিতে পারো ?' ও বললে, 'ওই তো—বাঁটার দোকানের পাশ দিয়ে চলে যান।' শুনে লোকটা বললে, 'আমি কলকাতায় নতুন এসেছি ভাই—পথ-ঘাট কিছু চিনিনে। একটু আসবে সঙ্গে ?' অভিলাষ বললে, 'আমি যে দোকানে একা আছি !' লোকটা বললে, 'তাতে কী—আমার সঙ্গে বন্ধুটি তোমার দোকান পাহারা দেবে।' শুনে অভিলাষ তো তাকে এগিয়ে দিতে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

পটলডাঙার গলিতে ঢুকেই লোকটা একদম ভ্যানিশ। 'ও মশাই, কোথায় গেলেন' বলে অভিলাষ একঘণ্টা ধরে চেঁচিয়ে মিথ্যে গরু খোঁজা করে, ফিরে এসে দেখে লোকটার সঙ্গীও নেই। আর নেই—

বললুম, কী নেই ?

বল্টুদা বললে, এক ঝুড়ি পটোল। ভীষণ মন খারাপ করে হিসেবের খাতায় লিখে রাখলে : "সাত সের তের ছটাক পটল কেহ বাকীতে লইয়া গেল। তাহার নাম-ঠিকানা কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না।" আর সেই হিসেব দেখে ওর বাবা—

—ওর বাবা কী করলে ?

বল্টুদা চোখ মিট-মিট করে বললে, পরে বলব। ওই যে অভিলাষ আসছে।

সত্যিই অভিলাষ আসছে। নিজের হাতে করে আনছে দুটো প্লেট। তাতে ডবল ডিমের ওমলেট, দুটো করে প্লাম কেক আর চারটে করে টোস্ট !

বল্টুদা বললে, বাঃ, তোফা !—তারপর প্রায় অভিলাষের হাত থেকে প্লেট কেড়ে নিয়েই খাওয়া শুরু করে দিল। আর আহ্লাদী আহ্লাদী মুখ করে পাশে দাঁড়িয়ে রইল অভিলাষ। কী খুশি !

—ওমলেট কেমন হয়েছে বল্টুদা ?

—খাসা ! তোকে তো উৎসাহ দিতেই এলুম অভিলাষ ! তোর ওমলেট খেয়েই বুঝতে পারছি—তোর ভবিষ্যৎ কী নিদারুণ উজ্জ্বল !

অভিলাষের চোখ-মুখ চক-চক করে উঠল।—তাই নাকি ?—

—তবে আর বলছি কী ? তোর রেঁস্তোরাঁ দিনের পর দিন ফেঁপে উঠবে দেলখোসকে মেরে বেরিয়ে যাবে।

—সত্যি ?—আনন্দে অভিলাষ বার দুই খাবি খেল।

—তা ছাড়া কী ? তারপর তোর রেঁস্তোরাঁ আরো বড় হবে—গ্র্যাণ্ড হোটেলকেও ছাপিয়ে উঠবে। গ্রেট ইস্টার্ন বা ফিরপোতে না গিয়ে দলে দলে লোক ছুটে আসবে তোর দোকানে। চাং-ওয়ার চাউ চাউ হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকবে আর তুই গদী-আঁটা চেয়ারে বসে খালি টাকা গুনতে থাকবি।

বক্তৃতা আর খাওয়া সমানে চলছে বল্টুদার। আমিও যতটা পারি চট্‌পট্ প্লেট সাফ করছি। কখন যে কী হয়ে যায় কিছুই তো বলা যায় না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানিকক্ষণ নেচে নিলে অভিলাষ ; তারপর দৌড়ে যেতে যেতে বলে গেল, বোসো, তোমাদের জন্যে ভালো করে ডবল কাপ চা নিয়ে আসি দুটো।

বল্টুদা শেষ প্লাম কেকটা গোগ্রাসে গিলতে গিলতে বললে, কেমন বুঝছিস্ ?

বললুম, ভালো নয়। পকেটে যদি টাকা না থাকে—

—টাকা ? টাকা কী হবে ? উৎসাহ দেবার শক্তি থাকলেই যথেষ্ট। দেখছিস্ না—এর মধ্যেই কেমন নাচতে শুরু করেছে অভিলাষ ? আর তাও ভেবে দ্যাখ প্যালা— ঝট্ করে কি রকম ওর রেঁস্তোরাঁটাকে গ্র্যাণ্ড হোটেলের চাইতেও বড় করে দিলুম। আর কী চাই ? হুঁ হুঁ !

—মুখে বললেই তো হয় না !

—মুখে বলব না তো কান দিয়ে বলব নাকি ? কিন্তু তুই তো আমায় ভাবিয়ে তুললি, সত্যিই তো—কান দিয়ে কি বলা যায় ? অবিশ্যি নাক দিয়ে কেউ কেউ ঘুমের সময় বলে বটে, কিন্তু কী যে বলে তা বোঝাই যায় না। বোধ হয় হিব্রু বলে। না কি জার্মান ভাষা ? ঘুঃ-ঘুরুর—ঘুরুর—আচ্ছা, চীনে ভাষা না তো ? তোর কী মনে হয় প্যালা ?

www.boiRboi.blogspot.com

নাকের ডাকের ভাষাটা যে কী বোঝবার আগেই অভিলাষ চা আনল। কী মনে হয় তা আর বলতে পারলুম না।

বল্টুদা আর আমি বেশ মন দিয়ে চা-টা শেষ করলুম। তারপর ধীরে সুস্থে—গোটা দুই ঢেঁকুর তুলে বল্টুদা উঠে দাঁড়াল। আমিও তক্ষুণি একেবারে দোরগোড়ায়—এইবারে যা হওয়ার হবে—এস্পার ওস্পার।

বল্টুদা বললে, জোর খাইয়েছিস ! দ্যাখনা—বছর ঘুরতে না ঘুরতে তুই দেলখোসকে মেরে দিবি। তারপর ফিরপো—গ্রেট ইস্টার্ন—গ্র্যাণ্ড হোটেল—

আনন্দে অভিলাষ হাঁসের মতো হাঁসফাঁস করতে লাগল।

—তা হলে চলি—

—এই যে বিলটা—অভিলাষ একখানা কাগজ এগিয়ে ধরল : পাঁচ টাকা বারো আনা—

—কিসের বিল ? কিসের টাকা ?—বল্টুদা যেন আকাশ থেকে পড়ল।

আর অভিলাষ পড়ল—না, আকাশ থেকে নয়, সোজা স্পুটনিক থেকে।

—বা-রে, পাঁচ টাকা বারো আনার খেলে দুজনে মিলে ?

বল্টুদা বললে, মোটে পাঁচ টাকা বারো আনার ? তা হলে তোর কাছে আরো চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা পাওনা রইল।

অভিলাষ এবার স্পুটনিক থেকে—না-না, সোজা চাঁদ থেকে পড়ল। পাঁচ বার খাবি খেয়ে বললে, চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা মানে ? আমি আবার কবে তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি ? কক্ষণো না। তুমি এক পয়সাও পাও না আমার কাছ থেকে।

—বটে ? বসে বসে পঞ্চাশ টাকার উৎসাহ দিইনি এতক্ষণ ? বলিনি—লেগে থাক অভিলাষ—শেষে গদী-আঁটা চেয়ারে বসে টাকা গুনবি ? সেই থেকে তো মোটে পাঁচ টাকা বারো আনা শোধ হল।

অভিলাষ বললে, আঁ—আঁ—আঁ—

—আঁ-আঁ-আঁ নয়, বল্ হাঁ হাঁ হাঁ। আর তোর হিসেবের খাতায় লিখে রাখ : "কেহ পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়া পাঁচ টাকা বারো আনার খাইয়া গেল। পরে ক্রমশঃ বাকীটা খাইবে।" আচ্ছা চলি, টা-টা—

অভিলাষ হাঁ—হাঁ বলতে পারলে না—একেবারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। বেচারা অভিলাষ ! বল্টুদার পাল্লায় পড়ে ওকে অমন ভাবে ঠকানোটা একদম ঠিক হল না—না খেলেই ভালো হত বল্টুদার সঙ্গে। কিন্তু আমি কী করতে পারি ? আমার পকেটে তো মোটে তিনটে নয়া পয়সা ছাড়া কিছু নেই ! যদি কোনো দিন যোগাড় করতে পারি, ওর টাকা নিশ্চয় শোধ করে দেব ; এ সব জোচ্চুরিতে আমি নেই !

ভীষণ রাগ হল বল্টুদার ওপর। ট্রামে উঠতে যাচ্ছি—বল্টুদা ঠ্যাং ধরে আমায় টেনে নামাল।

—কোথায় যাচ্ছিস

—যাব একবার বলাই ড্যাং লেনে।

—ও, আমাদের পাঁচুগোপালের বাড়িতে ? তা চল্—চল্। ওর ক্ষেমঙ্করী পিসিমা বেশ ভালো খাওয়ায়।

কী রাক্ষস দেখেছ ? এই মাত্র অভিলাষের মাথায় কাঁটাল ভেঙে এতগুলো খেয়ে এসেছে। আবার এক্ষুণি খাই খাই করছে !

বললুম, আজ গিয়ে সুবিধে হবে না। পাঁচুগোপাল ফুটবল খেলতে গিয়ে পা মচকে পড়ে আছে।

—পা মচকে পড়ে আছে ? আহা, চুক চুক ! তা হলে তো ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে আরো বেশি করে যাওয়া দরকার। চল্-চল্—

একটা হ্যাঁচকা টানে বন্টুদা আমায় ট্রামে তুলে ফেলল।

পাঁচুগোপালের বাড়ি গিয়ে কড়া নাড়তে ওর ক্ষেমঙ্করী পিসিমা দরজাটা খুলে দিলে। বন্টুদা সঙ্গে সঙ্গে এক মুখ দাঁত বের করে ফেলল। গলেই গেল বলতে গেলে।

—পাঁচু কেমন আছে দেখতে এলুম পিসিমা !

ক্ষেমঙ্করী পিসিমা ভারী খুশি হলেন : আহা বাবা, আয় আয়। বাছা আমার আজ দু'দিন থেকে মনমরা হয়ে শুয়ে আছে।

—সেই জন্যেই তো এলুম। শরীর খারাপ বলেই তো ওকে ভালো করে উৎসাহ দেওয়া দরকার।

—তাই দে বাবা। আমি তোদের জন্যে ক'টা তালের বড়া ভেজে আনি।

সত্যিই তালের বড়ার গন্ধে বাড়ি ম-ম করছিল। বন্টুদা মুখটাকে ছুঁচোর মতো ছুঁচোলো করে আমায় চুপি চুপি বললে, দেখলি তো প্যালা—হুঁ-হুঁ ! কেমন প্রেমসে গরম গরম তালের বড়া খাওয়া যাবে। কপাল ভালো থাকলে এমনিই হয়। এখন চল্ দেখি— পেঁচোটা কী করছে।

পায়ে চুন-হলুদ মাখিয়ে পাঁচুগোপাল প্যাঁচার মতো পড়ে আছে। বন্টুদা গিয়ে ধপাৎ করে তার পাশে বসে পড়ল।

—কিরে পেঁচো, কেমন আছিস ?

পাঁচু চিঁ-চিঁ করে বললে, ভীষণ ব্যথা।

—ভীষণ ব্যথা ?—বন্টুদা উৎসাহ দিতে লাগল : অমন হয়। ব্যথা হতে হতে শেষে সেপ্টিক হয়ে যায়।

পাঁচুগোপাল ভীষণ ঘাবড়ে গেল : মচকানি থেকে সেপ্টিক হয় ?

—হয় বই কি ! অনেক সময় পা কেটে ফেলতে হয়—কত লোকে মরেও যায় !

পাঁচুগোপালের চোখ কপালে চড়ে গেল : অ্যাঁ—আমি তবে মারা যাব নাকি ?

উৎসাহ দিয়ে বন্টুদা বলতে লাগল, যেতে পারিস্—কিছু অসম্ভব নয়। তবে মারা না-ও যেতে পারিস্—মানে, মনে জোর থাকলে বেঁচে গেলেও বেঁচে যেতে পারিস। তবে একটা পা কাটা গেলেও ঘাবড়াস্নি। না হয় লাঠি ভর করেই হাঁটবি। আর যদি মারাই যাস্—মনে কর মারাই গেলি—তা হলেও ঘাবড়ে যাস্নি। দেখিস্ পেঁচো—বন্টুদা আরো বেশি উৎসাহ দিতে লাগল : তোর মৃত্যুর পর আমরা কি রকম একখানা শোকসভা—

বন্টুদা আর বলতে পারল না—শব্দ হল ঝপাং ! 'বাপ—বাপ' বলে বন্টুদা লাফিয়ে উঠল।

ক্ষেমঙ্করী পিসিমার ঝাঁটা আবার নামল বন্টুদার পিঠে। পিসিমা যে কখন ঘরে ঢুকেছে আমরা দেখতে পাইনি।

বিকট রকম দাঁত খিঁচিয়ে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল : তবে রে অলপ্পেয়ে—নচ্ছার, ড্যাকরা, হাড়হাবাতে ! আমার পাঁচুর ঠ্যাং কাটা যাবে ? আমার পাঁচু মারা যাবে ? তার আগে তোরই মরণ ঘনিয়েছে—দেখে নে !

আবার ঝাঁটা নামল : ঝপাং—ঝপাং—

—বাবারে গেছি—গেছি—বলে বন্টুদা ছুটল। পেছনে ছুটল ঝাঁটা হাতে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা। কী আর করা—আমাকেও ছুটতে হল সঙ্গে সঙ্গে।

সন্ধেবেলা গেছি বন্টুদার বাড়িতে। গায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পড়ে আছে বন্টুদা। ঝাঁটার ঘায়ে বন্টুদাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা। উৎসাহ দেবার পালা আমার এবার।

বললুম, কিছু ভেবো না বন্টুদা। ঝাঁটার ঘায়ে যদি সারা গা সেপ্টিক হয়ে যায়—যদি তুমি মারাই যাও তা হলেও কিছু চিন্তা কোরো না ! অভিলাষের দোকানে তোমার যে চুয়াল্লিশ টাকা চার আনা পাওনা আছে—সেটা আমিই খেয়ে আসব এখন।

কিন্তু বন্টুদা একদম উৎসাহ পেল না। চেঁচিয়ে আমায় গাল দিতে লাগল : বেরো—বেরো এখান থেকে ! উল্লুক—ভল্লুক-শল্লকী— পক্কবিম্ব—অন্নজান কোথাকার—

কী ছোটলোক—দেখেছ ?

www.boiRboi.blogspot.com

গজকেষ্টবাবুর হাসি

আমাদের পাড়ার গজকেষ্টবাবুকে নিয়ে ভারী মুশকিলেই পড়া গেছে !

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—ভদ্রলোক হাসতে ভালোবাসেন। আর সে হাসি সাংঘাতিক।

কথাটা বোধ হয় বুঝতে পারছ না ? ভাবছ, হাসতে ভালোবাসেন—তাতে আর ক্ষতিটা কী !

সাংঘাতিক হাসেন—তাতেই বা কী আসে যায় ? বরং ভয়ঙ্কর গোমড়ামুখো লোকের চাইতে হো-হো-হা-হা- করে হাসিয়ে লোক তো ঢের ভালো।

হুঁ-হুঁ, মোটেই তা নয়। গজকেষ্টবাবু তো শুধু হাসেনই না—একবার যদি তাঁর হাসি পায়, তা হলে তিনি মারাত্মক হয়ে ওঠেন। তখন আশ-পাশের লোককে তিনি কাঁদিয়ে ছাড়েন। তাই যক্ষুণি তিনি হাসবার জন্য হাঁ করেন, তক্ষুণি আমরা 'বাপরে-মা-রে' বলে যে যেদিকে পারি ছুটে পালাই।

তা হলে আর একটু খুলেই বলি।

এই তো সেদিন আমাদের পটলডাঙার নকুড়বাবু কাঁধে একটা মস্ত চালকুমড়ো নিয়ে যাচ্ছেন। নকুড়বাবুর মাথা জোড়া চকচকে টাক—একটি চুল পর্যন্ত কোথাও নেই। তাই দেখে হাবুল সেন আমাকে বলছিল, মজাটা দ্যাখছস্ প্যালা ? নকুড়বাবুর মাথা আর চালকুমড়াটা দ্যাখতে ঠিক একই রকম ! মনে হইত্যাছে নকুড়বাবুর কান্ধের উপর দুইটা মাথা উঠছে !

ব্যাস—আর যায় কোথায় !

পাশ দিয়ে গজকেষ্টবাবু যাচ্ছিলেন। হাবলার কথা শুনেই তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। আকাশ-জোড়া হাঁ করে ত্রিশটা দাঁত (মানে, দুটো পড়ে গেছে) বার করে হাড়ি-হাড়ি শব্দে হাসতে হাসতে হঠাৎ জাপটে ধরলেন হাবুলকে। তারপরেই হাবুলের কাঁধের ওপর খ্যাঁক্ করে এক কামড় !

—খাইছে—খাইয়া ফেলছে—কম্মো সাবছে—বলে তো হাবুলের তারস্বরে চীৎকার।

আমরা সকলে মিলে ছাড়াতে গেলুম—কিন্তু ছাড়ানো কি সোজা! অনেক কষ্টে হাবুলকে বের করে আনা গেল, কিন্তু তার মধ্যেই গজকেষ্টবাবু প্যাঁচ্ করে আমার বাঁ কানটা কামড়ে দিলেন আর ক্যাবলাকে দিলেন একটা ঘুষি বসিয়ে।

মানে, হাসি পেলে ওঁর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হাসির সঙ্গে সঙ্গে যাকে সামনে পান আঁচড়ে-কামড়ে, কিল-ঘুষি মেরে অস্থির করে তোলেন।

গত বছরের ব্যাপারটাই শোনো। সরস্বতীপূজোর সময় মাইকে বাজানোর জন্যে কতগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড আনা হয়েছে। তাই থেকে সবে একটা হাসির গান বাজাতে শুরু করেছে আমাদের টেনিদা, আর তৎক্ষণাৎ—

বাজারের ভেতরে তাড়া খেয়ে গোরু যেমন করে দৌড়োতে থাকে তেমনিভাবে ছুটতে ছুটতে এসে ধাক্কা দিয়ে, তাকে মাড়িয়ে গজকেষ্টবাবু এসে হাজির। তাই দেখে রেকর্ডফেরত ফেলে টেনিদা তো এক লাফে উধাও। তখন গজকেষ্টবাবু করলে কি—হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন, তারপর উঠে একসঙ্গে খান বারো রেকর্ডই তুলে নিয়ে মারলেন এক আছাড়! আর দেখতে হল না—বারোখানা রেকর্ডেরই বারোটা বেজে গেল! তা হলেই বোঝো কী ভয়ঙ্কর ওঁর হাসি!

এমনিতে কিন্তু খাসা মানুষ। পূজোর চাঁদা চাই? আচ্ছা, তক্ষুণি দিলেন পঞ্চাশটা টাকা। পাড়ার কারো আপদ-বিপদ হলে গজকেষ্টবাবু অমনি সেখানে হাজির। কোনো বাড়ির রুগীকে রাত দুটোর সময় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে? গজকেষ্টবাবু নিজের মোটর গাড়ি নিয়ে তক্ষুণি চলে আসবেন। এমন লোকের ওপর তো রাগও করা যায় না!

ওঁর মোটর গাড়ির কথাই ধরো না। বললেই তোমাকে গাড়িতে চাপাবেন, যেখানে যেতে চাও পৌঁছে দেবেন। কিন্তু গাড়ি চালাতে চালাতে যদি ওঁর হাসি পায় আর দেখতে হবে না। তখন তুমি পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে কিনা সন্দেহ। এই তো দু'মাস আগে আমি আর আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা মেট্রো সিনেমা থেকে বায়োস্কোপ দেখে বেরিয়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি—গজকেষ্টবাবু এসে ঘস করে আমাদের দেখে গাড়ি থামালেন।

—বাড়ি ফিরবে বুঝি?

আমরা বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ?

—তা হলে উঠে পড়ো গাড়িতে।

আমরা দারুণ খুশি হয়ে উঠেছি ওঁর গাড়িতে। দিব্যি মজাসে যাচ্ছি, হঠাৎ ফুচুদাই গোলমাল করে ফেলল। সিনেমার শোনা একটা হাসির গান বিচ্ছিরি বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল—

এক ছিল মৌখিক ব্যাং
সরু সরু মোজাপরা ঠ্যাং
সাবান মাখত আর গাইত পুকুরঘাটে বসে
ট্রালা-লা-লা-লা-লা-লা-গ্যাং—

আমি আঁতকে উঠে ফুচুদাকে বলতে গেছি—'আরে করছ কি—সর্বনাশ হয়ে যাবে,' কিন্তু তার আগেই যা হওয়ার হয়ে গেছে! বিকট আওয়াজ করে হেসে উঠেছেন গজকেষ্টবাবু। এক প্যাকেট মাখন আর দুটো পাঁউরুটি কিনেছিলেন, সেগুলো ছুঁড়ে দিয়েছেন রাস্তায়, একজন দাড়িওলা ভদ্রলোকের মুখে গিয়ে লেগেছে মাখনের প্যাকেট—দাড়িতে মাখন মাখামাখি, রুটির ঘা খেয়ে একজন উড়িয়া চাকর 'বাপ্পো-বাপ্পো' বলে চেঁচিয়ে উঠছে আর—

আর মোটর গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে পা দুটো সামনের উইণ্ডস্ক্রীনে তুলে দিয়ে দু হাত ছুঁড়ে গজকেষ্টবাবু হাসছেন হা-হা-হা-হাউ-হাউ-হাউ—

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা মেরেছে সামনের ল্যাম্প-পোস্টে।

ভাগ্যিস আস্তে যাচ্ছিল গাড়ি, তাই মাথায় পেটে বেশম কাঁকুনি খেয়েই আমরা এ যাত্রা পার পেয়ে গেলুম। স্পীডে চললে আর দেখতে হল না—ব্যাস্, ওইখানেই খেলা খতম। একদম হালুয়া হয়ে যেতুম আমরা।

তারপর থেকে আমরা ওঁর মোটর গাড়ির ত্রিসীমানাতে নেই। সর্বনাশ! ওঁর গাড়িতে চড়া মানেই মহাযাত্রার রাস্তায় পা বাড়ানো। কখন কী বলে ফেলব, হাসতে হাসতে উনি স্টিয়ারিং ছেড়ে দেবেন—আর তারপরে! কী মুশকিলের ব্যাপার দ্যাখো দেখি।

ক্যাবলার খুড়তুতো ভাই মেণ্টুর মুখে ভাত। আমরা খেতে গেছি। জোর খাওয়া-দাওয়া চলছে। বেগুনভাজা, ঘ্যাঁট,শাক-চচ্চড়ি, মুগের ডাল, ফ্রাই আর মাছের কালিয়া এসব খাওয়ার পর এসেছে মাংস-পোলাও। বেশ জমিয়ে খাচ্ছি—গজকেষ্টবাবু সবে খান বারো মাছ খেয়ে মাংসের দিকে মন দিয়েছেন এমন সময়—কে একজন আর একজনকে বললে, এই, অত মাংস খাসনি। বেশি পাঁঠার মাংস খেয়ে শেষে পাঁঠা হয়ে যাবি, আর ব্যা-ব্যা করে ডাকবি।

এমনিতেই প্রাণ ভরে খেতে খেতে গজকেষ্টবাবুর মেজাজ বেশ খোশ হয়ে ছিল, তার উপর কথাটা যেই শুনেছেন ব্যাস্।

তড়াক করে পাতা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। কথাটা যে বলেছিল এক লাথি দিয়ে তার পাতাটা উল্টে দিলেন, জলের গেলাসটা আর এক ভদ্রলোকের কোলের উপর গিয়ে পড়ল। সে ভদ্রলোক ঐ-ঐ-ঐ- করে উঠতে গজকেষ্টবাবু তার হাঁটুটা খ্যাঁক করে কামড়ে দিলেন, তারপর—

হো হো হো হিয়া হিয়া করে হাসতে হাসতে গিয়ে গজকেষ্টবাবু চেপে ধরলেন আমাদের বল্টুদাকে। বল্টুদা মাংস পরিবেশন করছিল। গজকেষ্টবাবু করলেন কি, মাংসের বালতিটা কেড়ে নিয়ে সোজা ঢেলে দিলেন বল্টুদার মাথায়। বল্টুদা 'ইঁয়া ইঁয়া ঐঃ ঐঃ' করে লাফাতে লাগল, গা আর গেঞ্জী বেয়ে পড়তে লাগল মাংসের ঝোল, আর সব মিলে বল্টুদাকে ঠিক একটা ঝোল-মাখানো গ্রেভি চপের মতো মনে হল। মানে একটা গ্রেভি চপ লাফাতে থাকলে যেরকম দেখায় সেই রকম হল আর কি ব্যাপারটা।

কী যে বিচ্ছিরি হল বুঝতেই পারছ—যাকে বলে দক্ষযজ্ঞ! এদিকটায় যারা বসেছিল তাদের তো খাওয়াই পণ্ড হয়ে গেল। নেহাৎ গজকেষ্টবাবু বলেই পার পেলেন আর কোনো লোক হলে সবাই মিলে পিটিয়ে পোস্ত-চচ্চড়ি বানিয়ে দিত। তাই বলছিলাম গজকেষ্টবাবু হাসলেই তোমার কান্নার পালা। কাছাকাছি যদি থাকো, একেবারে দফা নিকেশ করে ছেড়ে দেবেন।

আমরা সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। গজকেষ্টবাবুকে দূরে আসতে দেখলেই সব্বাই একেবার রামগরুড়ের ছানা সেজে বসে যাই—এমন মুখ করে থাকি যে, এক্ষুণি বুঝি কেঁদে ফেলব।

সেদিন তো গজকেষ্টবাবু জিজ্ঞেসই করে বসলেন, কিহে, তোমরা যে সব হাঁড়ির মতো মুখ করে আছো? হয়েছে কি?

হাবুল সেন পট্ করে বলে ফেলল, আমরা মনে বড় দুঃখ পাইছি।

—কেন, দুঃখটা কিসের?

—আহা মইর‍্যা গেলেন, আহা বড় ভালো লোক আছিলেন—

—কে মারা গেলেন? গজকেষ্টবাবু জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলেন : কে ভালো লোক ছিলেন? হাবুল তো দারুণ প্যাঁচে পড়ে গেল! কে মারা গেল সেটা ও একেবারেই ভাবেনি। হাবুলকে মাথা চুলকোতে দেখে ক্যাবলা বললে, ইয়ে মানে—গদাধরবাবু, খুরুটের গদাধরবাবু। তিনিই মারা গেছেন কালকে।

আন্দাজী একটা যা-খুশি বলে দিয়েছিল ক্যাবলা, কিন্তু গজকেষ্টবাবুর হাত থেকে নিস্তার

www.boiRboi.blogspot.com

পাওয়া শক্ত। গজকেষ্টবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, খুরুটের গদাধরবাবু ? মানে গদাধর পাল ? আরে সে মারা যাবে কেন ? একটু আগেই তো শালকেতে তার সঙ্গে আমার দেখা হল।

তখন আমি বললুম, না—না গদাধর পাল নয়, গদাধর পাঁড়ে। খুরুটে নয়—খুর্দা রোডে থাকত। সে-ই মারা গেছে। তার জন্যেই আমরা শোকে কাতর হয়ে—

গজকেষ্টবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তক্ষুণি একটা কাণ্ড হল।

সামনেই রাস্তা দিয়ে প্রাণধনবাবু গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে আপন মনে চলছিলেন। আচমকা একটা কলার খোসায় তাঁর পা পিছলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধড়াম্ করে এক আছাড়।

দেখেই আকাশ কাঁপিয়ে, আমার পেটের পালাজ্বরের পিলেটাকে চমকে দিয়ে এক ভয়ঙ্কর অট্টহাসি হাসলেন গজকেষ্টবাবু আর তীরের মতো ছুটে গেলেন প্রাণধনের দিকে।

আমরাও 'গেল—গেল' বলে ছুটলুম। প্রাণধনবাবু আছাড় খেয়েছেন বলে নয়— এইবার গজকেষ্টর হাতে তিনি পড়ে যাবেন।

যা ভেবেছি, ঠিক তাই।

প্রাণধনবাবু সামলে নিয়ে যেই উঠে দাঁড়িয়েছেন, অমনি গজকেষ্টবাবু গিয়ে ক্যাঁক্ করে ধরেছেন তাঁকে। হ্যাঃ—হ্যাঃ করে হাসতে হাসতে প্রথমেই প্রাণধনের নাকটা কামড়ে দিলেন।

প্রাণধন 'ইঁ—ইঁ—ইঁরে বাপ্'—বলে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠতেই গজকেষ্টবাবু দমাদম্ ঘুষি চালাতে লাগলেন তাঁর ওপর। প্রায় পঞ্চাশজন লোক জড়ো হয়ে যখন তাঁকে গজকেষ্টবাবুর খপ্পর থেকে বের করে আনল, তখন প্রাণধন প্রায় অজ্ঞান। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে—গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে।

সকলে গজকেষ্টবাবুকে যাচ্ছেতাই বলে বকতে লাগল।

—ছিঃ ছিঃ মশাই—আপনি কি খুনে নাকি ? এখুনি যে মেরে ফেলছিলেন ভদ্রলোককে।

লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেলেন গজকেষ্টবাবু। নিজের মোটরে চাপিয়ে প্রাণধনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। ঘণ্টা খানেক পরে নাকে মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে প্রাণধন বেরুলেন হাসপাতাল থেকে। আর তাঁর ফ্যাটা-বাঁধা সেই অদ্ভুত চেহারা দেখেই গজকেষ্টবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেল। খি—খি—খিক্-খিক্ বলে একটা বিদ্‌কুটে আওয়াজ তুলে ছুটলেন প্রাণধনের দিকে। একেবারে সোজা চার্জ।

কিন্তু প্রাণধনও এবার হুঁশিয়ার হয়ে গেছেন। তিনি 'ওরে বাবা' বলে একখানা পেল্লায় লাফ মারলেন, তার পরে 'সারলে রে—' বলে রাম টীৎকার তুলে এমন দৌড় লাগালেন যে, তার কাছে অলিম্পিক রেকর্ড কোথায় লাগে !

গজকেষ্টবাবু প্রাণধনকে ধরতে পারলেন না—তার বদলে একটা পাহারাওলাকে ধরতে গেলেন।

'আরে বাপ্—ই ক্যা হৈ'—বলে পাহারাওলা পালাতে গিয়ে একটা ষাঁড়ের ঘাড়ে উল্‌টে পড়ল। গজকেষ্টবাবু ষাঁড়টাকেই কামড়াতে যাচ্ছিলেন—সেই সময় আমরা সবাই মিলে ওঁকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এসে গাড়িতে তুললুম। তারই ভেতর গজকেষ্টবাবু খ্যাঁচ করে আমার ডান কানটা কামড়ে দিলেন !

ভাগ্যিস আমাদের মধ্যে হাবুল মোটর চালাতে জানে। সে-ই তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে পালিয়ে এল ওখান থেকে। নইলে গজকেষ্টবাবুকে ঠিক পুলিসে ধরে নিয়ে যেত।

কিন্তু এই ক'দিন হল গজকেষ্টবাবুর হাসি একদম বন্ধ হয়ে গেছে। গজকেষ্টবাবু আর হাসেন না—হাসির কথা শুনলে আর তেড়ে গিয়ে কাউকে আক্রমণ করেন না। বরং কোনো হাসির

www.boiRboi.blogspot.com

কথা বললে ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়—যেন বাঘ দেখেছেন, এম্‌নিভাবে ছুটে পালান সেখান থেকে।

এই অঘটন ঘটিয়েছেন প্রাণধনবাবু।

হাঁ—প্রাণধনই ঘটিয়েছেন। একেবারে নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছেন যাকে বলে।

প্রাণধনকে আমরা সবাই নিরীহ ভালো মানুষ বলেই জানতুম। তাঁর মনে যে এত তেজ, এমন প্রতিহিংসা আছে তা কে জানত।

সেদিন দেখি রাস্তার মাথায় প্রাণধনবাবু তাঁর ভাগনে কানাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কানাই দারুণ পালোয়ান—গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তি লড়ে। দু'জনে মিলে ফিস্-ফিস্ করে আলাপ চলছে। প্রাণধনের হাতে দেখলুম লেবেল-মারা একটা শিশি। তার গায়ে লেখা কুইনিন মিক্‌শ্চার।

জিজ্ঞেস করলুম, হাতে কুইনিন মিকশ্চার কেন প্রাণধনবাবু ? কারো অসুখ নাকি ?

প্রাণধনবাবু ঠোঁটে আঙুল দিলেন। আমি দেখলুম দুলতে দুলতে গজকেষ্টবাবু আসছেন।

প্রাণধনবাবুর মতলবটা কী বোঝবার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময় কানাই গলা ছেড়ে গর্দভ রাগিণীতে গান ধরল :

'এক যে ছিল গাধা
পেণ্টুলুন কিনবে বলে
আদায় করত চাঁদা—'

যেই গেয়েছে—মাঝপথে অমনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন গজকেষ্টবাবু। কানাই আরো গলা চড়িয়ে গাইতে লাগল :

'বলত সেই গাধা :
চার আনা করে সবাই আমায়
দিয়ে যাবেন দাদা—'

—হৌ-হৌ-হৌ-হোয়া বলে গগনভেদী অট্টহাসী হাসলেন গজকেষ্টবাবু—তার পরেই দমদম বুলেটের মতো তেড়ে এলেন কানাইয়ের দিকে।

কানাইও তৈরিই ছিল। 'হা-রে-রে-রে-রে' বলে হাঁক ছেড়ে সে তক্ষুণি ধপাক করে গজকেষ্টবাবুকে ধরে ফেলল, তারপর পাকা কুস্তিগীরের মতো একখানা ধোপিয়া পাটের প্যাঁচ লাগিয়ে সোজা ফেলে দিলে রাস্তার ওপর। গজকেষ্টবাবুকে একেবারে চিৎ করে ফেলে কানাই তাঁর ওপর চেপে বসল।

গজকেষ্টবাবু ভীষণ ভেবড়ে গেলেন। এতকাল হাসতে হাসতে তিনিই সকলকে আক্রমণ করেছেন, পালটা এমন বেয়াড়া কুস্তির প্যাঁচের জন্যে আদৌ তৈরি ছিলেন না। তাঁর হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তাঁর হাসি বন্ধ হলে কী হয়—কানাই ছাড়বার পাত্র নয়। সে গজকেষ্টবাবুর ভুঁড়িতে আর পাঁজরায় বেদম সুড়সুড়ি দিতে লাগল। গজকেষ্টবাবু প্রাণের দায়ে খ্যাঁ—খ্যাঁ করে হাসতে লাগলেন—চোখ দুটো তাঁর কপালে চড়ে গেল।

আর তখন—

ঠিক সেই মুহূর্তেই—

কুইনিন মিকশ্চারের ছিপি খুলে তার সবটা গজকেষ্টবাবুর মুখে ঢেলে দিলেন প্রাণধন।

গজকেষ্ট কেবল বলতে পারলেন : ওয়া ওয়াং।

তারপরই প্রাণধন আর কানাই দেখতে না দেখতে এক দৌড়ে হাওয়া ! গজকেষ্ট রাস্তার মধ্যে পড়ে রইলেন গজ-কচ্ছপের মতো। আমি ছুটে গিয়ে গজকেষ্টবাবুকে তুলে বসালুম। গজকেষ্ট বিকট স্বরে বললেন, ওয়াফ্—ওয়াফ্। বাপরে—কী তেতো ! প্যালা—সিরাপ এক বোতল—কুইক্। ওয়াফ্—ওয়াফ্।

গজকেষ্টবাবু আর হাসেন না। তাঁর সেই মারাত্মক হাসি একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। এমন ভয়ঙ্কর দাওয়াইয়ের পর আর কি হাসি আসে কারো ? তোমরাই বলো।

সাহেবের উপহার

ভজকেষ্টবাবু দাওয়ায় বসে আমাকে বোঝাচ্ছিলেন যে, আজকালকার ইস্কুলমাস্টারদের একেবারে মায়া-দয়া নেই। তাঁর ছোট ছেলে প্যাঙা ক্লাসে 'পেটের অসুখে'র মানে লিখেছিল : 'আনহ্যাপিনেস্ অব্ দি বেলী'। তাতে মাস্টার তাকে কান ধরে বেঞ্চে দাঁড় করে দিয়েছে।

ভজকেষ্টবাবু মনে খুব ব্যাথা পেয়ে আমাকে বলেছিলেন তুমিই বলো তো প্যালারাম, পেট খারাপ হলে কি কারু মনে সুখ থাকে ? বাড়িতে হয়তো তখন চিংড়ির কাটলেট ভাজা হচ্ছে,—গন্ধে ম-ম করছে চাদ্দিক, আর যার পেটের অসুখ, সে হয়তো বসে বসে বার্লির জল খাচ্ছে। তখন কি তার হ্যাপিনেস্ থাকে ? আর ওই যে কী একটা শব্দ আছে—'ডায়ারহোইয়া' না কী যেন, ওটা লিখতে এই আমারই তিনটে কলম ভেঙে যায়। এইটুকু পুঁচকে প্যাঙা কেমন করে এই কট্‌কটে বানান লিখবে বলো দিকি ?

'ডাইরিয়া' বানান আমার কাছেও বিভীষিকা—লিখতে বললেই পেট গর-গর্ করে ওঠে। আমি খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলতে যাচ্ছি, 'আজ্ঞে ঠিকই তো', এমন সময় একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল।

ভজকেষ্টবাবুর নতুন হিন্দুস্থানী চাকর যমনা ('যম না' বললে কী হয়, চেহারা প্রায় যমের মতো মস্ত আর কালো) একটা থলে করে বাজার নিয়ে এল। আর দেখা গেল থলের মুখে উঁকি দিচ্ছে একটা কুমড়োর ফালি। দেখেই ভজকেষ্টবাবু মোড়া থেকে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর হুঁকোটা উল্টে গেল, আর তা থেকে বগ্‌বগ্ করে খানিক লালচে ময়লা জল বেরিয়ে আমার পূজোর নতুন স্যাণ্ডেলটাকে ভিজিয়ে দিলে।

ভজকেষ্টবাবু চীৎকার করে বললেন, এই যমনা—তুম কাহে কুমড়ো আনা হ্যায় ?

যম না—অথচ যমের মতো দেখতে, যমনা ভীষণ ঘাবড়ে গেল ! বললে, ই তো বড়িয়া চীজ্ হ্যায় বাবু !

—বড়িয়া চীজ্ ! হামকা মুণ্ডু ! আভি ফেলে দাও কুমড়ো। ওই কুমড়ো যদি বাড়ি মে

ঢুকেগা—তব্ হামি আভি যাঁহা মে চোখ যায়—তাঁহা চলে যায় গা !

যমনা নিজে বোধ হয় ভীষণ কুমড়ো ভালোবাসে—তাই বুকভাঙা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কুমড়োটা তুলে ছুঁড়ে দিলে রাস্তায়। দুটো ছাগল কাছাকাছিই চরছিল—তারা একেবারে 'মার মার' করে কুমড়োর ওপর এসে পড়ল। দু' মিনিটের মধ্যে কুমড়ো ফর্সা ! তারপরে চোখ গোল গোল করে যেভাবে তাকাতে লাগল, তাতে মনে হল যমের মতো যমনাকে সামনে পেলে তাকেও ওরা সাবাড় করে দিত।

যমনা বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছিল। ছাগল দুটো খুব ব্যাজার হয়ে রাস্তা থেকে জুতোর সোল, কিংবা শুকনো পাতা কিংবা পেরেক-টেরেক যাহোক কিছু কুড়িয়ে নিয়ে চিবুতে লাগল। আর আমি ভজকেষ্টবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, কুমড়ো দেখে আপনি অত চটলেন কেন ? চিংড়ি মাছ-টাছ দিয়ে খেতে তো খুব খারাপ লাগে না।

—খারাপ লাগবে কেন ?—ভজকেষ্টবাবুর মুখ করুণ হয়ে উঠল : আমিও তো কুমড়ো খেতে খুবই ভালোবাসতুম। কেউ কুমড়োর ছোকা খাওয়াবে বললে আমি দু'মাইল হেঁটে যেতে রাজী ছিলুম তার সঙ্গে। কিন্তু এক মিলিটারী সায়েব—ভজকেষ্ট এবার ফোঁস্-ফোঁস্ করে তিনটে নিঃশ্বাস ফেললেন : সে মর্মভেদী কাহিনী শুনবে প্যালারাম ? বোসো—বলি তা হলে—

তখন আসামে খুব যুদ্ধ হচ্ছে—জানলে ? ওই মণিপুর-টনিপুরের দিকে ! আমি সে সময় যাচ্ছি ডিব্রুগড়ে—আমার বড় মেয়ে ফুটকি ওখানেই থাকে কিনা। তাকে দেখতে যাচ্ছি। সঙ্গে নিয়েছি দশসের নতুন গুড়ের পাটালী। ফুটকি পাটালী খুব ভালোবাসে।

পাণ্ডু থেকে রেলে উঠেছি আর বরাত জোরে পেয়ে গেছি একটা ছোট্ট কামরা ! বেশ শীত পড়েছে। বালাপোশ জড়িয়ে আরামে বসে আছি আর ভাবছি, ফুটকি খাওয়ায়-দাওয়ায় খুব ভালো। আর এই যে নলেন গুড়ের পাটালী নিয়ে যাচ্ছি এ দিয়ে নিশ্চয় রোজ পায়েস তৈরি করবে। দিন সাতেক থাকব, এর মধ্যেই শরীর তেল-তাগড়া হয়ে যাবে।

এই সময় একটা ইস্টিশন থেকে এক মিলিটারী সায়েব এসে ঢুকল। হুঁকোর মতো মুখ, কাঁধে একটা পেল্লায় খাকি ঝোলা। এসে কিছুক্ষণ পিট্-পিট্ করে আমার দিকে তাকালে। আমার কেমন খটকা লাগল। মারধোর করবে কিনা কে জানে—মিলিটারীদের তো বিশ্বাস নেই। ভাবছি পরের স্টেশনেই গাড়ি বদলাব, এমন সময় সায়েবটা আমায় জিজ্ঞেস করলে কাঁহা যায়েগা বাবু ?

ভয়ে ভয়ে বললুম, ডিব্রুগড়।

—ডিব্রুগড় ? ভেরি গুড়।

আমি ডিব্রুগড় যাব—তাতে ওর ভেরি গুড় বলবার মানে কী ? অনেকটা রাস্তা যাব—এই জন্যে ? আর ও আমায় সারা রাস্তা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে, হাতের সুখ করতে করতে যাবে ? ব্যাপারখানা কী ?

গাড়ি তখনো ছাড়েনি। একটা ফিরিওলা কাচের বাক্সে করে পুরী রসগোল্লা এই সব নিয়ে যাচ্ছিল। সায়েব ফস্ করে আমায় জিজ্ঞেস করলে, ওই বক্সমে হোয়াট হ্যায় ? ফুড় ?

আমি বললুম, হাঁ সায়েব, ফুড়।

—উঃ, আই অ্যাম ভেরি হাংগ্রি—এই বলে সায়েবটা ফিরিওয়ালাকে ডাকলে : এই ম্যান—ইধার আও।

ফিরিওলা বাক্স নামালে।

সায়েব খাবার দেখিয়ে আমায় ফের জিজ্ঞেস করলে, হুইচ্ ফুড় গুড় বাবু ? মানে কোন খাবারটা ভালো ?

আমি বাঙালি, বুঝতেই তো পারো রসগোল্লার নামে আমার বুক দু'হাত ফুলে যায়। বললুম,

www.boiRboi.blogspot.com

বাই রসগুল্লা !

—রসগুল্লা ? সুইট ?

বললুম, সুইট মানে ? হেভেন ! একবার খেলে নেভার ফরগেট।

—বটে, তাই নাকি ?—সায়েব খুশি হয়ে চারটে বড় বড় রসগোল্লা কিনে ফেলল। তারপর ফিরিওলা যেতে না যেতেই দুটো রসগোল্লা গালে ফেলে দিলে।

চোখ বুজে বলতে যাচ্ছে গ্রাণ্ড—তার আগেই 'মাই গড্—হোয়াট্' তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। হাঁউ-মাউ করে বললে, ইয়োর রসগুল্লা বাইটিং !

রসগোল্লা কামড়াচ্ছে ! তা কি করে হয় ? রসগোল্লা কি কাউকে কামড়ায় ? রসগোল্লাকেই তো সবাই কামড়ে থাকে।

সায়েব আবার বললে, ওঃ পাপা—বাইটিং এগেন ! ফের কামড়াতা হ্যায়—বলে থু থু করে মুখ থেকে ফেলে দিলে। দেখি—রসগোল্লার ভেতরে তিন-চারটে ডেয়োঁ পিঁপড়ে ! কখন যে ফুটো করে বসে ছিল, ওরাই জানে !

ট্রেন তখন ইস্টিশন ছেড়ে অনেকখানি চলে এসেছে। কোথায় ফিরিওলা—কোথায় কী ! ভাববলুম, এবারে আমি গেছি—মেরে আমাকে ঠিক আলু-চচ্চড়ি বানিয়ে দেবে। আমিই তো ওকে রসগোল্লা কেনার বুদ্ধি বাত্‌লে দিয়েছিলুম।

মনে মনে আওড়াচ্ছি : 'হরে কেষ্ট হরে কেষ্ট, কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে'—আর ভাবছি, সায়েবটা বুঝি এই ফাঁক করে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। কিন্তু কিছুই করলে না। শুধু কিছুক্ষণ হুঁকোর মতো মুখখানাকে গড়গড়ার মতো করে বসে রইল। তারপর বললে, ইণ্ডিয়ান সুইট্ ব্যাড ! ইট্ বাইটস্ ! ওফ্ !

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, ইণ্ডিয়ান সুইট্ কামড়ায় না—কামড়াচ্ছিল ডেয়ো অ্যান্টস্—কিন্তু বলতেই পারলুম না। সায়েবটা গাড়ির তালে তালে দুলে খালি খালি বলতে লাগল : ইণ্ডিয়ান সুইট্ বাইট ! ব্যাড—ব্যাড—ভেরি ব্যাড !

শুনে শুনে আমার যেমন বিচ্ছিরি লাগল, তেমনি রাগ হয়ে গেল। আমরা বাঙালি—সব সইতে পারি, ভেতো—কাপুরুষ যা বলে বলুক, কিচ্ছুটি গায়ে লাগে না—কিন্তু মিঠাইয়ের নিন্দে করলে জাতির অপমান হয়ে যায়। ইচ্ছে করল, সায়েবটাকে নিয়ে একবারে দ্বারিক ঘোষ কিংবা ভীম নাগের দোকানে বসিয়ে দিই—বুঝুক সুইট্ কাকে বলে ! কিন্তু আমাদের সেই চলতি গাড়িতে আমি আর কে. কি. দাসের রসোগোল্লাই বা পাচ্ছি কোথায় ?

রাগ হলে বুদ্ধি হয়—আমারও তাই হল্। বললুম, ইণ্ডিয়ান সুইটের তুমি কী জানো সায়েব। আমার কাছে যে চীজ আছে, তা যদি একটা খাও—তা হলে বাংলাদেশের খেজুরগাছতলায় তুমি রাতদিন গিয়ে বসে থাকবে।

সায়েবটা বললে, হোয়াট্ ?

আমি ঝাঁ করে মস্ত হাঁড়িটা খুলে একখানা পাটালী গুড় বের করে ফেললুম। বললুম, এইটে খেয়ে দ্যাখো তো একবার।

পাটালীর দিকে জুল-জুল করে তাকালে সায়েব।

—ইণ্ডিয়ান চকোলেট ?

—হাঁ, ইণ্ডিয়ান চকোলেট।

—নট্ বাইট্ ?

—ইট্ নট্ বাইট। ইউ বাইট্ ইট্। মানে এ কামড়ায় না—তুমিই একে কামড়াতে পারো।

সায়েব পাটালীটা নিয়ে খানিকটা কী ভাবলে। দিলে এক কামড়—তারপর আর এক কামড়। তারপর তোমায় কী বলব প্যালারাম—হঠাৎ ছুটে এসে আমায় জাপটে ধরলে, আর

'লা-লা-লা-লা' বলে আমার হাত ধরে সেই চলতি গাড়ির মধ্যে নাচতে আরম্ভ করলে।

যত বলি, 'ছাড়ো ছাড়ো—মারা গেলুম', সে কি ছাড়ে ! পাক্কা দশটি মিনিট নিজে নাচলে—আমাকে নাচালে। আমার তখন কোমর টন-টন করছে, মাথা বন-বন করছে। যখন ছাড়লে তখন আমি প্রায় ভির্মি লেগে বসে পড়লুম বেঞ্চির ওপর।

এরমধ্যে সায়েব পাটালীখানা বেমালুম সাবড়েছে ! বললে, ওঃ—কী জিনিস খাওয়ালে ! জীবনে এমনটি আর কোনো দিন—খাইনি। কোথাও লাগে এর কাছে চকোলেট—কেক—জ্যাম-জেলী ! আর আছে ?

দিলুম আর একখানা।

দেখে বললে, ফুল ওয়ান হাঁড়ি ? মানে—এক হাঁড়ি ভর্তি।

বললুম, হাঁ, ফুল ওয়ান হাঁড়ি। আমার মেয়ে ফুটকির জন্যে নিয়ে যাচ্ছি।

—আই ডোন্ট নো ফুটকি-কমা-সেমিকোলন। এই হাঁড়িটা আমি নেব—তুমি আমাকে এটা প্রেজেন্ট করো।

এই সেরেছে ! পুরো দশসের নলেন পাটালী—পঁচিশটি টাকা দাম নিয়েছে ! ইণ্ডিয়ান সুইটের বড়াই দেখাতে গিয়ে আজ্ঞা ফাচাতেই পড়েছি তো ! আমি কাতর হয়ে বললুম, দু-একখানা নিতে চাও তো নাও সায়েব, কিন্তু মাই ডটার, মানে আমার মেয়ে ফুটকি—

—নো ফুটকি—নো সেমিকোলন।. এ হাঁড়ি আমায় দিতেই হবে।

পড়েছি মিলিটারীর পাল্লায়। এমনিতে না দিলে তো জোর করে কেড়ে নেবে। সত্যি বলতে কি, আমার কান্না পেল।

আমার মুখ দেখে বোধ হয় সায়েবের দয়া হল। বললে, মন খারাপ কোরো না বাবু। এমনি নেব না। আমিও এর বদলে কিছু প্রেজেন্ট করব তোমাকে।

—কী প্রেজেন্ট করবে ?—আমি নড়ে উঠলুম। আমার মামাতো ভাইয়ের ছেলে ভাবলা এক মিলিটারী সায়েবকে ভজিয়ে একটা ক্যামেরা বাগিয়েছে। আমারও আশা হল—নির্ঘাৎ দাঁও মারব একটা।

সায়েব বললে, আমার হাতের এই ঘড়িটা দেখেছ ? দুশো ডলার দাম। পছন্দ হয় ?

সোনার ঘড়ি—কী তার জেল্লা ! আমার বুকের ভেতর হাঁকু-পাঁকু করে উঠল। বললুম, আলবাৎ ! খুব পছন্দ হচ্ছে।

সায়েব আস্তে আস্তে মাথা নাড়লে।

—উঁহু, এত তুচ্ছ জিনিস দিয়ে তোমার এমন আশ্চর্য ইণ্ডিয়ান সুইটসের দাম শোধ হয় না। আমার এই আংটিটা দেখছ ?

—দেখছি।

—হীরে বসানো আছে। হাজার ডলার দাম। পছন্দ হয় ?

পঁচিশ টাকার গুড়ের বদলে হাজার ডলার ! আমি অজ্ঞান হতে হতে সামলে গেলুম বলতে গেলে, তিনবার খাবি খেয়ে বললুম, খুবই পছন্দ সায়েব। তুমি ওটাই দাও।

সায়েব আংটিটা খুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী ভেবে থেমে গেল আবার। বললে, উঁহু—না—না ! তোমার সুইটসকে এত সামান্য দাম আমি দিতে পারি না—অপমান করা হয়—তারপর অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে। একটা মস্ত বড় নিঃশ্বাস ফেললে শেষকালে।

বললে, না, এসব নয়। তোমাকে আমি এমন জিনিস দেব, যা পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয়, যা পেলে আমি সব ভুলে যাই—যা আমার চোখের আলো—মনের আশা—মুখের ভালো—বুকের মালা—তাই আমি তোমায় দিয়ে যাব। দিতে প্রাণ আমার চাইছে না, কিন্তু তোমার এই ইণ্ডিয়ান সুইটসের বদলে তা ছাড়া কী-ই বা আমি দিতে পারি !

www.boiRboi.blogspot.com

বলে কিছুক্ষণ কেমন ভাবুক-ভাবুক হয়ে বসে রইল, যেন কেঁদে ফেলবে এমনি মনে হল আমার। গাড়ি তখন একটা বড় ইস্টিশানে এসে থামছে। সায়েব উঠে দাঁড়ালে। কাঁধের মস্ত ভারী খাকি ঝোলাটা আমার হাতে দিয়ে বললে, নাও—এর মধ্যে সে জিনিস আছে। এর তুলনা নেই—এর মতো প্রিয় আমার আর কিছু নেই। অনেক আশা করে যোগাড় করেছিলুম—আবার কবে পাব কে জানে! যাই হোক তোমার ইণ্ডিয়ান চকোলেটের বদলে এই যৎসামান্য উপহার তোমায় দিলুম। আমায় মনে রেখো, বাই-বাই—

বলেই, আমার পাটালী গুড়ের হাঁড়িটা কাঁকালে তুলে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেল। যুদ্ধের সময় স্টেশন ভর্তি মিলিটারী ঘুরছে—কোথায় যে মিলিয়ে গেল কে জানে।

ওই মস্ত বড় ঝোলাটা কোলে নিয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। বুকের ভেতর হাঁকুরপাঁকুর চলছে! কী দিয়ে গেল কে জানে! সংসারে ওর সব চেয়ে প্রিয় জিনিস—চোখের আলো—বুকের কালো—কত কী বললে! হয়তো লাখ টাকার হীরে-মোতিই হবে।

ট্রেন ছাড়লে, কাঁপতে কাঁপতে আমি থলেতে হাত দিলুম। বেশ বড় গোল মতন কী একটা রয়েছে! সেই যে অতিকায় মুক্তোর বিবরণ পড়ি—তাই নাকি?

দেখলুম, বেশ যত্ন করে খবরের কাগজ দিয়ে জড়ানো। আমি টেনে বের করলুম। প্রাণ-পাখী তখন আশা-আনন্দে প্রায় খাবি খাচ্ছে! পঁচিশ টাকার পাটালী গুড়ের বদলে বোধ হয় পেলুম লাখ টাকার জিনিস!

খুলে দেখলুম—কী দেখলুম জানো প্যালারাম? মাঝারি সাইজের একটা কুমড়ো! একটা নিটোল নির্ভেজাল কুমড়ো!

এই তা হলে ওর চোখের আলো—মুখের ভালো! ছ' আনা দামের একটা কুমড়ো গছিয়ে আমার পঁচিশ টাকার পাটালী গুড় মেরে দিলে! তোমায় বলব কি প্যালারাম—আমি তখুনি সেই শোকে—একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

ভজকেষ্টবাবু থামলেন। করুণ গলায় বললেন, জানো প্যালারাম—সেই থেকে আমি কুমড়ো ছুঁই না, কুমড়ো দেখি না। আর দেখলেই পঁচিশ টাকার পাটালীর শোক আমার উথলে ওঠে।

দি গ্রেট ছাঁটাই

—ডি-লা-গ্র্যাণ্ড মেফিস্টোফিলিস—

এই পর্যন্ত যেই বলেছি, অমনি খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে এসেছে টেনিদা।

—টেক কেয়ার প্যালা, সাবধান করে দিচ্ছি। মেফিস্টোফিলিস পর্যন্ত সহ্য করেছি, কিন্তু 'ইয়াক্ ইয়াক্' বলবি তো এক চাঁটিতে তোর কান দুটোকে কোলনগরে পাঠিয়ে দেব।

সেই ঢাউস ঘুড়িতে ওড়বার পর থেকেই বিচ্ছিরি রকমের চটে রয়েছে টেনিদা। ইয়াক্ শব্দ

শুনলেই ওর মনে হয়, এক্ষুণি বুঝি ঝপাং করে গঙ্গার জলে গিয়ে পড়বে। সেদিন গণেশ মামা কায়দা করে ইংরেজীতে বলছিল : ইয়া-ইয়া! শুনে টেনিদা তাকে মারে আর কি!

শেষে হাবুল সেন গিয়ে ঠাণ্ডা করে : আহা, থামাকা চেইত্যা যাও ক্যান্? পেণ্টুলুন পইর‍্যা ইংরাজী কইত্যাছে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিল, কেন, স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ফলাবার দরকারটা কী? এই জন্যেই জাতির আজ বড় দুর্দিন! ... শেষ কথাটা টেনিদা আমাদের পাড়ার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে মেরে দিয়েছে। ওখানে অনেক মিটিং হয়, আর সবাই বলে, জাতির আজ বড় দুর্দিন। কাউকে বলতে শুনিনি, জাতির আজ ভারী সুদিন। অথচ যাওয়ার সময় দেখি, দিব্যি পান চিবুতে চিবুতে মোটরে গিয়ে উঠল। মরুক গে, জাতির দিন যেমনই হোক আমার আজকের দিনটা দারুণ রকমের ভালো। মানে, আজ সন্ধ্যেয় আমাদের বন্টুদার পিসতুতো ভাই হুলোদার বউভাত। বন্টুদা আমাকে খেতে বলেছে। আমি বললুম, বা-রে মন খুশি হলে একটুখানি ফুর্‌তিও করতে পারব না?

—ফুর্‌তি? বলি হঠাৎ এত ফুর্‌তিটা কিসের? আমি সকাল থেকে একটুখানি আলু-কাবলি খেতে পাইনি—চার পয়সার ডালমুটও না। মনের দুঃখে মরমে মরে আছি, আর তুই কুচো চিংড়ির মতো 'লাফাচ্ছিস্?

বললুম, লাফাব না তো কী? আজ হুলোদার বউভাত।

—হুলোদার বউভাত?—টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটার ভেতর থেকে ঘুরৎ করে একটা আওয়াজ বের করে বলল, তাতে তোর কী?

—দারুণ খাটি হবে সন্ধ্যেবেলায়।

—হুলোদার বউভাতে খাটি?

টেনিদার নাক থেকে আবার ফুড়ুৎ করে আওয়াজ বেরুল : মানে নেংটি ইঁদুরের কালিয়া, টিকটিকির ডালনা, আরশোলার চাটনি—

—কক্ষণো না!—আমি ভীষণভাবে আপত্তি করে বললুম, লুচি-পোলাও-মাংস-চপ-ফ্রাই-দই-ক্ষীর-দরবেশ—

টেনিদা প্রায় হাহাকার করে উঠল : আর বলিসনি, আমি এক্ষুণি হার্টফেল করব! সকাল থেকে একটুখানি আলু-কাবলি অবধি খাইনি, আর তুই আমাকে এমন করে দাগা দিচ্ছিস্? গো-হত্যের পাপে পড়ে যাবি প্যালা, এই বলে দিচ্ছি তোকে।

শুনে আমার দুঃখু হল। আমি চুপ করে রইলুম।

—হ্যাঁ রে, আমাকে তো বলেনি।

আমি বললুম, না বলেনি।

—আমি যদি তোর সঙ্গে যাই? মানে, তোর তো পেট-টেট্ ভালো নয়—বেশি খেয়ে-টেয়ে একটা কেলেঙ্কারী যাতে না করিস্, সেইজন্যে যদি তোকে পাহারা দিতে—

আমি বললুম, চালাকী চলবে না। হুলোদার বাবা ভীষণ রাগী লোক। কান পর্যন্ত গোঁফ। দু'বেলা দু'টো একমণী মুগুর ভাঁজেন। বিনা নেমন্তন্নে খেতে গেলে তোমাকে ছাদ থেকে ফুটপাথে ফেলে দেবেন।

টেনিদা ভারী ব্যাজার হয়ে গেল। বললে, আমি দেখছি, যে সব বাবার বড় বড় গোঁফ থাকে তারাই এমনি যাচ্ছে-তাই হয়। বোধ হয় নিজেদের বাঘ সিঙ্গী বলে ভাবে। আর যে সব বাবা গোঁফ কামায় তাদের মেজাজ খুব মোলায়েম। দেখলেই মনে হয় এক্ষুণি মিহি গলায় বলবে, খোকা, দুটো রসগোল্লা খাবে? আর গোঁফওয়ালা বাবাদের ছেলেরা দু'বেলা গাঁট্টা খায়।

এই সকালবেলায় গোঁফ নিয়ে বকবকানি আমার ভালো লাগল না। চলে যাওয়ার জন্যে পা

www.boiRboi.blogspot.com

বাড়িয়েছি, অমনি টেনিদা বললে, খ্যাট্ তো সন্ধেবেলায়—এখুনি গিয়ে কলাপাতা কাটবি নাকি ?

—কলাপাতা কাটব কেন ? আমি কি ওদের চাকর রামধনিয়া ? আমি যাচ্ছি চুল কাটতে।

বলে ডাঁটের মাথায় চলে যাচ্ছি, টেনিদা আবার পিছু ডাকল—কোথায় চুল কাটবি ? সেলুনে ?—চল্, আমি তোর সঙ্গে যাই।

আমার মনে নিদারুণ একটা সন্দেহ হল।

—আবার তুমি কেন ? আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি—তোমার যাবার কী দরকার ?

টেনিদা বললে, দরকার আছে বই কি ! বউভাতের নেমন্তন্ন খাবি—যা-তা করে চুল ছেঁটে গেলে মান থাকবে নাকি ? এমন একখানা মোক্ষম ছাঁট লাগাবি যে, লোকে দেখলেই হাঁ করে থাকবে। চল্, আমি তোর চুল কাটার তদারক করব।

কথাটা আমার মনে লাগল। সত্যিই তো টেনিদা একটা চৌকস লোক—দশ রকম বোঝে।আর চুপি চুপি বলতে দোষ নেই, একা সেলুনে ঢুকতে আমারও কেমন গা ছম-ছম করে। যে রকম কচাকচ কাঁচি-টাচি চালায় মনে হয় কখন কচাং করে একটা কানই বা কেটে নেবে !

বললুম, চলো তা হলে।

প্রথমেই চোখে পড়ল, ওঁ তারকব্রহ্ম সেলুন।

যেই ঢুকতে যাচ্ছি, অমনি হাঁ-হাঁ করে বাধা দিল টেনিদা—খবর্দার প্যালা, খবর্দার। ওখানে ঢুকেছিস্ কি মরেছিস্ !

—কেন ?

—নাম দেখছিস্ না ? ওঁ তারকব্রহ্ম। ওখানে ঢুকলে কী হবে জানিস্ ? সব চুলগুলো কদমছাঁট করে দেবে আর চাঁদির ওপর টিকি বানিয়ে দেবে একখানা ; হয়তো টিকির সঙ্গে ফ্রীতে একটা গাঁদা ফুলও বেঁধে দিতে পারে—কিচ্ছুই বলা যায় না।

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, না, আমি টিকি চাই না, ফ্রী গাঁদা ফুলেও দরকার নেই।

—তবে চটপট্ চলে আয় এখান থেকে। দেখছিস না একটা হোঁৎকা লোক কেমন জুল-জুল করে তাকাচ্ছে ? আর দেরী করলে হয়তো হাত ধরে হিড়হিড় করে ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে।

তক্ষুণি পা চালিয়ে দিলুম। একটু এগোতেই বিউটি-ডি-সেলুনিকা।

একে বিউটি, তায় আবার সেলুনিকা দেখেই আমার কেমন ভাব এসে গেল। বলতে ইচ্ছে করল : সত্যিই সেলুকাস কী বিচিত্র এই দেশ। তারপর কী যেন—রাতে প্রচণ্ড সূর্য-টুর্য—ওসব আর মনে পড়ল না।

—টেনিদা এইখানেই ঢোকা যাক !

শুনেই টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ, এইখানেই ঢুকবি বই কি ! পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল খাস্, তোর বুদ্ধি আর কত হবে !

—কেন ? নামটা তো—

—হ্যাঁ, নামটাই তো ! ঢুকেই দ্যাখনা একবার। ঠিক কবিদের মতো বাবরী বানিয়ে দেবে। পেছন থেকে দেখলে মনে হবে মেম সায়েব হেঁটে যাচ্ছে। আর কেউ যদি তোকে ঠ্যাঙাতে চায়, তা হলে ওই বাবরী চেপে ধরে—

শুনেই আমার বুক দমে গেল। এমনিতেই ছোট কাকা আমার কান পাকড়াবার জন্যে তক্কে তক্কে থাকে, বাবরী পেলে কী আর রক্ষে থাকবে ! কান প্লাস্ বাবরী একেবারে দু'দিক থেকে আক্রমণ !

—না—না, তবে থাক।

আমি বাঁই বাঁই করে প্রায় সিকি মাইল এগিয়ে গেলুম। আর টেনিদা লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে তিন লাফেই ধরে ফেলল আমাকে : বুঝলি প্যালা, সেলুন ভারী ডেঞ্জারাস জায়গা। বলতে গেলে সুন্দরবনের চাইতেও ভয়াবহ। বুঝে সুঝে ঢুকতে না পারলেই স্রেফ বেঘোরে মারা যাবি। সেইজন্যেই তো তোর সঙ্গে এলুম। আর দেখলি তো না থাকলে এতক্ষণে হয়তো তোর ঘাড় ফাঁপানো বাবরী কিংবা দেড় হাত টিকি বেরিয়ে যেত।

—কিন্তু চুল তো ছাঁটাতেই হবে টেনিদা !

—আলবাৎ ছাঁটতেই হবে।—টেনিদার গলার আওয়াজ গম্ভীর হয়ে উঠল : চুল না ছাঁটলে কি চলে ? ছাঁটবার জন্যেই তো চুলের জন্ম। যদি চুল ছাঁটবার ব্যবস্থা না থাকত, তা হলে কি আর চুল গজাত ? দ্যাখনা ক্ষুর আছে বলেই মানুষের মুখে গোঁফ উঠেছে। তবু সংসারে এমন এক একটা পাষণ্ড লোক আছে যারা গোঁফ কামায় না আর ক্ষুরকে অপমান করে।

নিশ্চয় হুলোদার বাবার কথা বলছে। আমার কিন্তু ও-সব ভালো লাগছিল না। বলতে যাচ্ছি 'গোঁফ-টোফ এখন থামাও না বাপু'—এমন সময় দেখি আর একটা সেলুন।

সুকেশ কর্তনালয় ! আবার ইংরেজী করে লেখা : দি বেস্ট্ হেয়ার-কাটিং।

—টেনিদা, ওই তো সেলুন।

—সেলুন ? —টেনিদা ভুরু কোঁচকালে, তারপর নাক বাঁকিয়ে পড়তে লাগল : সুকেশ কর্তনালয়। কর্তনালয় ! বাপস্ !

—বাপস্ !—বাপস কেন ?

টেনিদা এবার বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কট্মট করে কিছুক্ষণ তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎ আমার চাঁদির ওপর পটাং করে গোটা দুই টোকা মেরে বললে, গাঁট্টা খেতে পারবি ?

আমি বিষম চমকে উঠে বললুম, মিছিমিছি আমি গাঁট্টা খাব ? আমার কী দরকার ?

—গুরুজনের মুখে মুখে তক্কো করিস্ ক্যান্ র‍্যা ? য়া বলছি জবাব দে। খেতে পারবি গাঁট্টা ? পাঁচ-দশ-পনেরোটা ?

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, একটাও না, একটা খেতেও রাজী নই।

—সাতটা চাঁটি ?

বললুম, কি বিপদ ! হচ্ছে সেলুনের কথা—চাঁটি আসে কোত্থেকে ?

—আসে-আসে ! চাঁটাবার মওকা পেলেই আসে।

—নে—জবাব দে এখন। খাবি চাঁটি ?

—কক্ষনো না !

—না ?—টেনিদার গলা আরো গম্ভীর : 'জাড্যাপহ' শব্দের মানে জানিস ?

—না।

—উড়ুম্বর ?

—না, তাও জানি না। আমি বিব্রত হয়ে বললুম, যাচ্ছি চুল কাটতে—তুমি কেন যে এসব ফ্যাচাং—

কথাটা শেষ করার আগেই টেনিদা গর্জন করে উঠল : স্তব্ধ হয় রে-রে বাচাল !—তারপর আবার গদা করে বললে, জানিস্ কুটমল মানে কী ? বল্ দেখি, মৎকুণিকা অর্থ কী ?

আমি কাতর হয়ে বললুম, কী যে বলছ টেনিদা, কোনো মানে হয় না ! তুমি কি পাগল, না পারশে মাছ যে খামোকা এই সব বকবক করে—

টেনিদা আবার আমার চাঁদিতে পটাং করে একটা টোকা মারল—ওরে গাধা ! সেলুনের নাম দেখেও বুঝতে পারিস্ নি ? কর্তনালয়, তার ওপর আবার সুকেশ ! ও রকম নাম কে দিতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারে ? কোনো হেড পণ্ডিত। নিশ্চয় ইস্কুল থেকে পেনসন নিয়ে এখন সেলুন খুলেছে। যেই ঢুকবি অমনি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার শিরোরুহ কি সমূলে উৎপাটিত হইবে ?' তুই বুঝতে পারবি না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকবি। তখন রেগে তোকে চাঁটি গাট্টা লাগিয়ে বলবে, 'অরে-রে অনভ্যুন, সত্বর বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক প্রথম ভাগ পাঠ কর'—না—না 'পাঠ করহ'।

শুনে, আমার পালাজ্বরের পিলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তবুও সাহসের ভান করে বললুম, যত সব বাজে কথা, গিয়েই দেখি না একবার।

টেনিদা বললে, যা না, যেতেই তো বলছি তোকে। যা ঢুকে পড়, এক্ষুণি যা—

এমনভাবে উৎসাহ দিলে আর যাওয়া যায় না, আমি তৎক্ষণাৎ এদিকের ফুটপাথে চলে এলুম।

—কিন্তু সেলুনে কি ঢোকা যাবে না টেনিদা ?

টেনিদা চিন্তা করে করে অনেকক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল : আমার মনে হচ্ছে ঢোকা উচিত নয়। একটু ভালো বাংলা-টাংলা যদি জানতিস তা হলেও বা কথা ছিল।

—তবে চুল কাটা হবে না ?—আমার পালাজ্বরের পিলে হাহাকার করে উঠল : কিন্তু ভালো করে চুল ছাঁটতে না পারলে হুলোদার বউভাতে যাব কী করে ?

টেনিদা বললে, দাঁড়া ভেবে দেখি। তার আগে চারটে পয়সা দে।

—আবার পয়সা কেন ?

—ডালমুট খাব, খেলে মগজ সাফ হবে, তখন বুদ্ধি বাতলে দেব।

কী আর করি, দিতেই হল চার পয়সা।

টেনিদা ঐ চার পয়সায় ডালমুট কিনে বেশ নিশ্চিন্তে বুদ্ধি সাফ করতে লাগল, আমাকে একটুও দিলে না।

—টেনিদা, একবার ছোট কাকার অফিসে গেলে কেমন হয় ?

টেনিদার ডালমুট চিবোনো বন্ধ হল : সে কি-রে ! তোর ছোট কাকার সেলুন আছে নাকি ?

—না-না, সেলুন নয় ! ছোট কাকা বলছিল ওদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। গেলে আমার চুলটাও নিশ্চয় ছাঁটাই করে দেবে।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, দূর বোকা—অফিসে কি চুল ছাঁটে ? সে অন্য ছাঁটাই।

—কী ছাঁটাই ?

—বোধ হয় জামা-কাপড় ছাঁটাই। কান-টানও হতে পারে। কি জানি, ঠিক বলতে পারব না। তবে চুল ছাঁটে না। তা হলে আমার কুটিমামার ধামার মতো চুলগুলো কবে ছেঁটে দিত।

তাই তো !—মনটা দমে গেল।

—তবে কী করা যায় ?

টেনিদা ডালমুটের তলার নুনটা চাটতে চাটতে বললে, ওই তো—গাছটার তলায় ইট পেতে পরামানিক বসে আছে, চল্ ওর কাছে—

—কিন্তু পরামানিক ?—আমি গজগজ করে বললুম, ওরা ভাল চুল কাটে না।

—তোকে বলেছে !—টেনিদা রেগে বললে, ওই বিড়ালই বনে গেলে বাঘ হয়—বুঝলি ? এখন নিতান্ত ফুটপাথে বসে আছে, তাই ওর কদর নেই। একটা সেলুন খুললেই ওর নাম হবে 'দি গ্রেট কাটার'। চল চল—আমার পিঠে একটা থাবড়া দিয়ে টেনিদা বললে, আমি আছি না সঙ্গে ? এমন ডিরেকশন দিয়ে দেব লোকে বলবে, প্যালা ঠিক সায়েব-বাড়ি থেকে চুল ছেঁটে এসেছে। কোনো ভাবনা নেই—আয়—

কী আর করি, পরামানিকের সামনে বসেছি ইট পেতে। টেনিদা থাবা গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। দেখছে মনের মতো ছাঁট হয় কিনা।

কুর-কুর করে কাঁচি চলেছে, আমিও বসে আছি নিবিষ্টমনে। হঠাৎ টেনিদা হাঁ হাঁ করে উঠল : এ পরামানিক জী, ঠারো ঠারো।

পরামানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, ক্যা ভৈল্ বা ?

—ভৈল্ না। মানে ঠিক হচ্ছে না। আয়সা নেহি। ওভাবে ছাঁটলে চলবে না।

পরামানিক বললে, তো কেইসা ?

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, কেন বাগড়া দিচ্ছ টেনিদা ? বেশ তো কাটছে—কাটুক না।

টেনিদা দাঁত বের করে বললে, কাটুক না ! যা-তা করে কাটলেই হল ? এ হল বউভাতের ছাঁট, এর কায়দাই আলাদা। যা খুশি কেটে দেবে, আর শেষে লোকে আমারই বদনাম করে বলবে, ছি—ছি—পটলডাঙার টেনিরাম কাছে থাকতেও প্যালা যাচ্ছেতাই চুল ছেঁটে এসেছে ! রামোঃ !

পরামানিক অধৈর্য হয়ে বললে, কেইসা ছাঁটাই ? বোলিয়ে না।

—বোলতা তো হ্যায় !—টেনিদা আমার মাথায় আঙুল দেখিয়ে বলে চলল : হিঁয়া দু ইঞ্চি ছাঁটকে দেও, হিঁয়া তিন ইঞ্চি—

আমি কাতর হয়ে বললুম, আমার কায়দায় দরকার নেই টেনিদা—ও যেমন কাটছে কাটুক।

—শাট আপ ! ছেলেমানুষ তুই—গুরুজনের মুখে মুখে কথা বলিস কেন ?—শুনো জী পরামানিক, হিঁয়া-সে চার ইঞ্চি কাট দেও—হিঁয়া ফের এক ইঞ্চি—হিঁয়া দু ইঞ্চি ঘাড় ছাঁটকে দেও—

পরামানিক এবার রেগে গেল : ওইসা নেহি হোতা !

টেনিদা বললে, জরুর হোতা ! তুম্ কাটো।

পরামানিক বললে, নেহি—ওইসা কভি নেহি হোতা।

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, দোহাই টেনিদা, পায়ে পড়ছি তোমার, ওকে কাটতে দাও—

টেনিদা গর্জন করে বললে, চোপ রাও। তুম্ কাটো পরামানিক জী—

পরামানিকের আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে তখন। নিজের সংকল্পে সে অটল।

—নেহি, হোতা নেহি।

—আলবাৎ হোতা। কয়ঠো ছাঁট দেখা তুম্ ? তুম ছাঁটের কেয়া জানতা ? কাটো—

—নেহি কাটেগা। বদনাম হো যায়েগা হামকো। ওইসা নেহি হোতা।

—নেহি হোতা ?—টেনিদা এবার চেঁচিয়ে উঠল : সব হোতা। আকাশে স্পুটনিক হোতা—মাথামে টাক হোতা—মুরগী আজ ঠ্যাং নিয়ে চলে বেড়াতা, কাল সেই ঠ্যাং প্লেটমে কাটলেট হো-যাতা। সব হোতা, তুম্ নেহি জানতা !

—হাম্ নেহি জানতা ?

—নেহি জানতা !—টেনিদার গলার স্বর বজ্র-কঠোর। আপ জানতে হেঁ—পরামানিক এবার চ্যালেঞ্জ করে বসল।

—জরুর জানতা হেঁ !—টেনিদা দারুণ উত্তেজিত।

—তো কাটিয়ে !

পরামানিকের বলবার অপেক্ষা মাত্র। পটাং করে টেনিদা তার কাঁচি হাত থেকে কেড়ে নিলে। আর আমি—'বাবা-রে—মারে—পিসিমারে'—বলে চেঁচিয়ে লাফিয়ে ওঠবার আগেই আমার চুলে টেনিদার কাঁচি চলতে লাগল : এই দেখো চার ইঞ্চি—এই দেখো পাঁচ ইঞ্চি—এই দেখো—ইয়ে তিন ইঞ্চি—দেখো—

কিন্তু পরামানিক দেখবার আগেই আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখছি তখন। উঠে প্রাণপণে ছুট

www.boiRboi.blogspot.com

মেরেছি আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছি : মেরে ফেললে—ডাকাত—খুন—

আমার পেছনে রাস্তার লোক ছুটছে : কুকুর ছুটছে, পরামানিক ছুটছে, পুলিস ছুটছে। আর সকলের আগে ছুটছে কাঁচি হাতে টেনিদা। বলছে, দাঁড়া প্যালা—দাঁড়া। একবার ওকে ভালো করে দেখিয়ে দিই ছাঁট কাকে বলে—

হুলোদার বউভাতে সবাই পোলাও মাংস ফাই সন্দেশ খাচ্ছে এতক্ষণে, আর আমি ? একেবারে মোক্ষম ছাঁট দিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছি। অর্থাৎ ন্যাড়া হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই ছাঁট নিয়ে কোনোমতেই বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া চলে না। আর চাটুযোদের রোয়াক থেকে কে যেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে চিৎকার করে বললে, ডি-লা গ্রাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস্—ইয়াক্—ইয়াক্ ! মনে হল, টেনিদারই গলা।

অন্যমনস্ক চোর

তোমরা কখনো অন্যমনস্ক চোর দেখেছ ? আমি একবার দেখেছিলুম। সেই কথাই বলি।

আমাদের কলকাতার বাসায় তখন কেউ নেই। গরমের ছুটি হওয়াতে সবাই দার্জিলিং বেড়াতে চলে গেছে। একশো আট ডিগ্রির জ্বালায় আমি একা বসে ছটফট করছি। অথচ আমার কলকাতা ছাড়বার যো নেই—আই. এ. পরীক্ষার একগাদা খাতা দেখতে হচ্ছে।

সেদিন রাতে কিছুতেই ঘুম আসছে না। একে তো প্রায় সাড়ে বারোটা অবধি খাতা দেখেছি—মাথার মধ্যে বানান আর ব্যাকরণের ভুলগুলো পোকার মতো কিলবিল করছে। তায় অসহ্য গরম—ঘুরন্ত পাখাটাও যেন আগুন বৃষ্টি করছে।

অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে সবে একটু ঝিমুনি এসেছে, হঠাৎ শুনতে পেলুম, ধ্যাৎ, সিন্দুকটা গেল কোথায় ?

ভাবলুম স্বপ্ন দেখছি, তক্ষুণি আবার কানে এল : ড্রেসিং টেবিলটাও উড়ে গেল নাকি ?

আর সন্দেহ নেই—ঘরে কেউ ঢুকেছে। পুরো চোখ মেলে পরিষ্কার দেখলুম, জানালার কাছে কে দাঁড়িয়ে।

মাথার পাশেই টিপয়ের ওপরে টেবল-ল্যাম্প ছিল। সুইচ টিপে সেটা জ্বাললুম। যা ভেবেছি তাই, ঘরে চোর ঢুকেছে। সাদা বেনিয়ান আর ধুতিপরা একটা বেঁটে মতো লোক—জানালার পাশটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে। 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে যাব, তার আগেই লোকটা হাতযোড় করে বললে, কিছু মনে করবেন না স্যার—আপনার ঘুমের ডিস্‌টার্ব করলুম। একটু ভুল হয়ে গেছে।

লোকটার কথার ভঙ্গীতে ভয় কেটে গিয়ে ভারী আশ্চর্য লাগল আমার। বললুম, তার মানে ?

www.boiRboi.blogspot.com

সে বললে, এটা তো বাহান্ন নম্বরের বাড়ি নয় ?

আমি বললুম, না—বাইশ নম্বর।

লোকটা বললে, দেখলেন তো, ঠিক ধরেছি। বাহান্ন নম্বরের জানালা বেয়ে উঠলেই ডানদিকের দেওয়ালে লোহার সিন্দুক—এই তার নকল চাবি।—বলে সে আমাকে একটা ছোট চাবি দেখালে। তারপরে বলে চলল, আর লোহার সিন্দুকের পাশেই হল ড্রেসিং টেবিল—আজ রাতে গিন্নিমা সিনেমা থেকে ফিরে তার টানায় গয়নাগুলো খুলে রাখবেন। ঘরে ঢুকেই আমি টের পেয়েছি সব গড়বড় হয়ে গেছে। ভালো কথা, এটা প্যারীচাঁদ লেন তো ?

আমি বললুম, না—পটলডাঙা লেন।

—ওই দেখুন—রাস্তাতেও গণ্ডগোল। ধ্যাৎ—ভালো লাগে নাকি ? কী বিচ্ছিরি ভুল দেখুন তো ?

লোকটার কথাবার্তা অদ্ভুত লাগছিল। মাঝরাতে জানালা বেয়ে ঘরে ঢুকে এ আবার কী রসিকতা শুরু করলে। বললুম, ব্যাপার কি হে, তোমার মাথা খারাপ নাকি ?

—মাথা খারাপ হতে যাবে কেন স্যার ? আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে ? আমি চোর।

—চোর !

—অত অবাক হয়ে গেলেন কেন ?—লোকটা প্রায় আমাকে ধমকই লাগিয়ে দিলে, একটা : রাত্তির বেলা আপনার ঘরের জানলা দিয়ে চোর ঢুকবে না তো ডাকপিয়ন ঢুকবে নাকি ? কী যে বলেন—কিছু মানে হয় না।

আমি বললুম, অ, বুঝেছি। বাহান্ন নম্বর প্যারীচাঁদে চুরি করতে গিয়ে বাইশ নম্বর পটলডাঙায় ঢুকেছ !

—ইয়া, ঠিক ধরেছেন এবারে। কিন্তু কী ল্যাঠা বলুন দিকি ? এতটা জানালা বেয়ে উঠেছি, জলের পাইপের ঘষায় হাঁটুর ছাল উঠে গেছে—বুকের ভেতর হাঁফ ধরছে ; এখন কি আর প্যারীচাঁদ লেনে যেতে ইচ্ছে করে ? আপনার ঘরে একটু বসব স্যার ? জিরিয়ে নেব একটুখানি ?

আমার বেশ লাগছিল চোরটাকে ! বললুম, তা বসতে পারো।

বলেই আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলুম।

—আরে, আরে—ওটা কিসের ওপর বসছ ?

কিন্তু ততক্ষণে যা করবার তা করে ফেলেছে। টুলের পাশে কুঁজোটা ছিল, ভুল করে টুল ভেবে চেপে বসতে গেছে কুঁজোয়—আর তক্ষুণি পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে। কুঁজো ভেঙে চৌচির। ঘরময় জল !

বোকার মতো একগাল হেসে উঠে দাঁড়াল ভিজে জবজবে।

আমি রেগে বললুম, এটা কী হল শুনি ?

লোকটা গাল চুলকে বললে, আপনার একটু ড্যামেজ করে ফেললুম স্যার ! কিছু মনে করবেন না। নিজেও একদম ভিজে গেছি।

বললুম, টুলটা টেনে ভালো করে দেখে বোসো। আবার রেডিওটার ওপরে চাপতে যেয়ো না।

সে বললে, না স্যার, বার বার কি আর ভুল হয় ? একটা ঝাঁটা দিন—ঘরটা সাফ করে ফেলি ! এই যে পেয়েছি—বলে সে আমার ছাতাটা তুলে নিলে।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললুম, রাখো—রাখো—ওটা ঝাঁটা নয়, ছাতা। খুব হয়েছে, তোমার আর ঘর সাফ করবার দরকার নেই।

লোকটা লজ্জিত হয়ে টুলটার ওপর বসে পড়ল। বার কয়েক কান-টান চুলকে বললে,

একটা বিড়ি খাব স্যার ? কিচ্ছু মনে করবেন না ?

—মনে করব কেন—খাও না।

বলতেই বুক-পকেট থেকে টিনের কৌটো আর দেশলাই বের করলে। তারপর একটা দেশলাইগের কাঠি মুখে দিয়ে বিড়িটাকে দেশলাইগের গায়ে ঘষতে লাগল।

—ধ্যাৎ—ধরছে না! কী যাচ্ছেতাই দেশলাইগের কাঠি।

আমি বললুম, কী পাগলামো হচ্ছে শুনি ? ভালো করে তাকিয়ে দেখো তো কী ঘষছ !

—ওঃ হে, তাই ধরছে না !—বলেই সে বিড়িটা ফেলে দিলে। তারপর ফস করে দেশলাই ধরিয়ে নিজের মুখের কাঠিতে ঠেকাল। সেটা ফড়াং করে জ্বলে উঠতেই চমকে এক লাফ !

—ইস্—নাকটা পুড়ে গেল স্যার ! উঃ—উঃ...

বললুম, বিড়ির বদলে দেশলাইয়ের কাঠি ধরালে নাক পোড়েই।

—তাই তো দেখছি।—লোকটা বাজার হয়ে উঠল : দুত্তোর, বিড়ি আর খাবই না।—বলে সে রেডিওটার ওপরে চেপে বসতে গেল।

—আরে, আরে—ওটায় নয়—টুলে বোসো।—আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

—ঠিক ধরিয়ে দিয়েছেন স্যার !—লোকটা আপ্যায়িত হল : আর একটু হলেই রেডিওটা শুদ্ধ আমি আছাড় খেতুম। কিন্তু নাকটা খুব জ্বলছে—বুঝলেন। বোধ হয় ফোস্কা পড়বে।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ফোস্কা পড়াই উচিত—তোমার যেমন কাণ্ড ! এত ভুলো মন নিয়ে চুরি করো কী করে ?

নাকের ডগায় হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে, ওই জন্যেই তো মধ্যে মধ্যে ভারী মুশকিল হয় স্যার ! মাস ছয়েক আগে কী কাণ্ড করেছিলুম—জানেন ? ভিড়ের মধ্যে ট্রামে উঠেছি—পকেট মারব। একজনের পয়সা-বাঁধা রুমালটা তুলে নিয়ে যেই ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়েছি—সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বললে, 'পকেটমার পকেটমার !' লোকে তাড়া করলে—আমিও টেনে দৌড়। রাস্তার ডান দিকের গলি ভুল করে বাঁ দিকে ছুটলুম—সোজা কোথায় ঢুকলুম গিয়ে—জানেন ? থানার মধ্যে !

—থানার মধ্যে ?

—তাতে দুঃখু ছিল না স্যার ! আসলে গোলমালটা হল অন্য জায়গায়। যে রুমালটা অন্যের পকেট থেকে নিয়েছি ভেবেছিলুম—সেটা আমারই রুমাল। ভিড়ের ভেতর অনোর ভেবে নিজেরই পকেট মেরেছি। তাতে ছোট ছোট আলু ভাজার মতো পাঁচটা নয়া পয়সা বাঁধা ছিল।

—বলো কি !

লোকটা উত্তেজিত হয়ে বললে, একটা পাহারাওয়ালার কী আস্পর্ধা স্যার—আমাকে বললে, পাগল—করাচী চলে যা।

বললুম, করাচী নয়—রাঁচী।

লোকটা বললে, একই কথা স্যার ! তা আমার খুব রাগ হল। পাহারাওয়ালাকে বোঁ করে একটা ঘুষি মেরে বললুম, জানিস্—আমি চোর, তবু তুই আমাকে পাগল বলিস্ ! তোর ইচ্ছে হয়, তুই করাচী যা। আমি চোর, আমি হাজতে ঢুকব।—এই বলে জোর করে হাজতে ঢুকতে যাচ্ছি, সবাই মিলে আমায় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে দিলে। আর সেই পাহারাওয়ালাটা ঘুষি খেয়েও দাঁত ছরকুটে হাসতে লাগল।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, ভারী দুঃখের কথা।

লোকটা বললে, এই জন্যেই তো মন খারাপ হয়ে যায় স্যার ! কত কষ্ট করে চোর হয়েছি—এখন পাগল বললে কি ভালো লাগে—বলুন তো ? অথচ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা বলে আপনি আমায় দুঃখু দিলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

আমি বললুম, বুঝতে পারিনি তাই বলেছি, কিছু মনে কোরো না। তা চুরিচামারিতে কিছু হয় ?

—একেবারে কিছু হয় না—তা বলব না স্যার ! এই তো ক'দিন আগে এক ঢাকাই মহাজনের বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিলুম। সামনে ক্যাশবাক্স ছিল, আমি ভুল করে আর একটা কী ধরে টান দিলুম। দড়িতে বাঁধা ছিল, টানের চোটে ছিঁড়ে এল। বেশ ভারী, শক্ত—গোলগাল। বার করে আনতে মনে হল, সেটা যেন আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করছে। ব্যাপার কী—ক্যাশবাক্স কামড়ায় ? অনেক ক্যাশবাক্স দেখেছি, গলা বের করে কামড়াতে চায়—এমন তো দেখিনি। আলোয় এনে দেখি—ধ্যাৎ—একটা কচ্ছপ ! পরদিন দিলুম রাস্তার একটা লোককে বেচে—আটগণ্ডা পয়সা দিলে। একটা অবশ্য সীসের সিকি—তা হোক, চারগণ্ডা পয়সা তো পেলুম। কিছু লাভ তো হলই, কী বলেন ?

বললুম, হ্যাঁ—কিছু লাভ হল বই কি !

লোকটা বললে, তবেই দেখুন কাজটা নেহাৎ মন্দ নয়। উঃ—নাকটা বেজায় জ্বলছে। একটা বিড়ি খাই—কী বলেন ?

বললুম, তা খাও। তবে এবার আর মুখ পুড়িয়ো না।

—না স্যার, বার বার কি ভুল হয় !—বলে পাশের পকেট থেকে একটা মানি-ব্যাগ বের করে সে হাতের ওপর উপুড় করলে। বিড়ি বেরুল না—ছোট ছোট আলুভাজার মতো পাঁচটা নয়া পয়সা পড়ল।

কী মুশকিল—বিড়িগুলো গেল কোথায় ?

লোকটার বোকামি দেখে আমার গা জ্বলে উঠল। বললুম, ওটা মানি-ব্যাগ। ওর মধ্যে বিড়ি কী করে আসবে ?

—তা বটে—এটা মানি-ব্যাগ—লোকটা সেটাকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল : সেই রুমাল নিয়ে কেলেঙ্কারী হওয়ার পরে একটা ব্যাগ কিনেছি। বুক-পকেটে রাখি। যতই মনের ভুল হোক স্যার—নিজের বুক-পকেট কেউ মারতে পারে না। পারে স্যার ?

—একমাত্র তুমিই পারো বোধ হয়।

—না স্যার, তিনমাসের মধ্যে আমিও পারিনি। কিন্তু বিড়ি একটা না খেলেই নয়। বলে, আবার বিড়ি খুঁজতে যাচ্ছে, হঠাৎ ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজল।

—অ্যাঁ—তিনটে ? কী সর্বনাশ !

—সর্বনাশ কেন ?

—বাড়িতে বলে এসেছি যে। তিনটের মধ্যে না ফিরলে তারা ভাববে আমাকে পুলিসে ধরেছে। আপনি একটু উঠুন না স্যার !

—কেন ?

—আমাকে থানায় দিয়ে আসবেন।

এবার আমার ভারী রাগ হল। রাত দুপুরে এ কি জ্বালাতন ? একটু ঘুমতে পেলুম না—এখন আবার থানায় দৌড়োই ? বললুম, তুমি বাড়ি যাও—আমার আর হাড় জ্বালিয়ো না।

লোকটা মিনতি করে বললে, একবারটি চলুন না স্যার, ধরিয়ে দিয়ে আসবেন ! আমি বাড়িতে বলে এসেছি—

ধৈর্য আর কতক্ষণ থাকে ! আমি হঠাৎ বেদম চিৎকার করে উঠলুম : গেট আউট্—বেরোও—বেরোও বলছি—

সেই চিৎকারে বিষম চমকে লোকটা জানালা বেয়ে টপ্ করে লাফিয়ে পড়ল। কেউ করে

একটা কাতর আর্তনাদ উঠল—বুঝলুম, নেড়ী কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। ভুল করে আবার জ্বালাতে না আসে, এই ভেবে শক্ত করে জানালাটা এঁটে দিলুম।

সকালে দেখি টেবিলের ওপর পাঁচটা আলুভাজার মতো নয়া পয়সা আর মানি-ব্যাগটা পড়ে আছে। আমার চশমার খাপটা পাওয়া গেল না—যাওয়ার সময় মানি-ব্যাগ ভেবে সেইটে নিয়েই পালিয়েছে।

লঙ্কানাথম্ কটুসুন্দরম

বল্টুদার মন-মেজাজ ভয়ানক খারাপ। ঠিক একটা বল্টুর মতো মুখ করে বসে আছে। যদ্দুর জানি, মন খারাপ করবার বান্দাই বল্টুদা নয়—অবশ্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গোল খেলে আলাদা কথা। নইলে বল্টুদা সব সময়ই বেশ উৎসাহিত থাকে—কিচ্ছুটিতে দমে যায় না। একবার থিয়েটারে বল্টুদাকে দূতের পার্ট দেওয়া হয়েছিল, রাজসভায় গিয়ে বলতে হবে, 'মহারাজ, অশ্ব কিছুতেই ঘাস খাচ্ছে না।' বল্টুদা সোজা গিয়ে বলে ফেলল, 'অশ্ব, মহারাজ কিছুতেই ঘাস খাচ্ছে না।' লোকে হৈ-হৈ করে উঠলে, বল্টুদা ক্ষেপে গেল। স্টেজের সামনে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল : "বলেছি, বেশ করেছি। আরো একশো বার বলব—অশ্ব, মহারাজ কিছুতেই ঘাস খাচ্ছে না ; অশ্ব, মহারাজ কিছুতেই—"

বার পনেরো বলবার পরে সবাই মিলে বল্টুদাকে ভেতরে টেনে এনে ড্রপ ফেলতে হল।

এহেন দুর্দম বল্টুদা হঠাৎ নাকমুখ অমন বিচ্ছিরি করে নিমগাছতলায় বসে আছে কেন, জানবার জন্য ভীষণ কৌতূহল হল আমার।

টিপি টিপি এগোচ্ছি, হঠাৎ কোত্থেকে পাঁচগোপালের ক্ষেমঙ্করী পিসিমা এসে হাজির। এসে বেশ মিহি গলায় ডাকলেন, বাবা ঘোন্টু—

'ঘোন্টু' বলবার একটু ইতিহাস আছে। ক্ষেমঙ্করী পিসিমার কোনও মাসশ্বশুরের মামাতো ভাইয়ের নামও নাকি বল্টু। তাই পিসিমা ও নামে ডাকতে পারেন না—শ্বশুরের নাম ধরতে নেই কি না! সেই জন্যে বরাবর 'ঘোন্টু'-ই বলে আসছেন। আজ কী যে হল, ডাক শোনামাত্র কোলা ব্যাংয়ের মতো চার পা তুলে লাফিয়ে উঠল বল্টুদা, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললে, ঘোন্টু! আমার নাম ঘোন্টু নাকি? আমি ঘোল খাই নাকি? আমার কি ন্যাড়া মাথা আছে যেখানে সেখানে সবাই ঘোল ঢালে? নাম খারাপ করবেন না—এই বলে দিলুম, হুঁ!

শুনে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা প্রথমে চোখ গোল করলেন, তার পরে গালে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে কাকের মতো হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপরে বললেন, ও—হ্যা গো! তিন দিনের এড়ে, এল শিং নেড়ে! খুব যে ন্যাজ বেরিয়েছে দেখছি—খামোকা হনুমানের মতো নাপাচ্ছিস! আঃ—খেলে কচুপোড়া—বলে ক্ষেমঙ্করী পিসিমা খুব কায়দা করে নাক বাঁকিয়ে চলে গেলেন।

তারপর আমি এগিয়ে এলাম গুটিগুটি।

—দেখলে বল্টুদা, কি রকম গাল দিলে তোমাকে। প্রথমে বললে, শিংওয়ালা এঁড়ে, তারপর বললে, ল্যাজওয়ালা হনুমান ; তারপর বললে, কচুপোড়া খা!

বল্টুদা এবার হাঁড়োলের মতো মুখ করে বললে, বলুক। নিজেই কচুপোড়া খাক্‌গে।

—তোমায় কিন্তু বিকেলে আম-কাঁঠাল খাওয়ার নেমন্তন্ন করতে এসেছিল। আমাকেও বলেছে—আসল খবরটা আমি এইবারে ফাঁস করলুম।

—অ্যাঃ, তাই নাকি?—বল্টুদা ধপাৎ করে আবার নিমগাছের গোড়ায় বসে পড়ল : তা আগে বললিনি কেন? এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলি—না?

—বলবার চান্স্ তুমি দিলে কোথায়? তার আগেই তো তেরিয়া মেরিয়া হয়ে লাফিয়ে উঠলে।

—হুঁঃ, তাও বটে!—বল্টুদা এমন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে যে মনে হল রীতিমতো সাইক্লোন বয়ে গেল : কী জানিস্ প্যালা, দারুণ প্যাঁচে পড়ে গেছি। সে-ও ওই নামেরই ব্যাপার। প্রায় ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিলে। তাই তো ঘোন্টু শুনে ওই রকম ক্ষেপে গেলুম।

—তুমিও কারুর নাম খারাপ করে দিয়েছ বুঝি?—আমি ঘন হয়ে বল্টুদার পাশে বসলুম।

—আরে না—না!—বল্টুদা অন্যমনস্কভাবে একটা পাকা নিমফল মুখে দিয়েই থু-থু করে ফেলে দিলে : কী যাচ্ছেতাই ফল—রাম, রাম! দেখতে ঠিক পাকা আঙুরটির মতো, মুখে দিলে নাড়ী উলটে আসে। মরুকগে—যে কথা বলছিলুম। নাম খারাপ করলে অবিশ্যি গোলমাল এক-আধটু হয়। রাঙাদির বড় মেয়ে দিল্লীতে জন্মেছে, রাঙাদি আদর করে নাম রেখেছে কুমারী রাজধানী চক্রবর্তী। আমি ভুল করে রাজধানীকে যেই দাদখানি বলে ডেকেছি অমনি মেয়েটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কান্না জুড়ল আর রাঙাদিব সে কি বকুনি! তা সে সব তুচ্ছ কথা। সত্যি প্যালা, আমি দারুণ প্যাঁচে পড়ে গেছি এবার।

—কী প্যাঁচ, শুনি?

বল্টুদা আর একটা নিম ফল তুলে প্রায় মুখে দিতে যাচ্ছিল, আমি হাঁ হাঁ করে উঠতে ফেলে দিলে। বললে, ধুৎ! দেখতে পাকা আঙুরের মতো, আর খেলেই—মরুকগে! হয়েছে কী জানিস্ প্যালা? আমার ছোট মামা থাকে মাদ্রাজে—খুব বড় সরকারী চাকরি করে। পরশু সেই ছোট মামা কী একটা কাজে সাতদিনের জন্যে সিমলাতে গেছে।

—ছোট মামা সিমলাতে গেছে, তাতে তোমার প্যাঁচের কী হল?

—থাম না বাপু—আগেই ক্যাঁচর-ম্যাচর করিস্ কেন?

বল্টুদা উদাস হয়ে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বাস্ত হয়ে বললুম, ঘুড়ি কেটেছে নাকি বল্টুদা?

বল্টুদা চটে গিয়ে বললে, ঘুড়ি—ঘুড়ি! দিনরাত ঘুড়ি ঘুড়ি করে গেলি। ইচ্ছে করে তোর পিঠে সুতো বেঁধে তোকেই আকাশে উড়িয়ে দিই। হচ্ছিল একটা দরকারী কথা—

—তা দরকারী কথাটা ঝাঁ করে বললেই তো হয়।

বল্টুদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, বলতে দিচ্ছিস্ কোথায়? তুইও তো ছোট মামার বাঁদরটার মতো আমার হাড় জ্বালাচ্ছিস্।

—ছোট মামার বাঁদর?

—হ্যাঁরে, হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি! ছোট মামার একটা শখের বাঁদর আছে। সেটা হাসে, কাঁদে, নাচে, আবার কিচির-মিচির করে গানও গায়। ছোট মামা সিমলা যাওয়ার সময় সেটাকে রেখে গেছে আমাদের বাড়িতে। বলেছে, আদর করে নাম ধরে ডাকলেই বাঁদর এসে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে, তারপর যা বলবি তাই করবে। ঘুরে ঘুরে ছলাছলা নাচ নাচবে, ট্যাঙো ট্যাঙো বলে গান গাইবে—

www.boiRboi.blogspot.com

আমি দারুণ আশ্চর্য হয়ে গেলুম।

—বাঁদর তো কিচকিচ করে, ট্যাঙো ট্যাঙো বলতে পারে নাকি ? সত্যি বলছ ?

—সত্যি মিথ্যে জানব কী করে ? ছোট মামা তো এই কথা বলে তক্ষুণি দমদম থেকে প্লেনে চেপে হাওয়া। এদিকে বাঁদরটা সেই ছুঁচোর মতো মুখ করে বসে আছে তো বসেই আছে। খাচ্ছে না দাচ্ছে না, কথাটিও বলছে না, থেকে থেকে গা চুলকোচ্ছে আর পটাপট উকুন মারছে কেবল।

—তা নাম ধরে ডেকেই দ্যাখো না—কী বলে।

আমি চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই বল্টুদা একটা নিম ফল মুখে পুরে দিলে। তারপর থুথু করে সেটাকে ফেলে দিয়ে আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল !

—ধুত্তোর নাম ! ওই নাম নিয়েই তো যত ঝামেলা। ছোট মামা সব বলে গেল—কেবল নামটাই বলতে খেয়াল হয়নি। এখন বাঁদর ঠায় উপোস করে বসে আছে। কলা দিয়েছি, মুলো দিয়েছি, জিলিপি দিয়েছি—বললে বিশ্বাস করবিনে, আলুর চপ পর্যন্ত দিয়েছি।—বল্টুদার জিভে জল এসে গেল: কী দারুণ মনের জোর দ্যাখ—আলুর চপ পর্যন্ত খেলে না ! ওই ক'টা পুঁচকে উকুন খেয়ে ক'দিনেই বা বাঁচবে বল্‌দিকি ? স্রেফ উপোস করেই মারা যাবে।

আমি নাক কুঁচকে বললুম, ছোঃ—বাঁদরের নামের জন্য আবার ভাবনা। ওর নাম আবার কী হতে পারে ? রাম-শ্যাম-যদু-মধু কিংবা লম্বকর্ণ, কিংবা দধিমুখ, কিংবা জয়দ্রথ, কিংবা মলয়হিল্লোল—

বল্টুদা বিচ্ছিরি দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কিংবা পটলডাঙার প্যালারাম, কিংবা শিঙ্গিমাছের ঝোল, কিংবা পালাজ্বরের পিলে ! থাম, আর বকিস্‌নি। কোনো নাম ধরে ডাকতে বাকী রেখেছি ? শেষকালে বাংলা ডিক্‌শনারী খুলে 'অজগর' থেকে 'বাঁশবন'—মানে 'অ' থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' পর্যন্ত সমানে আউড়ে গেছি। উঁহু—কিচ্ছুটিতে সাড়া দিলে না।

—তা হলে হয়তো বাঁদরটার ইংরেজী নাম থাকতে পারে। জ্যাক্ কিংবা জিম, নইলে ক্যাটাক্লিজম্, নয় তো হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ—নয় তো কন্‌স্টার্ণেশন—

বল্টুদা দু'হাতে কান চেপে ধরল : উঃ—এ যেন কানের কাছে কামান ছুঁড়ছে ! তবু যদি ইংরেজীতে সাড়ে সতেরো না পেতিস্। বাহাদুরী ফলাতে হয় তো চল বাঁদরের কাছে—দেখি কেমন ওস্তাদ তুই।

আমি তক্ষুণি রাজী হয়ে গেলুম।

গিয়ে দেখি, বাঁদরটার গলায় লম্বা শেকল বাঁধা। একটা জলচৌকির ওপর এমন কায়দা করে বসে আছে যে, মনে হয় জ্যামিতির এক্‌স্ট্রা ভাবছে ! তারপরেই চিড়-বিড় করে সারা গা চুলকোতে লাগল আর মুখটাকে চামচিকের মতো করে (আমি অবিশ্যি চামচিকের মুখ কখনো দেখিনি) খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, বানরটার বোধ হয় খুব চুলকোনা হয়েছে—ওকে কার্বলিক সাবার মাখানো দরকার।—এমন সময় কোত্থেকে বল্টুদার বোন ঘুন্টি এসে হাজির। এসেই বাঁদরের সামনে বসে পড়ে চিৎকার করে গান জুড়ে দিলে :

জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্যে হরি—'

কিন্তু গানের সুরে বাঁদরের মন খুশি হল না।

'ইকলুস্ পিকলুস ইচাং ইচাং' বলে সে এমন একটা লাফ মারল যে, শেকলে বাঁধা না থাকলে ঠিক ঘুন্টির ঘাড়ে গিয়ে পড়ত। চ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে করতে ঘুন্টি সোজা ঘরের ভেতর ছুটে পালালে।

বল্টুদা হতাশ গলায় বললে, গ্রামোফোন এনে দেড়শো রেকর্ড শুনিয়েছি, খেয়াল থেকে

www.boiRboi.blogspot.com

কালী-কীর্তন কিচ্ছু বাদ দিইনি। তাতেও চিঁড়ে ভিজল না—আর ঘুন্টি কাঁই মাঁই করে ওকে ভোলাবে ! দিত নাকটা আঁচড়ে—ঠিক হত।

আমি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লুম।

—ওতে হবে না। ঠিক নাম ধরে ডাকা চাই—তবেই না ?

—ডাক না—সারাদিন ধরে ডাক। যে নামে খুশি ডাক—হাম্বা হাম্বা করে ডাক, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাক ! বলিস্ তো ডিক্‌শনারী এনে দিই।

আমি বীরের মতো বললুম, ডিক্‌শনারীতে দরকার নেই—এম্‌নিতেই ম্যানেজ করব। গোড়াতে বেশ মিষ্টি করেই ডাকা যাক। রামধন—

বাঁদর একটা উকুন ধরল।

—ব্রজবল্লভ—

উকুনটা পট্ করে চলে গেল মুখের ভেতর।

—যোগেন্দ্রকুমার—

—দধিকর্ণ—হরিপ্রসন্ন—নন্দপুরচন্দ্র—বৃন্দাবন-অন্ধকার—

বাঁদর ফ্যাচাং করে আমাকে একটা ভেংচি কেটে দিলে।

বল্টুদা খিক্ খিক্ করে হাসল।

—বললুম না, ডিক্‌শনারীর কোনো শব্দ বাকী রাখিনি ? কিচ্ছু করতে পারবি না।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, থামো না বাপু—বলতে দাও আমাকে। রাক্ষস—খোক্কোস—কপিধ্বজ—বনহংসী—ইন্দুনিভাননী—

বাঁদর ভীষণ জোরে খ্যাচাং খ্যাচাং করে গা চুলকোতে লাগল—যেন ছাল-চামড়া সব উপড়ে ফেলে দেবে ! তখন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। মাদ্রাজের বানর, একটা মাদ্রাজী নামই ওর থাকা উচিত। ঠিক। দি আইডিয়া ! ডাকলুম : মাদ্রাজম্—

বল্টুদা বললে, ও আবার কী ! মাদ্রাজম্ মানে কী ?

—ওরা সব অনুস্বার দিয়ে বলে, আমি জানি। বলতে দাও না আমাকে—বিরক্ত কোরো না ! মসলিপট্টম্—

এবার বাঁদর যেন একটুখানি কান খাড়া করল।

উৎসাহ পেয়ে বললুম, তাঞ্জোরম—

বাঁদর আমার মুখের দিকে প্যাট্‌প্যাট্ করে তাকাল। যেন বলতে চাইছে : বেশ হচ্ছে, চালিয়ে যাও।

আমি চেঁচিয়ে বলতে লাগলুম, কাঞ্জীভরম্—শিবসমুদ্রম্—ওয়ালটেয়ারম্—তারপরে আর মাদ্রাজের কোনো জায়গার নাম মনে এল না, আমি ধাঁ ধাঁ করে বলে চললুম : হিমাচলম্—গোবরডাঙাম্—(গোবরডাঙায় মেজ কাকিমার বাপের বাড়ি) জামসেদপুরম্—চিত্রকূটম্—পটলডাঙাম্—

যেই বলেছি পটলডাঙাপ্—তক্ষুণি সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটল। তিনদিন ধরে কানের কাছে নানারকম নাম শুনতে শুনতে বানরটা তিতবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল—পটলডাঙাম্ বলবার সঙ্গে সঙ্গে খেঁকী কুকুরের মতো মুখ করে আওয়াজ করল : কিঞ্চিৎ—কিঞ্চিৎ—উচ্চিংড়ে—ঘেচুং—

আর একখানা ভয়ঙ্কর লাফ !

সেই লাফে শেকল কটাং করে ছিঁড়ে গেল। আর বাঁদর তক্ষুণি 'হিঞ্চে—হিঞ্চে—গুশ্‌করা'—বলে পাঁই পাঁই করে তেড়ে এল আমার দিকে। আমি 'বাপরে মারে' বলে পালাতে যাব, হঠাৎ বারান্দা মোছার ভিজে ন্যাকড়াটায় পা পড়তেই ধপাস্—ধাঁই করে উল্‌টে পড়ে গেলুম।

এবার আমি গেছি। বাঁদর আমার নাক-কান আর আস্তো রাখবে না। পটলডাঙার পালোয়ামের পালাজ্বরের পালা এইখানেই শেষ!

আর তক্ষুণি মোটা গলায় কে যেন ডাকল, 'লম্বানাথম্ কটুসুন্দরম্ চিন্তারপাণ্ডুরম্'—বল্টুদার ছোট মামা। সাতদিনের কাজ তিনদিনে সেরেই ফিরে এসেছেন।

বাঁদরটা ঘাঁক করে পেছন ফিরে তাকালে।

ছোট মামা আবার ডাকলেন, 'লম্বানাথম্ কটুসুন্দরম্ চিন্তারপাণ্ডুরম্'—

মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থেকেই আমি জ্বল-জ্বল করে চেয়ে দেখলুম, বানরটা 'ট্যাঙো ট্যাঙো'' বলে গান ধরেছে আর দু'হাত আকাশে তুলে হুলাহুলা নাচ শুরু করে দিয়েছে।

ঘণ্টাদার কাবলুকাকা

ঘণ্টাদা বললে, ভীষণ প্যাঁচে পড়ে গেরি রে, প্যালা। চোখে শর্ষের ফুল দেখছি আমি।

—কী হলো তোমার? শর্ষের চাষ করছো নাকি আজকাল? আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, তোমার অসাধ্য কাজ নেই। তুমি পাটের দালালী করেছো, ঝোলা গুড়ের ব্যবসা করেছো, সিনেমায় জনতার দৃশ্যে অভিনয় করেছো—বাজী রেখে কাঁচা ডিম খেতে গিয়ে বমি করেছো, পোড়ো বাড়ীতে ভূত দেখতে গিয়ে ভির্মি খেয়েছো। শেষকালে কি শর্ষের চাষ আরম্ভ করে দিলে?

—থাম, মেলা বকিসনি!—নাকটাকে পাস্তুয়ার মতো করে ঘণ্টাদা বললে, আমি মরছি নিজের জ্বালায়—উনি ইদিকে এলেন ইয়ার্কি দিতে। হয়েছে কী, জানিস? আজই খবর পেলুম, বিকেলের গাড়ীতে কাশীর কাবলু কাকা আসছেন।

—সে তো খুবই ভালো কথা!—আমি আরো উৎসাহ বোধ করলুম: কাশী থেকে যখন আসছেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু চমচম্ আর গজা নিয়ে আসছেন। আমিও খাবো, বিকেলে।

—সে গুড়ে বালি, বুঝলি, সে 'জ্যানারিতে' স্রেফ 'স্যাণ্ড'।—ঘণ্টাদা কথাটার ইংরেজি অনুবাদ করে দিলে: কাশী থেকে গজা চমচম্ নিশ্চয়ই আনবেন, কিন্তু সে আর হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছুবে না। 'মোগল সরাইয়ের আগেই কাবলু কাকা ওগুলোকে সাবাড় করে ফেলবেন!···গলা নামিয়ে ঘণ্টাদা বললে, কাবলু কাকা ভীষণ খেতে ভালোবাসেন, জানিস? একটা আস্ত পাঁঠা খেয়ে নেন একেবারে।

—ল্যাজ-ট্যাজ, শিং-টিং সুদ্ধু?—আমি জানতে চাইলুম!

—চুপ কর্—বাজে বকিসনি।···আমাকে একটা ধমক দিয়ে ঘণ্টাদা বললে, তা কথাটা যে একেবারে মন্দ বলেছিস তা-ও নয়। কাবলু কাকা যা খাদক—পাঁঠার শিং তো দূরে থাক, রেঁধে দিলে গলার দড়িগাছাটাও খান বোধ হয়। বিশ্বখাদক বুঝলি, প্যালা—বিশ্বখাদক! তিন দিন থাকবেন। আর এই তিন দিনের মধ্যে আমাকেও খেয়ে যাবেন—এই তোকে বলে দিলুম।

সত্যি বলতে কি, কথাটা বিশ্বাস হলো না। ঘণ্টাদার মতো অখাদ্য জীব আমি দেখিনি। কালোবাজার করে বেশ টাকা জমিয়েছে, কিন্তু একটা পয়সা খরচ করবে না। পাড়ার ছেলেরা একটা ভালো কাজে চাঁদা চাইতে গেলে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। বাজারে গিয়ে মরা মাছ কুড়িয়ে আনে, সস্তায় কেনে পচা আলু। কাবলু কাকা যতো দিক্‌পাল খাইয়েই হোক, ঘণ্টাদাকে খাওয়া তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়!

ঘণ্টাদা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—যাই দেখি, বাজারে। সের দুই মাংস, সের তিনেক মাছ আর সের খানেক ঘি কিনে আনিগে। এই তিন দিনে যদি আমার দু'শো টাকা খসিয়ে না যান, তা' হলে আমার নামে কুকুর পুষিস, প্যালা।

—তোমার নামে কুকুর পুষলে লজ্জায় সে বেচারা সুইসাইড্ করবে—আমি মনে মনে বললুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, তা, তোমারই বা হলো কী, ঘণ্টদা? তুমিই বা খামোখা কাবলু কাকার জন্যে এত অপব্যয় করছো কেন?

—আরে, করছি কি সাধে। কাবলু কাকার ছেলেপুলে নেই—বিষয়-সম্পত্তিও অঢেল। যদি উইল-টুইল করবার সময়—!

আমি মাথা নাড়লুম: বিলক্ষণ!

—তবে, এই তিন দিনেই আমাকে আদ্ধেক মেরে রেখে যাবেন। এমন করে খেয়ে যাবেন যে, আমার হার্টফেল হওয়াও অসম্ভব নয়। তখন কাবলু কাকার সম্পত্তি পেলেই কি আর না পেলেই বা কি।—রাস্তায় একটা কাকের পালক পড়েছিলো, সেটা তুলে নিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে ঘণ্টাদা বললে, তা আমিও একটা প্যাঁচ কষেছি, বুঝলি—? আমার বাড়ীতে একখানা ঘোরতর ফিতের খাটিয়া আছে। তাতে অন্ততঃ দু'কোটি ছারপোকার বাস। তাইতেই কাবলু কাকাকে শুতে দেবো। তারপর—

—তারপর যদি চটে গিয়ে উইল-টুইল বদলে ফেলে—তখন?

—না—না, কাশীর লোক, অত ঘোরপ্যাঁচ বুঝবেন না। খেতে পেলেই খুশি। এদিকে আমি ভূরি-ভোজের ব্যবস্থা করবো। খেয়ে কাবলু কাকা মশগুল হয়ে যাবেন—আবার ছারপোকার কামড়ে জেরবার হয়ে পালাতেও পথ পাবেন না—অ্যাঁ?

—তা বটে—তা বটে!—ভেবেচিন্তে আমি মাথা নাড়লুম।

সেই কাকের পালকটা দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে ঘণ্টাদা বাজারে চলে গেল।

আমার দুর্দান্ত কৌতূহল হলো। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই আমি সেই রোমাঞ্চকর কাবলু কাকাকে দেখতে পেলুম।

দোরগোড়ায় আলুর দমের মতো মুখ করে ঘণ্টাদা দাঁড়িয়েছিল। ঘরের ভেতরে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই দ্যাখ! মানুষ নয় প্যালা, —মানুষ নয়। সাক্ষাৎ বক-রাক্ষস।

বক-রাক্ষসটাকে দেখবার জন্যে আমি ঘরে পা দিলুম। একটা টেবিলের ওপরে প্রকাণ্ড একটা বারকোস দেখা গেল, আর তার ওপর দেখা গেল শ'খানেক লুচি। আর কিছুনা।

হঠাৎ লুচির স্তূপের ওপাশ থেকে প্রকাণ্ড একখানা হাত বেরিয়ে এসে খান দশেক আন্দাজ একসঙ্গে তুলে নিলে। খচ-খচ করে লুচি চিবোবার আওয়াজ পাওয়া গেল···কিন্তু তবু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না; ভৌতিক কাণ্ড নাকি?

আবার সেই প্রকাণ্ড হাতখানার আর্বিভাব এবং খান পনেরো লুচির তিরোধান। তারপর লুচির পাহাড়টা একটু নিচের দিকে নামতে কাবলু কাকাকে দেখা গেল।

বাপ্···কী চেহারা! ওজন বোধহয় মন চারেক হবে মুখখানা একেবারে ঢালাই জালা। চেহারা দেখে মনে হলো, একটা আস্ত পাঁঠা তো তুচ্ছ ব্যাপার···নগদ একটা ঘোড়া খাওয়াও

www.boiRboi.blogspot.com

অসম্ভব নয়, কাবলু কাকার পক্ষে।

কিন্তু চেহারা অমন জংকম্প হলে কী হয়—লোকটির মেজাজ ভালো। আমাকে দেখে একগাল হাসলেন।

—তুমি আবার কে হে? কোথায় থাকো?

আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। কাবলু কাকার হাসি দেখে কেমন সাহস এল গায়ে। বললুম, আমার নাম প্যালারাম বাঁড়ুয্যে, আমি পটলডাঙায় থাকি।

ততক্ষণে ছোলার ডালের মতো মুখ করে ঘন্টাদা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখছে লুচির পরমাগতি। ওর একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসও আমি শুনতে খেলুম।

কাবলু কাকা থাবা দিয়ে আধ সেরটাক কুমড়োর ছক্কা মুখে তুললেন। ঘন্টাদার মুখটাও কুঁচকে-টুচকে প্রায় কুমড়োর ছক্কার মতো হয়ে গেল।

কাবলু কাকা ভরা-মুখে বললেন, তুমি এত রোগা কেন?

—আজ্ঞে পালা জ্বরে ভুগি, আর বাসক পাতার রস খাই—

—আরে দূর-দূর—পালা জ্বর। জুত মতো খেতে জানলে ও পালা জ্বর ল্যাজ তুলে পালাবে। শোনো, এক কাজ করবে। সকালে উঠে চা খাও? খেয়ো না আর। ওতে কোনো ফুড-ভ্যালু নেই—অনর্থক শরীর নষ্ট। তার চেয়ে ভোরে উঠেই একপো খাঁটি গাওয়া ঘি চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নেবে।

—এ পোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি!—আমার চোখ কপালে চড়লো।

—এ আর বেশি কি? আমি তো আধসের করে খাই। ওরে ঘন্টা, আমার ঘিয়ের ব্যবস্থা করে রাখিস, কাল। মনে থাকবে?

ঘন্টাদা মাথা নাড়লো। মনে থাকবে মানে? সারারাত বেচারার ঘুম হলে হয়।

—আর শোনো, দু'বেলা দুটো করে মুরগীর রোস্ট—সেরটাক দাদখানি চালের ভাত—আর দু'সের করে দুধ খাবে। তুমি ছেলেমানুষ—তাই লঘু পথ্য দিলুম। আমি ছ'টা করে মুরগী খাই, তিন সের চালের ভাত লাগে, আর ছ'সের করে দুধ খেয়ে থাকি। ঘন্টা, মনে থাকবে তো?

ঘন্টাদার হাত-পা কাঁপছিল। গলা দিয়ে কেমন একটা আওয়াজ বেরুলো তার। ওর হয়ে আমিই জবাব দিলুম: নিশ্চয় থাকবে। হাজার বার থাকবে। ঘন্টাদার মেমারি খুব ভালো।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ঘন্টাদার ধরা গলায় আমায় বললে—কি রকম বুঝছিস, প্যালা?

—সঙ্গীন।

—খাওয়ার যা লিষ্টি দিচ্ছে, জগুবাবুর বাজারে কুলুবে না—গড়িয়াহাট মার্কেটে যেতে হবে। এই তিন দিনেই আমি ফতুর হবো, প্যালা—আমার রাস্তায় দাঁড়াতে হবে!

ইচ্ছে হলো বলি, কালোবাজারী করে কয়েক লাখ টাকা তুমি জমিয়েছ, কাবলু কাকাই হচ্ছে তোমার আসল দাওয়াই। কিন্তু অনর্থক ঝগড়া করে কি হবে?

ঘন্টাদা মুড়িঘন্টর মতো মুখ করে বললে, তবে সেই দুর্ধর্ষ খাটখানা আছে, আর দুর্ধর্ষ ছারপোকা আছে। এখন ওরা যদি ম্যানেজ করতে পারে—তবেই।

—হ্যাঁ, আপাততঃ ওরাই তোমরা ভরসা। বলে ঘন্টাদার কাছ থেকে আমি বিদায় নিলুম।

সকালে উঠে সবে লজিকের বুই খুলে বসেছি। কী যে মুশকিল—ওই 'বারবারা সিলারেন্ট' আমার কিছুতেই মনে থাকে না।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে—ঘন্টাদা।

ঘন্টাদার মুখখানা তখন ডিমের কারীর মতো হয়ে গেছে। কেঁদে ঘন্টাদা বললে—প্যালা, সর্বনাশ হয়েছে। এবার আমার ফাঁসি হবে।

—বলো কি? খাওয়ার বহর দেখে রেগে-মেগে তুমি কাবলু কাকাকে খুন করে ফেলেছো নাকি?

—জানিস তো, আমি একটা আরশোলাও মারতে পারিনে।

—তাহলে খামোখা তোমার ফাঁসি হবে কেন?

—বরাত প্যালা—স্রেফ বরাত। কাবলু কাকা মারা গেছেন।

—আ।

—তা ছাড়া কী আর? ওই দু'কোটি ছারপোকা, জানিস তো? ওদের হাতে কারুর রক্ষা আছে? নির্ঘাত ওদের কামড়ে কাবলু কাকা পটোল তুলে বসেছেন। এই দ্যাখ্ না—সকাল থেকে দু'ঘন্টা দুরজায় ধাক্কা দিয়েছি, জানলার ফাঁক দিয়ে পিচকিরি করে বরফ জল দিয়েছি গায়ে, তবু নট্ নড়ন-চড়ন, কিস্‌সু না।

—তবে পুলিশে খবর দাও!

—পুলিশ! ওরে বাবা! এমনিতেই ওরা দু'বার আমার বাড়ী সার্চ করেছে, আমি নাকি চায়ের সঙ্গে চামড়ার কুচো মেশাই। এখনো ধরতে কিছু পারেনি বটে, কিন্তু নেক-নজরটা তো আছে! নির্ঘাত বলবে, চক্রান্ত করে এই ভয়ঙ্কর খাটিয়ায় শুইয়ে আমি কাবলু কাকাকে খুন করিয়েছি। তখন ফাঁসি না হোক—বিশ বছর জেল আমার ঠেকায় কে!

তোমাকে জেলে রাখলে দুনিয়ার অনেক উপকার হবে—আমি মনে মনে বললুম। মুখে সাহস দিয়ে বললুম—চলো দেখি, যাই একবার। বুঝে আসি ব্যাপারটা।

—যেতে যে আমার পা সরছে না, প্যাল্যা।

—তবু যেতেই হবে।—আমি কঠোর হয়ে বললুম—সেই ভয়াবহ খাটে শোয়াবার সময় মনে ছিল না? চলো বলছি—আমি প্রায় জোর করে ঘন্টাদাকে টেনে নিয়ে গেলুম।

কিন্তু বসবার ঘরে ঢুকে আমরা ভূত দেখলুম।

ভূত নয়—সশরীরে কাবলু কাকা বসে। সামনে একটা কাঁচের গ্লাস—তাতে আধ সের আন্দাজ গাওয়া ঘি। একটু একটু করে পরম আরামে চুমুক দিচ্ছেন কাবলু কাকা।

আমাদের দেখেই তিনি হাসলেন। বললেন, এই যে ঘন্টা—কোথায় গিয়েছিলি? আঃ—কাল রাতে যা ঘুমিয়েছি—সুপার্ব। তাই উঠতে আজ একটু দেরীই হয়ে গেল।

ঘন্টাদা একবার হাঁ করলো। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না তার।

কাবলু কাকাঘিয়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন—চর্বি একটু বেশি হয়েছে শরীরে—রাত্তিরে তাই ভালো ঘুম হয় না। কেমন গা জ্বালা করে। কিন্তু কাল সারারাত কারা যেন মোলায়েম ভাবে গা চুলকে দিয়েছে। সে কি আরাম! এক বছরের মধ্যেও আমার এমন নিটোল ঘুম হয়নি। তাই উঠতে একটু দেরীই হয়ে গেল আজ। আমি ভাবছি কি—জানিস ঘন্টা। তিন দিন কেন—মাসখানেকই থেকে যাবো তোর এখানে।

হঠাৎ গোঁ-গোঁ করে আওয়াজ। ঘন্টাদা পপাত-ধরণীতলে।

—কী হলো? ঘন্টার আবার মৃগী আছে নাকি?

আমি বললুম—মৃগী নয়। আপনি একমাস ওর কাছে থাকবেন জেনে আনন্দে মূর্ছা গেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

জার্নি বাই কার

আমি, নেড়া, গজা, ভজা আর ন্যাদা—এই পাঁচজনে মিলে আমরা বাবা যণ্ডেশ্বরের মন্দিরে পিকনিক করতে গিয়েছিলুম। স্টেশন থেকে নেমে আরো দু' মাইল রাস্তা, কিন্তু জায়গাটি ভারী খাসা। বাবা যণ্ডেশ্বরের একটা পুরোনো মন্দির, সামনে বাঁধানো ঘাটওয়ালা দীঘি, দীঘির চারিধারে অনেক গাছ-টাছ, নানা রকমের পাখি-টাখি। সেখানে আধপোড়া খিচুড়ি আর আধসেদ্ধ তরকারী রান্না করে খেয়ে, হাঁড়ি-ফাড়ি ভেঙে যখন আমরা আবার স্টশনের দিকে যাব-যাব ভাবছি, তখন হঠাৎ উঁপ্—উঁপ্—উঁপ্।

দেখি, সামনের খোয়া-ওঠা বিচ্ছিরি রাস্তাটায় একটা কালো-কালো গাবদা চেহারার ঝরঝরে পুরোনো মোটর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। যে ভদ্রলোক গাড়ীটা চালাচ্ছিলেন, তিনি গলা বের করে আমাদের জিজ্ঞেস করছেন, খোকা তোমরা কী করছ এখানে ?

ভদ্রলোকের চোখে কালো চশমা, চেহারা বকের মতো। রোগা, মাথার চুলগুলো যেমন খাড়া-খাড়া, নাকটা আবার পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা। দেখে একদম ভালো লাগে না। ন্যাদা গম্ভীর হয়ে বললে ., আমরা এখানে পিকনিক্ করতে এসেছিলুম।

ভদ্রলোক বললেন, ভেরি গুড।

গজা আরো ভারিক্কী চালে বললে, আমরা এখানে ছুটির দিনটা এনজয় করতে এসেছিলুম।

ভদ্রলোক এবারে বললেন, ভেরি ভেরি গুড্। তা তোমরা কোথায় থাকো ?

আমরা বললুম, চাঁইবাসা।

ভদ্রলোক ভারী খুশি হয়ে বললেন, আরে আমিও তো চাঁইবাসায় থাকি।

নেড়া বললে, তা যান। মোটরে চেপে গড়গড়িয়েই চলে যান। চাঁইবাসা যেতে কারো কোনো বারণ নেই।

—আহা, আমি তো যাবই।—তিনটে পোকা-ধরা দাঁত বের করে ভদ্রলোক হাসলেন : কিন্তু তোমরা যাবে না ?

—যাব বই কি। সন্ধ্যে ছ'টার ট্রেন ধরব আমরা !

—তার মানে এখন দু' মাইল রাস্তা ঠ্যাঙাবে, তারপর আরো এক ঘণ্টা বসে থেকে রেলে চাপবে ? আর রেলে যা ভিড়। হয়তো তিনজন উঠবে, দু'জন উঠতেই পারবে না। তা-ছাড়া গাড়ির কামরাও কি কম বিপজ্জনক ? চোর, জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে—জানো তো ?

ভজা বললে, আজ্ঞে জানব না কেন—সবই জানি। কিন্তু যেতে তো হবেই।

—নিশ্চয় যেতে হবে। তা আমার এই গাড়ীটায় চেপে বসলে কেমন হয় ?

—আপনার গাড়ীতে ?

ভদ্রলোকের টিকটিকির মতো শুকনো মুখের ভেতর থেকে আবার তিনটে পোকা-খাওয়া দাঁত বেরিয়ে এল : একসঙ্গে মিলে বেশ গল্প করতে করতে যেতে পারি। তোমাদের এক পা-ও হাঁটতে হবে না আর সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবে চাঁইবাসায়। চোর, জুয়াচোর, পকেটমার কেউ তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

অবশ্য করবারও কিছু নেই, কারণ পাঁচজনের ফিরে যাওয়ার রেলভাড়া ছাড়া ট্যাঁক আমাদের গড়ের মাঠ। তবু মোটরে যাওয়ার সুযোগ পেলে আর কে ছাড়ে ? যদিও গাড়ীটা দেখতে তেমন ভালো নয়, কি রকম কালো আর ঝরঝরে, তবু মোটরে চড়ে রাজার হালে যেতে কী আরাম ! লোকের মুখের সামনে দিয়ে ভোঁক-ভোঁক করে ধোঁয়া আর ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছি—সবাই তাকিয়ে থাকবে—সামনে থেকে গোরু-ছাগল পালিয়ে যাচ্ছে, গেঁয়ো মানুষগুলো বলছে—সর সর, মোটর গাড়ী আসছে ! খুব কায়দা করে যাওয়া—যাকে বলে !

ভদ্রলোক আরো মিঠে গলায় বললে, উঠে এসো—উঠে এসো। বেশ গল্প করতে করতে আরামসে চলে যাওয়া যাবে।

—বেশ, চলুন তবে।

ভদ্রলোক অমনি হাত বাড়িয়ে ক্যাঁচৎ করে গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন, আর আমরা টপাস-টপাস করে তক্ষুণি উঠে পড়লুম। দু'জন সামনে, তিনজন পেছনে। আমি আর ন্যাদা ভদ্রলোকের পাশেই বসে পড়লুম। আর অমনি ঘ্যার্র-ঘ্যার্র ঘড়াং-ঘড়াং আওয়াজ তুলে গাড়ীটা চলতে শুরু করে দিলে।

অবিশ্যি সীট্-টীটগুলো তেমন ভালো নয়, গদিগুলোতে তাপ্পি মারা, বসে যে খুব আরাম হচ্ছিল তা-ও নয়। তবু মোটর গাড়ী ইজ অলওয়েজ মোটর গাড়ী। ভেতরে নানারকম আওয়াজ হচ্ছে, থেকে-থেকে শীতের কাঁপুনি লাগা বুড়ো মানুষের মতো আচমকা ঝেঁকে উঠছে—তবু বিকট হর্ন বাজিয়ে, চারিদিকের লোক গোরু-ভেড়া-কুকুর-ছাগল তাড়িয়ে বেশ যাচ্ছিল। ন্যাদা কাব্য করে বললে, জার্নি বাই এ কার। কী চমৎকার !

আমি বললুম, হুঁ, অতি মনোহর !

ভজা বললে, চারিদিকে অপরূপ তরুরাজি !

গজা বললে, কী মনোরম বিহঙ্গসমূহ !

মনোরম বিহঙ্গ তেমন দেখা যাচ্ছিল না, এদিক-ওদিক দুটো-একটা চড়ুই-শালিক ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু মোটর গাড়ীতে চাপলে এ-সব ভালো ভালো কথা বলতে হয়, নইলে প্রেস্টিজ থাকে না। নেড়া তো দস্তুরমতো ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বিচ্ছিরি বেসুরো গলায় গানই ধরে দিলে :

'অরুণ প্রাতের তরুণদল
চল্ রে চল্ রে চল—'

সেই টিকটিকির মতো মুখওলা কালো চশমা-পরা রোগা ভদ্রলোক সেই যে আমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কথা বন্ধ করলেন, আর তাঁর সাড়াশব্দ নেই। খালি ঝকর-ঝকর করে গাড়ী চালাচ্ছেন আর ভ্যাঁপাক-ভ্যাঁপাক করে হর্ন দিচ্ছেন। মাইল পাঁচেক বোধ হয় এই রকম কাটল। তারপর—

তারপর সামনে একটা শুকনো নদী। রাস্তাটা তার মধ্যে গিয়ে নেমে তারপর আবার একটা উঁচু ডাঙায় গিয়ে ঠেলে উঠেছে। গাড়ীটা ঝাঁকুনি খেতে খেতে গড়গড়িয়ে নদীতে বেশ নেমে গেল, এক আঁজলা জল আর একরাশ নুড়ি পেরিয়ে নদীর এপারেও চলে এল, তারপর উঁচু ডাঙাটার সামনে এসেই ক্যাচ্যাং ! মানে ডেড্-স্টপ !

আমরা বললুম, কী হলো মশাই, থেমে গেল যে !

আবার পোকা-খাওয়া তিনটে দাঁত বের করে ভদ্রলোক হাসলেন, এই ইয়ে—ক্ল্যাচ্টা ঠিক ধরছে না মনে হচ্ছে। তোমরা যদি নেমে একটু—

—মানে, ঠেলতে হবে ?—আমি ব্যাজার হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

—নইলে,ইয়ে—মানে গাড়ীটা অতখানি উঠতে পারবে মনে হচ্ছে না। মানে,আমি স্টিয়ারিং ধরছি, তোমরা পাঁচজন রয়েছ, ঠেলে একটু তুলে দাও—

—নিশ্চয়-নিশ্চয়—বলে গজা লাফিয়ে পড়ল। আমাদের দলে ও-ই সব চাইতে জোয়ান, জিমন্যাষ্টিক করে, এসব ঠেলাঠেলির ব্যাপারে ওর বেশ উৎসাহ আছে।

কী করা, আমরাও নামলুম। ভদ্রলোক বিনি পয়সায় আমাদের মোটর গাড়ীতে চাপাচ্ছেন, তাঁর জন্য অন্ততঃ এটুকু না করলে কি আর ভদ্রতা থাকে!

অতএব—'মারো জোয়ান হেঁইয়ো! আউড় থোড়া হেঁইয়ো! সাবাস্ জোয়ান—হেঁইয়ো!'

খাড়া পাড়ি, ঠেলতে গিয়ে পাঁচজনের স্রেফ কালঘাম ছুটে গেল। মনে হলো, পেটের আধপোড়া খিচুড়ি আর আধসেদ্ধ তরকারী একেবারে গলায় উঠে আসছে। তবু 'জয় বাবা ষণ্ডেশ্বর' বলে চীৎকার ছেড়ে আমরা গাড়ীটাকে একেবারে পাড়ির ওপর তুলে দিলুম।

ঘাম-টাম মুছে, হাঁপিয়ে-টাপিয়ে নিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি—ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন, আরে আরে, উঠছ কেন? আমি তো চাইবাসা যাব না—যাচ্ছি টাঁকখালি স্রেফ অন্যদিকে।

—তার মানে?—ন্যাদা চেঁচিয়ে উঠল: তবে আমাদের গাড়ীতে ওঠালেন কেন?

—নইলে পাড়ির ওপর ঠেলে তুলত কে? বলেই খ্যাক-খ্যাক করে তিনটে পোকা-ধরা দাঁতে হেসে ভদ্রলোক বললেন: গাড়ী ঠেলবার জন্যে কি আর তোমারা সঙ্গে আসতে? এখন বাঁদিকে মাইল তিনেক হাঁটলে একটা স্টেশন পাবে, আর যদি 'অরুণ প্রাতের তরুণদল' গাইতে গাইতে জোর পায়ে হেঁটে যাও, তা হলে ঘণ্টা তিনেকের ভেতরে চাঁইবাসাই পৌঁছে যাবে। টা—টা—

গজা গর্জন করে বললে, জোচ্চোর! আমাদের চাঁইবাসায় পৌঁছে না দিয়ে—বলেই, লাফিয়ে উঠতে গেল গাড়ীতে। কিন্তু তার আগেই গজার মুখে একরাশ দুর্গন্ধ ধোঁয়া আর এক খাবলা ধুলো ছড়িয়ে ঝকর-ঝকর ঝকাং-ঝকাং করতে করতে সেই ঝরঝরে গাবদা গড়ীটা ত্রিশ মাইল স্পীডে জঙ্গলের রাস্তায় হাওয়া হয়ে গেল।

আর অনেক দূর থেকে যেন একবার ভেসে এল: থ্যাঙ্কিউ—টা—টা—

টিকেট

গোপেশবাবু পাগল হয়ে গেলেন।

পাগল হওয়ার পাত্র তিনি নন—বলাই বাহুল্য। খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক, বেজায় হিসেবী। আর এতই হিসেবী যে বাড়ীর চাকর বাজার করে এনে পাঁচ পয়সার হিসেব ভালো করে দিতে পারেনি বলে—তার মাস মইনের তিন টাকা কেটে তাকে তাড়িয়ে দিলেন তিনি।

যেমন অগাধ টাকা, তেমনি কৃপণ। একজোড়া জুতোয় পাঁচ বছর চলে, একটি জামায় এক

বছর। ছেলে সস্তায় একটা গোটা ইলিশ কিনে এনেছিল বলে রেগে আগুন।

'অ্যাঁ—একটা আস্তো ইলিশ। পাঁচ টাকা দিয়ে! তুই তো আমায় ফতুর করবি দেখছি। বেরো—এক্ষুনি বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে—'

চটবার কথাই। যে-বাড়ীতে হপ্তায় একদিন দু'শো গ্রাম কুচো চিংড়ি আসে, সেখানে একটা গোটা ইলিশ! ছেলে রেগে-মেগে মিলিটারীতে চাকরি নিয়ে হায়দ্রাবাদে রওনা হলো। গোপেশবাবু বললেন, 'বাচা গেল।'

এ হেন গোপেশবাবু পাগল হয়ে গেলেন। কিন্তু কেন গেলেন, সেইটেই বলি।

সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজটা পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে আনা—নিজে অবশ্যই তিনি পয়সা দিয়ে কাগজ কেনেন না।

এমন সময় একটি লোক। গায়ে ময়লা হাফ-শার্ট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে হাঁটু পর্যন্ত ছোট খুতি এবং পায়ে জুতো নেই। রং ঘোর কালো, রোগা চেহারা।

দেখেই গোপেশবাবু বুঝে নিলেন।

'মাপ করো বাবা, এখানে কিছু হবে না।'

লোকটি বললে, 'ভয় পাবেন না—সাহায্য চাইতে আসিনি।'

'তবে কী জন্যে? চাকরি? আমার বাড়ীতে কাজের লোক দরকার নেই এখন।'

'আজ্ঞে, আমি চাকরি চাই না।'

'তবে!'—আশ্চর্য হয়ে গোপেশবাবু বললেন, 'আমাকে দেখতে এসেছো নাকি?'

লোকটি ফিক করে হাসল: 'আজ্ঞে, দেখবার মতো লোক তো আপনি বটেনই! করতেন ফুটপাথে আলু বিক্রি—এখন সাতখানা বাড়ীর মালিক। একেই বলে চলে কর্মবীর! আপনার মতো লোককে দেখলেও তো পুণি হয়।'

গোপেশবাবু ভাবলেন খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু ফুটপাথে আলু বিক্রির কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া তাঁর ভালো লাগল না।

বললেন, 'ঠিক আছে—ঠিক আছে—দর্শন তো হলো। এবার কেটে পড়ো।'

সে বললে, 'জলেই জল বাধে—টাকাই টাকা আনে। একখানা লটারীর টিকিট কিনবেন স্যার! আপনি কপালে লোক, নির্ঘাত পেয়ে যাবেন।'

লটারীরটিকিট। শুনেই গোপেশবাবু শক্ত হলেন। তিনি এ-সবে বিশ্বাস করেন না। আর কোনো কারণ নয়, তাঁর ধারণা ওগুলো স্রেফ ধাপ্পাবাজি। ওদের সব নিজেদের লোকের সঙ্গে সাঁট থাকে—তাদেরই দিয়ে দেয়। আর যত বোকারা আশায় আশায় টিকিট কিনে টাকা নষ্ট করে।

'অ, তুমি বুঝি লটারীর এজেন্ট? দোকান বসিয়ে কুলোয় না—তাই বাড়ী বাড়ী হানা দাও? যাও—যাও—ওসবের মধ্যে আমি নেই।'

'না স্যার—আমি এজেন্ট নই। কাল এক টাকা দিয়ে একটা কিনেছি। কিন্তুবেকার লোক স্যার—আজ দেখছি এ বেলা যে দু'খানা রুটি কিনে খাব, তারও সংস্থান নেই। সেই টিকিটটা আপনাকে বেচতে চাই—পকেট থেকে একটা টিকিট বের করল: 'এক্স্-৫৮৮—'

'লটারীর টিকিট? আমি কিনব না—বেরোও।'

'স্যার, রাস্তার গণৎকার বলেছিল, এটা লাকি নাম্বার—লাগবার চান্স্ আছে। আপনি কপালে লোক, পেয়ে যাবেন। নিয়ে নিন। 'এক্স্-ফাইভ এইট্ এইট্—'

'রাস্তার গণৎকার? জেচ্চোর।'

www.boiRboi.blogspot.com

'স্যার, অত অবিশ্বাস করতে নেই। কিসে যে কী হয় বলা যায় না। নিতান্তই খিদের জ্বালায় এটা আপনাকে বেচতে এসেছি। বেশ—এক টাকা না দেন, বারো আনাই দিন।'

'বেরোও।'

'আজ্ঞে, আট আনা? ছ'আনা? অন্ততঃ চার আনাই দিন তা হলে—খিদেয় ভারী কষ্ট পাচ্ছি স্যার—'

'গেট আউট—গেট আউট।'

ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করলেন গোপেশবাবু। লোকটা হকচকিয়ে নেমে গেল রাস্তায়।

ঠিক সতেরো দিন পর। ঠিক বেলা এগারোটা। পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে-আনা কাগজটা পড়তে পড়তে—

হঠাৎ প্রবল একটি লাফ।

সেই লটারীর ড্র! এবং প্রথম প্রাইজ তিন লক্ষ টাকা—এক্স্ ফাইভ এইট্ এইট্ জিরো সেভেন। অবশ্য, ফাইভ এইট্ এইট্ পর্যন্ত শুনেছিলেন গোপেশবাবু—লোকটাকে আর পাত্তাই দেননি।

কিন্তু কে বলতে পারে যে, তারপরে জিরো সেভেন ছিল না! আর-রাস্তার গণৎকার বলেছিল, লাকি নাম্বার। লোকটা বলেছিল, আপনি কপালে লোক—পেয়ে যাবেন।

'গেল—গেল—গেল আমার তিন লক্ষ টাকা—'ভুকরে কেঁদে উঠলেন গোপেশবাবু।

দৌড়ে এল বাড়ীসুদ্ধ লোক। চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে রাস্তায় বেরুলেন গোপেশবাবু 'ধরো—খোঁজো সেই লোকটাকে—খাঁকি হাফ শার্ট—রং কালো—রোগা—খেতে পায় না—'

কিন্তু পনেরো দিন আগে যে এসেছিল, আজ আর কে ধরবে তাকে কলকাতার রাস্তায়? বরং গোপেশবাবুকেই জাপটে ধরতে হলো সবাইকে, নইলে একটা ডবল-ডেকারের তলায় চাপা পড়তেন ভদ্রলোক।

মুখে ফেনা তুলে চ্যাঁচাচ্ছেন তখনো: 'ধরো লোকটাকে—আমার তিন লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল।'

এখন গোপেশবাবু বদ্ধ পাগল। মানে—দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় তাঁকে।

www.boiRboi.blogspot.com

পরের পয়সায়

একেবারে সময় মতো এসে পড়েন পুণ্ডরীকবাবু। যাকে বলে তাক বুঝে।

আমার ছেলেবেলার বন্ধু সুধীর ঘোষের একটা বড়ো ছাপাখানা আছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পর আমি সেখানে গল্প-টল্প করতে যাই। সুধীরের প্রেসের উলটো দিকে এ তল্লাটের একটা নামকরা রেস্তোরাঁ রয়েছে। আমি গেলে সুধীর প্রায়ই না খাইয়ে ছাড়ে না। কখনো গরম কাটলেট আনায়, কখনো পুডিং, কখনো ওমলেট! সুধীর নিজে খেতে ভালোবাসে, খাওয়াতেও।

দোতলায় ওর অফিস ঘরের নিরালায় আমাদের খাওয়া চলে, আড্ডাও হয়। আর কী আশ্চর্য, যেই বেয়ারা খাবারের ট্রে-টা নিয়ে ঘরে এল, অমনি তার পেছনে ঢোকেন পুণ্ডরীকবাবু। পুণ্ডরীক ভটচায।

এ-পাড়ায় থাকেন না, থাকেন বাদুড়বাগানে। ছাপাখানার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করেন, অন্য সময় ইনসিয়োরেন্সের দালালী করেন। কী সূত্রে, কবে যে সুধীরের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল, সুধীরও মনে করতে পারে না সে-কথা। কিন্তু পুণ্ডরীকবাবু ঠিক জেনে ফেলেছেন, আমি এলেই খাবার আসবে। এবং খাবার এসে পৌঁছোনো মাত্র—

'এই যে সুধীরবাবু, ভালো তো?'—মুখের কাঁচাপাকা দাড়ির ভেতর দিয়ে দাঁতের ছটা বেরিয়ে আসে তাঁর: 'সুকুমারবাবুর খবর সব ভালো?'—বলেই চেয়ার টেনে বসে পড়েন, তারপর নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে বলেন, 'বাঃ, কী এল? পুডিং নাকি? বেড়ে গন্ধটি বেরিয়েছে তো? পুডিং খেতে আমি ভীষণ ভালোবাসি মশাই!'

পরের অবস্থা বুঝতেই পার। তখন আর তাঁকে বাদ দিয়ে খাওয়া যায় কিছু? হয় আর এক প্লেট আনাতে হয় তাঁর জন্যে, নইলে আমাদের থেকেই ভাগ দিতে হয়। আর কী মন দিয়ে যে খান! পুডিংয়ের প্লেট দু-হাতে মুখের কাছে ধরে চাটতে থাকেন, কাটলেটের হাড়-ফাড় চিবিয়ে একেবারে পাউডার! দাড়িতে দৈবাৎ একটা পেঁয়াজ কুচো লেগে থাকলে সেটাকে খুঁজে বের করে—মুখে পুরে, তবে নিশ্চিন্তি!

আমরা বলি, 'পুণ্ডরীকবাবু, আপনি ভটচায বামুন, খুব নিষ্ঠাবান, দু'বেলা গঙ্গাস্নান করেন, জামার তলায় রুদ্রাক্ষের মালাও রয়েছে। মুরগীর ডিম-দেওয়া পুডিং খান কেন, মুরগীর হাড়ই বা চিবোন কী বলে?'

পুণ্ডরীকবাবু খুশী মনে দাড়ি মুছতে মুছতে বলেন, 'আপনিও তো বামুনের ছেলে, আপনি খান কেন?'

'আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করি না, গঙ্গাস্নানেও যাই না। কিন্তু আপনি এমন সাত্ত্বিক হয়েও—'

'আরে, অগস্ত্যের বংশধর না?'—হা-হা করে হাসেন পুণ্ডরীকবাবু: 'অগস্ত্য মুনি কী করেছিলেন, মশাই? পুরাণের কথা মনে নেই? একটা গোটা অসুরকেই হজম করে ফেলেন। মুরগী তো তার কাছে তুচ্ছ জিনিস, মশাই!'

মোক্ষম যুক্তি যাকে বলে!

পুণ্ডরীকবাবুকে খাওয়াতে সুধীরের আপত্তি নেই, তার মনও ছোট নয়। কেউ যদি খেতে ভালোবাসে, তাকে খাইয়ে ভালোও লাগে। কিন্তু খাওয়ার লোভ জিনিসটাই বিশ্রী।

পুণ্ডরীকবাবুর খাওয়া দেখলে, খাবারের দিকে তাঁর জ্বলজ্বলে চাউনি দেখলে, দু-হাতে তুলে প্লেট চটতে দেখলে এমন জঘন্য লাগে যে, কী বলব ! কখনো কখনো দস্তুরমতো গা বমি-বমি করে।

লোকটি যে গরীব, খেতে পান না, তা তো নয়। তা হলে মায়া হতো। চাকরিটা ভালো করেন, ইনসিয়োরেন্সের কাজ করে বেশ দু-পয়সা পান, বাদুড়বাগানে পৈতৃক বাড়ী—তার একতলা দোতলা থেকে শ-তিনেক টাকা অন্ততঃ ভাড়া পান, দমদমে একটা বড়ো বাগানও আছে। যে-কোনো সাধারণ গেরস্তর চাইতে ঢের বেশী বড়লোক তিনি। অথচ ওই স্বভাব—পরের পয়সায় খেয়ে বেড়াবেন।

আবার ভণ্ডামিও আছে। প্রায়ই বলেন, 'একদিন সুধীরবাবু আর সুকুমারবাবুকে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গিন্নীর হাতের পোলাও, তপসে মাছের ফ্রাই, দই-ইলিশ আর মাংসের কোর্মা খাওয়াব। আমার গিন্নী এ-সব যা রাঁধেন, বুঝলেন—' বলতে বলতে সুরুৎ করে জিভের জল টেনে নেন একবার : 'খেলে জীবনে আর কোনোদিন ভুলতে পারবেন না।'

ভুলতে আমরা চাই না, কিন্তু খাওয়ার চান্স্ আর পাচ্ছি কোথায় ! তিন বছর ধরে পোলাও-ফ্রাই-কোর্মার—গল্পই শোনাচ্ছেন কেবল, কিন্তু এক পেয়ালা চা পর্যন্ত কখনো খাওয়ালেন না !

আশ্চর্য এই যে, যেদিন খাবার নেই, সেদিন পুণ্ডরীকবাবুও নেই। শুধু চা এলে পুণ্ডরীকবাবু আসেন না। চা তিনি খান না, বলেন, ও-সব বিদেশী পানীয়, ব্রাহ্মণের খেতে নেই। তাছাড়া চা খেলে খিদে নষ্ট হয়, জুত করে খাওয়া যায় না।

এইটেই আসল কথা। মুরগী খেলে ব্রাহ্মণের কিছু হয় না, আর ক'টা শুকনো পাতা একটু দুধ আর চিনি মিশিয়ে খেলেই ধর্মকর্ম গেল ? কী লোক—দেখেছ !

আমাদের গোড়ার দিকে সমস্যা ছিল, কী করে টের পান পুণ্ডরীকবাবু ! কোনো যোগফল-টল আছে নাকি ভদ্রলোকের ? আমাদের জন্যে চপ-কাটলেট-কারী-ফ্রাই পুডিংয়ের অর্ডার গেলেই মন্ত্রের জোরে টের পেয়ে যান, আর তৎক্ষণাৎ মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি আর জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে—হাওয়ায় উড়ে পৌঁছে যান দোতলার ঘরে : 'বাঃ, কী এল আজ ? কবিরাজী কাটলেট ? গন্ধেই মাত হয়ে গেছে, মশাই ! বেড়ে তৈরি করে কিন্তু আপনাদের রসনারঞ্জন রেস্তোরাঁ !'

অতএব ভাগ দিয়ে হয়। চোখ বুজে মনের সুখে মুরগীর হাড় চিবুতে থাকেন পুণ্ডরীক, আর সুধীর আর আমি মনে মনে যা বলতে থাকি—

যা বলতে থাকি, সে আর তোমাদের শুনে কাজ নেই। মোটের উপর, সেটা পুণ্ডরীকের দীর্ঘ-জীবন কামনা নয়—বলাই বাহুল্য !

অবশ্য—টের পান কী করে,একটু গোয়েন্দাগিরির সাহায্যে সেটা আবিষ্কার করেছি আমরা। রেস্তোরাঁর বাঁ দিকে রোডয়োসারাইয়ের ছোট দোকান আছে একটা। রোজ বিকেলে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকেন পুণ্ডরীকবাবু, দোকানদারের সঙ্গে অকারণ খোশ-গল্প করেন আর কড়া নজর রাখেন রেস্তোরাঁর দিকে। যেই খাবারের ট্রে তোয়ালে ঢাকা দিয়ে সুধীরের প্রেসের দিবে রওনা হলো, তৎক্ষণাৎ—

সুধীর বলে, 'লোকটা চিনেজোঁক রে !'

আমি বলি, 'কী আর করবি ? ওঁর জন্যে একটা বাড়তি প্লেটের অর্ডার দিয়ে রাখিস, তা হলেই আর ঝামেলা থাকে না।'

সুধীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমার মনে হয় কী জানিস ? মরবার পরেও আমার সঙ্গ ছাড়বে না।'

আমি বলি, 'বোধহয় না। স্বর্গে গিয়ে তুই থালা নিয়ে বসেছিস, সঙ্গে সঙ্গে এসে বলবে, কী খাচ্ছ হে ? বেড়ে জিনিস তো !'

'তুই কী মনে করিস, অমন লোভী লোক কখনো স্বর্গে যাবে ?'

'না গেল ! নরক থেকেও দৌড়ে আসবে। স্বর্গের কোনো দারোয়ান ওকে ঠেকাতে পারবে না।'

স্বর্গে ধাওয়া করুন আর নাই করুন, মর্তে যে তাঁর হাত থেকে কোথাও নিস্তার নেই, তার প্রমাণ পেতেও দেরি হলো না।

গরমের সময় দিন পনেরোর জন্যে দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েছিল সুধীর। ফিরে এসেই পরের দিন সকালে সোজা আমার বাড়ীতে।

'কি রে, কেমন বেড়ালি ? এই পনেরো দিনে ওজন-টোজন কিছু বাড়ল ?'

'বুত্তোর ওজন !' —সুধীর একেবারে খাঁচমাচ করে উঠল : 'এমন জানলে কে পয়সা নষ্ট করে যেত দার্জিলিঙে ? সেই তুই যে বলেছিলি, মরলেও আমার নিস্তার নেই, নরক থেকে তেড়ে আসবে ? ঠিক তাই।'

'তার মানে ?'

'মানে বুঝিসনি ? সেখানেও পুণ্ডরীক ভটচায।'

'আ।'

'হ্যাঁ। আদি আর অকৃত্রিম। সেই দাড়ি, সেই দাঁত, বাড়তির মধ্যে গলায় একটা হলদে মাফলার, ভালুকের মতো একটা কোট আর একটা ধুসো চাদর।'

'বলিস কি ! পুণ্ডরীকবাবুও বেড়াতে গিয়েছিলেন নাকি ওখানে ?'

'খেপেছিস !'—নিমপাতা খাওয়ার মতো মুখ করল সুধীর : 'পয়সা খরচ করে বেড়াতে যাবে, সেই পাত্তর কি না পুণ্ডরীক ভটচায ! দার্জিলিঙে ওঁর এক মেয়ে-জামাই থাকে, তাদের ছেলের অন্নপ্রাশন, সেই জন্যে তারাই খরচ পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওঁকে। বেশ পরমৈপদী বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া। আর নাতিকে বুড়ো অন্নপ্রাশনে কী দিয়েছে, জানিস ? স্রেফ একখানা বর্ণ-পরিচয়—ছ' আনা দামের।'

'তোকে কে বললে, এ সব ?'

'নিজেই। বললে, অন্নপ্রাশনে সোনা-টোনা দেবার কোনো মানেই হয় না। বিদ্যের মতো অমূল্য রত্ন আর কিছু নেই—তার ওপরে আবার বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় ! এর চাইতে ভালো কী আর হতে পারে !'

আমি বললুম, 'ডেনজারাস্ !'

'ডেনজারাস্ বলে ডেনজারাস্ ! মরুক গে, বুড়ো তার নাতিকে যা খুশি দিক, আমার কিছু আসে যায় না তাতে। বুঝলি, রোজ সকালে হোটেলে আমার ঘরে যেই ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে, অমনি দাড়ি আর দাঁত নিয়ে এসে হাজির। আর ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বলে—রুটি-মাখম, ডবল-ডিমের ওমলেট, কলা, আবার মিষ্টিও দেয় ! বাঃ—বাঃ ! আমার মেয়ের বাড়ীতে সকালে রুটি-মাখন ছাড়া আর কিছুই হয়-টয় না। রুটিগুলো তো খুব ভালো দেখছি, আর কী গন্ধই বেরিয়েছে ওমলেটের—বেড়ে !' —সুধীর দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল : 'তারপরে তো বুঝতেই পারছিস !'

'বিলক্ষণ।'

'বিকেলে জলখাবার খেতে দেবে, তখনও এসে হাজির। ওটা কী খাচ্ছ হে, কাটলেট ? আমার মেয়ের ওখানে এ-সব দেয়-টেয় না ! তা কাটলেটটা খেতে খুব ভালো—তাই না ? এখানকার মুরগীগুলো যা পুরুষ্টু !' —সুধীর আবার দাঁত কিড়মিড় করল : 'মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে করত পুণ্ডরীককে দিই একদিন পাহাড় থেকে ঠেলে নীচের ঝর্নাটার ভেতরে। সে তো আর

www.boiRboi.blogspot.com

পারা যায় না, তাই কলকাতায় চলে এসেছি। নইলে আরো কিছুদিন থাকতুম রে। ভারী চমৎকার সীজন এখন ওখানে—বৃষ্টি নেই, রোজ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।'

'তা হলে পুণ্ডরীকবাবু রয়ে গেলেন দার্জিলিঙে?'

'সেই বান্দা!' —সুধীর বাঘাটে গলায় বললে, 'যেই শুনল আমি আসছি, সঙ্গে সঙ্গে বাক্স নিয়ে দার্জিলিঙ মেলে এসে উঠল। বললে, একসঙ্গে যাওয়া যাক। আর শিলিগুড়ি ইস্টিশনে বেশ করে আমার পয়সায়—'

'হুঁ।'

সুধীর একটু চুপ করে থেকে বললে, 'শোন, এবারে নির্মম প্রতিশোধ নেব একটা।'

'কি রকম?' —আমি বেশ উৎসাহ বোধ করলুম।

'তোকে এখন সবটা বলব না—' সুধীরের চোখ জ্বলতে লাগল: 'কাল সন্ধ্যেয় আসতে বলেছি পুণ্ডরীককে। লেটুস আর টোম্যাটো দিয়ে তৈরী ইতালীয়ান ওমলেট খাওয়াব বলে। তুইও অবশ্য আসবি।'

'লেটুস আর টোম্যাটোর ইতালীয়ান ওমলেট!' —আমি খাবি খেলুম: 'শুনিনি তো কখনো!'

'এবারে শুনবি।' —সুধীর উঠে দাঁড়াল: 'তা হলে কাল চলে আসিস আমার অফিসে। ঠিক ছ'টায়।'

গিয়ে দেখি, আমার আগেই আজ এসে গেছেন পুণ্ডরীকবাবু। আজকে আর তাঁর রেডিয়োর দোকানে ওত পেতে বসে থাকতে হয়নি—সুধীরই তাঁকে খেতে ডেকেছে। আনন্দে দাড়িসুদ্ধ চকচক করছে পুণ্ডরীকবাবুর।

আমাকে দেখেই এক গাল, মানে, এক দাড়ি হেসে বললেন, 'এই যে সুকুমারবাবু, ভালো আছেন? বেশ আনন্দে ক'টা দিন কাটানো গেল দার্জিলিঙে, সুধীরবাবুর সঙ্গে।'

সুধীর ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল কেবল।

পুণ্ডরীক আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল রসনারঞ্জন রেস্তোরাঁর বেয়ারা। বাস্, কথা বন্ধ—পুণ্ডরীক জ্বলজ্বল করে চেয়ে রইলেন ট্রের দিকে।

তিনটে প্লেটে তিনটে কোল-বালিশের মতো মোটা মোটা ওমলেট। কিন্তু তাদের রঙ ঘন সবুজ, তাতে লালের ছিটে। অমন ওমলেট আমি কখনো দেখিনি।

একটা নকশা-কাটা বাহারে প্লেট তুলে নিয়ে সুধীরই এগিয়ে দিলে পুণ্ডরীকের সামনে।

'কেমন সবুজ রঙ—' মুগ্ধ হয়ে বললেন পুণ্ডরীক।

'সেদ্ধ লেটুসের পাতা বেটে দিয়েছে কিনা, তাই।'

'আবার লাল-লাল।'

'টোম্যাটোর কুচি।'

'তা হলে লেগে পড়া যাক—' বলেই চামচে দিয়ে খানিক কেটে মুখে পুরলেন পুণ্ডরীক। আমিও একটু খেলুম। লেটুস পাতা আর টোম্যাটো মেশানো আছে বটে। খেতে অদ্ভুত, কিন্তু খুব ভালো লাগল না।

পুণ্ডরীক একটু খেয়ে বললেন, 'ঝালটা যেন একটু—'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম: 'ঝাল আর কোথায়—' কিন্তু সুধীরের চোখের ইশারায় থেমে গেলুম। এদিকে পুণ্ডরীক বিদ্যুৎবেগে ওমলেটটা শেষ করলেন, আর করেই—তার চেয়েও দ্রুতবেগে উঠে দাঁড়ালেন।

'কী বলে ইতালীয়ান ইয়ে—উস্ উস্—খেতে ভালোই—উস্ উস্—তবে ঝালটা একটু—'

www.boiRboi.blogspot.com

বলতে বলতে যেন বাঘে তাড়া করেছে, এইভাবে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে বললুম, 'ব্যাপার কি রে?'

সুধীর মুচকি হেসে বললে, 'বিশেষ কিছু না। ওই ফুল-কাটা প্লেটের ওমলেট যা ছিল, তা স্রেফ পঞ্চাশ গ্রাম ধানী লঙ্কা বাটা।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, ওঁর জন্যে স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করিয়েছিলুম। আরে তুই হাত গোটাচ্ছিস কেন? আমাদের এ দুটোয় লেটুস আর টোম্যাটো ছাড়া কিছু নেই। ওর ধানী লঙ্কার ওমলেটের সঙ্গে চেহারা মেলাবার জন্যেই তো এই প্রিপারেশন করাতে হলো। খেয়ে দেখ্ না!'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'কিন্তু পঞ্চাশ গ্রাম ধানী লঙ্কা! ধাক্কা সামলাতে পারবেন?'

সুধীর বললে, 'সব পারবেন, অগস্ত্যের বংশধর না? দেখলি না, যা ঠোঁটে ছোঁয়ালে জিভ পর্যন্ত জ্বলে যায়, তার সবটা খেয়ে তবে বেরুলেন?'

'তাহলে খাইয়ে কী লাভ হলো?'

'দিনকতক তফাৎ থাকবেন। একটু জোলাপও মেশানো আছে কিনা।'

মোক্ষম দাওয়াই। দিন চারেক আর পাত্তা নেই পুণ্ডরীকবাবুর।

সেদিন গিয়ে দেখি, সুধীর বিষণ্ণ মুখে বসে।

'কী হলো রে?'

'ভারী অন্যায় হয়ে গেছে ভাই। লোকটা লোভী, তাই বলে অতটা করা ঠিক হয়নি রাগের মাথায়। ওর ছেলের মুখে আজ রাস্তায় খবর পেলুম, পাঁচ দিন ধরে পেটের যন্ত্রণায় দাপাচ্ছে লোকটা। কিন্তু ডাক্তার ডাকেনি, পাছে পয়সা খরচ হয়।'

আমি বললুম, 'সে কী!'

সুধীর বললে, 'কী আর করা ভাই! আমিই ডাক্তার নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছি। ওষুধও কিনে দিলুম।'

এবারেও পুণ্ডরীকের জিত;

ওষুধ খাচ্ছেন, তা-ও পরের পয়সায়।

পিসেমশায়ের মামার গল্প

—জানিস, আমার পিসেমশাইয়ের মামা ছিলেন বনেদী জমিদার। চপচপে ঘি দিয়ে পোলাও খেতেন, আস্তো আস্তো পাঁঠা খেতেন, টগবগিয়ে ইয়া বড়া-বড়া অস্ট্রেলিয়ান ঘোড়া হাঁকাতেন আর ভেলভেটে মোড়া মস্ত তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে নানারকম এক্স্পেরিমেন্টের কথা ভাবতেন।

—এক্স্পেরিমেন্ট? সাইন্টিস্ট ছিলেন বুঝি?

—সাইকিস্ট না হাতি ! বনেদী জমিদার আবার লেখাপড়া করে নাকি ? কোনোমতে খবরের কাগজটা পড়তে পারতেন—বিদ্যের দৌড় তো ঐ পর্যন্তই।

—লেখাপড়া জানতেন না তো এক্সপেরিমেন্ট করতেন কী করে ?

—আরে সেইটেই তো তোকে বলছি। খবরদার, ডিস্টার্ব করিসনি। কান পেতে শুনে যা।

পিসেমশাইয়ের মামা—মানে যার নাম ছিল নরসিংহবাবু, তাঁর পরীক্ষা চলতো নানা রকম চলতি কথা নিয়ে—যাকে বলে প্রবাদ। সেগুলোকে তিনি কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন।

যেমন, পিসেমশাইয়ের মামা—মানে নরসিংহবাবু শুনলেন, 'নেপোয় মারে দই !' তাঁর এক দূর-সম্পর্কের ভাইপো ছিল, নাম নেপাল, সবাই তাকে 'নেপো' বলে ডাকতো। নরসিংহবাবু ভাবলেন, নেপো যখন আছে, দইও যখন পাওয়া যায় বিস্তর—তখন একবার পরখ করেই দেখা যাক। কাজেই দুটো পেল্লায় হাঁড়ি ভর্তি প্রায় সের পাঁচেক দই এনে নেপোকে বললেন, 'খা। মানে সবটাই মেরে দিতে হবে তোকে।'

দইয়ের হাঁড়ি দেখেই তো নেপোর আত্মারাম খাঁচাছাড়া ! সে কাঁউমাউ করে বললো, 'কাকা, এতোটা দই—'

নরসিংহবাবু সিংহনাদ করে বললেন, 'কোনো কথা শুনতে চাই না। শাস্তোরে যখন বলেছে, আর তোর নাম যখন নেপো, তখন ও দই তোকে মেরে দিতেই হবে। নইলে আমি তোকেই মেরে ফেলবো।'

তারপর নেপোর সেকি নিদারুণ দশা ! দই খেতে খেতে পেট ফুলে গেল, চোখ কপালে ঠেলে উঠলো, দম বেরিয়ে যাওয়ার জো হলো, তবু থামবার জো নেই। তারপর নেপো যখন গ্যাঁ-গ্যাঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেল, সিকি হাঁড়ি দই তখনো বাকি।

নরসিংহবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'যাক—পরীক্ষেটা সার্থক হলো।'

আর নেপো ? গলা ভেঙে, সর্দিজ্বরে ভুগে, সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার।

তাঁর আর এক ভাইপো ছিল, তার নাম নন্দ। বেশ মোটাসোটা গোলগাল ভালোমানুষ সে। একদিন—কথা নেই বার্তা নেই—নরসিংহবাবু নাপিত ডেকে নন্দর মাথাটা বিলকুল ন্যাড়া করে দিলেন।

ভয়ে নন্দ কথা বলতে পারলো না, শৌখিন টেরি ছিল তার মাথায়, কেবল টেরির দুঃখে সে ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদতে লাগলো।

নরসিংহবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'চোপরাও—এক্ষুনি চলে যাও পুকুরের ধারে বেলগাছের তলায়। ন্যাড়া বেলতলায় যায় কিনা, সেটা আমি এবার দেখতে চাই।'

নন্দ আর কী করে ? সেই চকচকে ন্যাড়া মাথায় চলে গেল বেলতলায়। আর বেলতলায় বসে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু বেশিক্ষণ কাঁদতেও হলো না—হঠাৎ ফটাস—আর সঙ্গে সঙ্গেই ধপাস !

—কে ফটাস—কী ধপাস ?

—কে আবার ফটাস—পাকা বেল। পড়লো নন্দর ন্যাড়া মাথায়। আর ধপাস—মানে একটা চিৎকার ছেড়েই নন্দ চিৎ ! বরাত জোরে মাথাটা ফাটলো না—একটা কমলালেবুর মতো ফুলে উঠলো চাঁদিটা। আর পিসেমশাইয়ের মামা বেশ করে গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন, 'যাক, এ-পরীক্ষেটাও ভালোই হলো। বুঝতে পারলুম—ন্যাড়া কেন বেলতলায় যায় না।'

—কী ডেঞ্জারাস লোক রে !

—ডেঞ্জারাস বলে ডেঞ্জারাস ! বাড়িসুদ্ধ লোক প্রায় পাগল হয়ে গেল। নরসিংহবাবুর এক্সপেরিমেন্টে ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠলো চারদিকে। তারপর একদিন নিজেই টের পেয়ে গেলেন, কতো ধানে কতো চাল হয়। ধর্মের ঢাক বেজে উঠলো—ব্যাস্—ঠাণ্ডা।

—কী করে ঠাণ্ডা হলেন ?

—বলছি। সকলের ওপর পরীক্ষা-টরীক্ষা চালিয়ে একদিন তাঁর মনে হলো, একবার দেখতে হবে 'পরের হাতে তামাক খেতে' কেমন লাগে। অর্থাৎ তিনি তামাক খাবেন, আর অন্যলোক তাঁর মুখের কাছে হুঁকো ধরে থাকবে।—তা এ আর শক্তটা কী ? বাড়িতে তো ডজন দুই চাকর। তাদের তিনটেকে তিনি এই কাজে লাগিয়ে দিলেন। তারা তামাক সেজে আনে আর পিসেমশাইয়ের মামা বুরুর-বুরুর করে সেই তামাক টানেন। দেখলেন, পরের হাতে তামাক খাওয়াটা ভারি সুখের ব্যাপার, হাতে করে হুঁকো ধরবার কষ্টটুকুও সইতে হয় না—যেদিকে মুখ ঘোরান সেদিকেই হুঁকো এমনকি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটেন—তখনো তৈরি-হুঁকো তাঁর মুখের সামনে যেন নাচতে থাকে।

তামাক খাওয়ার এই নতুন কায়দাটা শিখে নরসিংহবাবুর আনন্দের আর সীমা রইলো না। একদিন দুপুরে ভেলভেটে মোড়া তাকিয়া ঠেসান দিয়ে অমনিভাবে তামাক খাচ্ছেন, আর একটা নতুন কোনো এক্সপেরিমেন্টের প্ল্যান আঁটছেন, সেই সঙ্গে ঝিমোচ্ছেন অল্প অল্প, ঠিক তখন—

তখন কোত্থেকে এক ডেঁয়ো পিঁপড়ে—বিশেষ কিছু করলো না, কেবল যে চাকরটা মুখের কাছে হুঁকো ধরে বসে ছিল, তার পায়ের আঙুলে বসিয়ে দিলো এক মোক্ষম কামড়।

'বাপ্‌রে' বলে চাকরটা মারলো রাম লাফ। হুঁকো থেকেও লাফিয়ে বেরুলো কল্কেটা, আর তার সবটা জ্বলন্ত তামাক, সব ক'টা গনগনে টিকে সোজা উল্টে পড়লো নরসিংহবাবুর টাকে !

'গেছি—গেছি—জ্বলে মরলুম—উরে ব্বাপস—' বলে নরসিংহবাবু খ্যাঁকশেয়ালের মতো দাপাদাপি করতে লাগলেন—চিৎকারে সাত-পাড়া এক হয়ে গেল। আর পিসেমশাইয়ের মামার সেইটেই হলো শেষ এক্সপেরিমেন্ট। কারণ, সেদিনই তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝে গেলেন—'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে' এই বচনটার মানে কী।

www.boiRboi.blogspot.com

কবিতার জন্ম

বল্টুদা আমাকে বললে, শুক্তিগাছার নাম শুনেছিস কখনো ?

আমি বললুম, না।

বল্টুদা খুব উদাস মতন হয়ে, আকাশের দিকে চোখ তুলে, কবির মতন বললে, সে এক আশ্চর্য জায়গা। সেখানে পুকুরভরা কোকিল-দোয়েল-পাপিয়া, গাছভরা রুই-কাতলা-চিংড়ি—

আমি চমকে বললুম, কী বললে ?

—ও-হো, ভুল হয়েছে। মানে, সেখানে গাছভরা কোকিল-দোয়েল—

বল্টুদা সেই আধঘণ্টা ধরে কী রকম কবি-কবি মুখ করছে, কাক-টাক দেখলেই কেন যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—আমার ভারী বিরক্তি ধরে গেল। আমার পিসতুতো ভাই ফুটদা একবার কবি হয়ে ধোপার খাতায় পদ্য লিখেছিল আর পিসেমশাই তার কান পাকড়ে ধরে ডন-বৈঠক

করিয়েছিলেন। সেই দুঃখে ফুটুদা আর কিছুতেই আই-এ পাস করতে পারল না। আর তারপর থেকে কারুর কবি-কবি মুখ দেখলেই ভারী বিচ্ছিরি লাগে আমার।

আমি উঠে পড়লুম। বল্টুদা বললে, কোথাও যাচ্ছিস ?

—চাটুজ্জেদের রোয়াকে। ওখানে টেনিদা আছে, হাবুল আছে—

টেনিদার নাম শুনেই বল্টুদা চটে গেল। বললে, ওই জুটেছে তোদের এক মুরুব্বী—ওই টেনি ! বাজে গপ্পের ডিপো, খালি গাঁ-গাঁ করে চ্যাঁচাতে পারে। ওর চ্যালাগিরি না করলে বুঝি পেটের ভাত হজম হয় না ? আমার কাছে একটু বসলে আমি কি তোকে কামড়ে দেবো ?

আমি বললুম, তুমি যে কবি হয়ে যাচ্ছ। কাউকে কবি হতে দেখলেই আমার ভয় করে।

বল্টুদা বললে, কেন ভয় করে ? কবিরা কি মানুষ খায় ? বাজে বকিসনি প্যালা। কবিতা যে কখনো কখনো কী মহৎ কাজে লাগে, সেইটে বোঝাবার জন্যেই তো তোকে আমি শুক্তিগাছার কথা বলছিলুম। কিন্তু তুই সমানে ছটফট করছিস। গল্পটা শুনতে চাস তো চুপ করে বসে থাক ওখানে।

গল্প শুনতে কে আর না চায় ? আমি নিমগাছটার তলায় বল্টুদার পাশেই বসে পড়লুম। বেশ মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছিল আর টুপটুপ করে পড়ছিল পাকা নিমের ফল। ফলগুলো দিব্যি পাকা আঙুরের মতো দেখতে। কিন্তু মুখে দিলেই—ওঃ ! কী বিটকেল স্বাদ আর কী যাচ্ছেতাই গন্ধ !

বল্টুদা বললে, শুক্তিগাছা—মানে, সে এক অদ্ভুত জায়গা। সেখানে নদী কুলকুল করে গান গায়, সেখানে পাহাড় থেকে ঝরনা-টরনা নামে, সেখানে চাঁদনী-টাদনী যেন কী-সব হয়, দোয়েল-শ্যামা-বুলবুলি—এরা তো আছেই। কিন্তু হলে কী হবে, শুক্তিগাছার মেসোমশাই কবিতার নাম শুনলেই আগুন হয়ে যান। তিনি বলেন, কবিরা মনিষ্যি নয়, তাদের মাথা খারাপ, লোকগুলোকে ধরে ধরে খাঁচায় রেখে দেওয়া উচিত। ইস্কুলে কবিতার পড়া থাকলেও বাড়িতে কেউ তা চেঁচিয়ে পড়তে সাহস পেতো না। যদি মিহি সুরেও কারো গলা দিয়ে বেরিয়েছে : 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল', সঙ্গে সঙ্গে মেসোমশাই তাকে 'ঘোড়াঘোড়া ঘাস-ঘাস'-এর ত্রৈরাশিক অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন।

বললে বিশ্বাস করবিনে প্যালা, সেই মেসোমশাইয়ের ছোট ছেলে পোকন কবি হয়ে গেল। কী করে যে হলো, সেও এক তাজ্জব ব্যাপার। ছেলেবেলা থেকেই দাঁতে পোকা বলে ওর ঠাকুমা ওই নাম দিয়েছিল ওকে। প্রায়ই ওর পোকা-খাওয়া দাঁতে যন্ত্রণা শুরু হতো, আর অমনি কাঁউমাউ শব্দে চ্যাঁচাতে শুরু করত পোকন। একদিন তা থেকেই—

বল্টুদা একটু থামল : হ্যাঁরে প্যালা, কী যেন ব্যথা-টাথা থেকেই প্রথম কবিতা গজিয়েছিল না ? মানে ক্রৌঞ্চ নামে একজন ব্যাধ, বাল্মীকি নামে একটা পাখিকে—

আমি বললুম : দ্যুৎ, যা-তা বলছে !

—অ, তাহলে বোধহয় বাল্মীকি বলে একজন ক্রৌঞ্চ, নিষাদ বলে কাকে মেরে ফেলেছিল—

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, কী আবোল-তাবোল বকছ বল্টুদা ! মহাকবি বাল্মীকির কবিত্বলাভ কী করে হলো, তাও তুমি ভুলে গেলে ?

—থাম, তোকে আর শেখাতে হবে না। মানে—খুব একটা কান্নাকাটির ব্যাপার থেকে কবিতা জন্মেছিল—এই তো ? পোকনেরও তাই হলো। দাঁতের ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ বলে বসল :

হায় মোর একি দন্তশূল
যেন শত বোল্‌তার হুল
প্রাণ মোর করিল নির্মূল—
বুঝিলাম বিধি প্রতিকূল !

মাসীমা পোকা-খাওয়া দাঁতের গোড়ায় কী যেন একটা পেস্ট করে দিচ্ছিলেন। পোকনের কবিতা শুনে তিনি তো চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন : দাঁতের ব্যথায় পোকন বুঝি পাগল হয়ে গেল !

শুনে পোকন বললে :

পাগল ? কে কয় মোরে ?
অতিশয় যাতনার ঘোরে
সরস্বতী নামিলেন মগজে আমার
ডেকেছে কাব্যের বান, বিশ্ব এবে হবে তোলপাড়।

তারপর কী যে হলো সে তো বুঝতেই পারছিস। প্রথমটা মেসোমশাই ভেবেছিলেন, পোকন বুঝি মায়ের সঙ্গে ফাজলেমি করছে। তিনি এসেই পোকনের কান বরাবর এক রামচাঁটি তুললেন। তাতে পোকন বলে বসল :

মেরো না মেরো না পিতা মোর গালে চড়,
কাব্যদেবী কাঁদিবেন করে ধড়ফড়।

শুনে মেসোমশাই হাঁ করে রইলেন কিছুক্ষণ। এ তো ঠিক ইয়ারকির মতো শোনাচ্ছে না। গড়গড়িয়ে কবিতা বলে যাচ্ছে, তাতে ছন্দ আছে, মিলও আছে যে ! কী সর্বনাশ !

নির্ঘাত ভূতেই ধরেছে। আর ভূতে পেলে কে না জানে—মানুষের অসাধ্য আর কিছু থাকে না, এমন কি অখাদ্যও না !

রোজার জুতো-টুতো পর্যন্ত মুখে নিয়ে নাকি হামাগুড়ি দেয়।

কাজেই ডাকো রোজা ! লাগাও ঝাড়ফুঁক।

ঝাঁটা-সরষে এসব নিয়ে রোজা এসে হাজির। তাকে দেখেই পোকন বলে উঠল :

কাহারে মারিবে ঝাঁটা তুমি ভাই, সরিষা মারিবে কারে ?
ভূত নয় ভাই, সরস্বতী যে চেপেছেন মোর ঘাড়ে।
ঝাঁটা নিয়ে তুমি চলে যাও সখা, সরিষা বাটিয়া খাও,
ওঝাগিরি আর ফলিয়ো না হেথা, আমারে রেহাই দাও !

রোজার হাত থেকে ঝাঁটা-ফাঁটা সব পড়ে গেল। তার মুখের চেহারা দেখে মনে হলো, এক্ষুণি সে কেঁদে ফেলবে। তারপর দুম করে পোকনকে একটা পেন্নাম করলে, আর হাতজোড় করে মেসোমশাইকে বললে—আমাকে রেহাই দিন মশাই, এ আমার কম্ম নয়, ভূত-পেতনী নয়, আরো জবর কিছু চড়াও হয়েছেন এনার ওপর। কোনো রোজার সাধ্যি নেই তাকে নড়ায়। সরষে কেনার চার গণ্ডা পয়সা আমাকে দিয়ে দিন, আমি সরে পড়ি।

শুনে আমি বললুম, তাহলে সরস্বতীই ওর ঘাড়ে চাপলেন ?

বল্টুদা বললে, বয়ে গেছে সরস্বতীর, তাঁর তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই ! আরে, মা সরস্বতী এলে কি আর এসব যা-তা কবিতা বেরুত ? তাহলে তো কালিদাসের মেঘদূত বধ আর মাইকেলের কী বলে—কী বই লিখেছিলেন রে মাইকেল ? গীতাঞ্জলি না ব্যাকরণ কৌমুদী ?

—তোমার মুণ্ডু !

অন্যমনস্কভাবে একটা নিমফল তুলে নিয়ে চিবিয়ে ফেলল বল্টুদা। একবার চিবুতেই মুখটাকে কী রকম খাস্তা কচুরির মতো করে, থু-থু করে সেটা ফেলে দিলে। বললে, মরুক গে, সরস্বতী দয়া করলে ও একটা মেঘনাদ-কৌমুদী কিংবা গীতাঞ্জলি বধ-টধ কিছু লিখত। তা নয়,

www.boiRboi.blogspot.com

সমানে এইসব আবোলতাবোল ছড়া কাটতে লাগল। এই মনে কর—মাসীমা বঁটি পেতে বসে ওল কাটছেন, পোকন অমনি বলে উঠল :

জননী গো, কাটিয়ো না ওল,
হাত যদি করে চিড়বিড়
প্রাণ তব হইবে অস্থির
লেগে যাবে ঘোর গণ্ডগোল।

শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিলে। যদি নিতান্তই কবি হওয়া পোকনের কপালে থাকে, তাহলে খণ্ডাবে কে! তাও আবার সব সময় কবিত্ব ওর মগজে চাগিয়ে উঠত না। দাঁতের ব্যথা শুরু হলেই পোকন আর কান্নাকাটি করে না—তার বদলে কবিতা ছুটতে থাকে ওর মুখ দিয়ে :

আজ যে হইল কবিতার বেগ—হবে তাহা দুর্দমনীয়!

দাঁতের ব্যথা যখন নেই, তখন কিন্তু পোকন বেশ আছে। তোর আমার মতো খাচ্ছে-দাচ্ছে, কাঁসি বাজাচ্ছে, পড়া না পেরে ক্লাসে নীল-ডাউন হচ্ছে, ফুটবল খেলতে গিয়ে গোবরে আছাড় খাচ্ছে— মানে, একদম স্বাভাবিক। কিন্তু যেই একবার দাঁতে কনকনানি আরম্ভ হলো, অমনি হা-রে-রে-রে করে ছুটে বেরুল ওর কবিতা। একেবারে দুর্দমনীয়!

সবাই জিজ্ঞেস করত : দাঁতের ব্যাথা হলে তুই কবিতা বানাস কী করে?

পোকন বলত : আমি জানি না। কেমন যেন পেটের ভেতর থেকে আপনিই ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

—দাঁতের ব্যথা নিয়ে বকবক করতে তোর ভালো লাগে?

—ভালোমন্দ জানি না। কবিতা না আউড়ে আমি থাকতেই পারি না।

এমনি চলছিল, হয়তো পোকন বড়ো হয়ে দুর্দান্ত কবি হতো। দন্তশূল আরো আরো বাড়ত, আর তার ঠেলায় কী বলে ওই যে, নভেল প্রাইজ না উপন্যাস প্রাইজ কী একটা আছে, টপাস করে সেটাও পেয়ে যেতে পারত একদিন। সব হতো, যদি না একদিন ছোটমামা শুক্তিগাছায় আসতেন।

আমার ছোটমামা মানে পোকনেরও ছোটমামা—মানে মাসীমা তো আমারই মায়ের বোন কিনা! ছোটমামা আবার কড়া লোক, তায় দাঁতের ডাক্তার। এদিকে তো ছোটমামাকে আসতে দেখে পোকন বেশ হাসি-হাসি মুখে সামনে এসেছে, হয়ত ভেবেছে নিশ্চয় ভালো খাবার-দাবার আছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পোকনের সেই হাসি-হাসি দাঁতের দিকে একবার তাকিয়েই ছোটমামা আর্তনাদ করে উঠলেন : হরিবোল—হরিবোল!

আমি বললুম, হরিবোল কেন? বোধ হয় হরিবল্? মানে—কী ভয়ানক?

বন্টুদা বললে, তা হতে পারে। তবে পোকাধরা সে-সব নীলচে-নীলচে কালো-কালো নোংরা দাঁত দেখলে শুধু হরি নয়, কালী-দুর্গা-ছিন্নমস্তা-বাবা বৈদ্যনাথ, সকলকে মনে পড়ে যায়। তারপর ছোটমামা কী করলেন, জানিস? বাক্সে সব যন্তর-টন্তর তাঁর ছিলই, পোকনকে সন্দেশ খাওয়ানো দূরে থাক, পরদিনই তাকে একটা টেবিলের ওপর চিত করে ফেলে কটাংকটাং করে তিনটে পোকা-দাঁত উপড়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তারপর?

তারপর আর কী? সর্বনাশ হয়ে গেল পোকনের। দাঁতও গেল, কবিত্বও গেল। দাঁতে আর ব্যথা হয় না, কবিতাও আর গজগজিয়ে বেরিয়ে আসে না। এমন কি মাসীমা যখন সামনে বঁটি ফেলে কচকচ করে চালকুমড়ো, মানকচু কিংবা পালং শাক কাটতে থাকেন, তখনো পোকন

চুপ। এতদিন যে ঝিঁঝি-পোকার মতন ঝিঁ ঝিঁ করত, সে এখন শুঁয়োপোকার মতো নীরব।

মেসোমশাই যে কী খুশী হলেন প্যালা, সে আর তোকে কী বলব। ছোটমামাকে, মানে নিজের ছোট শালাকে—খুব ভালো একটা সুট্ বানিয়ে দিলেন। আর বাড়িতে তিন দিন ঘটা করে হরির লুট হলো। তোকে তো আগেই বলেছি, কবিতার ওপরে হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন মেসোমশাই।

কিন্তু জানিস তো, ভগবান আছেন। আর ভগবানই বা বলব কেন, সেই যে যিনি পোকনের ঘাড়ে চড়াও হয়েছিলেন আর ছোটমামার পাল্লায় পড়ে নেমে গেলেন? তিনিও তো ছিলেনই।

তার ফলে এই হলো যে, মাসখানেক বাদে একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যেতে যেতে উলটে পড়লেন মেসোমশাই। আর কোথাও কিছু হলো না, কিন্তু দারুণ রকমের চোট পেলেন ডান দিকের হাঁটুতে। কোমরেও খুব লাগল।

হাঁটু ভাঙল-টাঙল না, কোমরের ব্যথাও সারল, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বাত দেখা দিল হাঁটুতে আর কোমরে। জানিস তো—বাতের সঙ্গে কোনো চালাকির বাত্ চলে না—মেসোমশাইয়ের মতো দুঁদে লোকও জব্দ হয়ে গেলেন।

বাতের ব্যথা উঠলে আরো দশজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি নিয়মমাফিক 'উঃ-আঃ কুঁই-কাঁই' করতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন কী যে হলো, ঘর কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি :

একি হেরি অকস্মাৎ
বিনামেঘে বজ্রপাত,
ঘোড়া হতে চিতপাত
কোমরে গজালো বাত
আমারে করিল কাত
আছি খিঁচাইয়া দাঁত—

ব্যাস—শুরু হলো মেসোমশাইয়ের কাব্যচর্চা। দাঁত তোলবার পরে পোকন তো ভালো মানুষের মতো অঙ্ক-টঙ্ক কষতে লাগল, কবিতার ধার দিয়েও আর যায় না, কিন্তু জানিস তো, বাত একবার হলে আর ছাড়ে না? চান্স্ পেয়ে মেসোমশাই সত্যি সত্যিই কবি হয়ে গেলেন। মানে পোকনের মতো লাউ-কুমড়ো-কচু নিয়ে মুখে মুখে পদ্য না বানিয়ে খাতায় কাগজে লিখতে লাগলেন। সেই যে কালিদাস মেঘদূতকে বধ করায় 'বাল্মীকি বাল্মীকি' বলে কাঁদতে কাঁদতে নিষাদ যেমন করে পদ্য বানিয়েছিল, তেমনি করে বাতের চোটে কাত হয়ে মেসোমশাই কবিতা লিখে দিস্তে দিস্তে কাগজ ভরে ফেললেন।

কবিতা লিখলেই ছাপতে হয়। মেসোমশাইও একটা বই ছেপে ফেললেন, নাম দিলেন "এ যে মোর ব্যথার কাকলী"। আর বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে কী ভীষণ ভালো বলতে লাগল! ক্রিটিকেরা সবাই বললে, "রামচরণবাবু সত্যিকারের কবি! যথার্থ বেদনা বোধ করিলেই এইরূপ মহৎ কাব্য লেখা যায়।"

আরে, যথার্থ বেদনা না তো কী! বাতের ব্যথার সঙ্গে চালাকি! যখন ওঠে, তখন টের পাইয়ে দেয় কত ধানে কত চাল হয়।

পোকন তো "নভেল-প্রাইজ" পেলো না, কিন্তু শোনা যাচ্ছে শিগগিরই মেসোমশাই দিল্লী-টিল্লী থেকে কী যেন পুরস্কার পাবেন। তাই আর একখানা বই ছাপা হচ্ছে তাঁর—তার নাম "বাতায়ন"। মানে, জানলা-টানলার কারবার নয়, বাতের ব্যথা থেকে লেখা বলেই বাতায়ন।

সেইজন্যে বলছিলুম প্যালা, ব্যথা থেকেই কবিতার জন্ম হয়। আর কবিতা কী যে মহৎ জিনিস—

www.boiRboi.blogspot.com

বলতে বলতেই একটা নিমফল কুড়িয়ে নিয়ে চিবিয়ে ফেলল বল্টুদা, আর থু-থু করে ফেলে দিলে সেটাকে। বিচ্ছিরি স্বাদে-গন্ধে তার মুখখানা ঠিক মোচাখন্টের মতো হয়ে গেল।

আমি নিমগাছতলা থেকে উঠে পড়লুম। যাওয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলে গেলুম, বসে বসে আরো নিমের ফল চিবোও গোটাকয়েক, তোমারও মুখ দিয়ে গড়গড়িয়ে কবিতা বেরুতে থাকবে।

শয়তানের সাঁকো

একদিকে একটি ভারী সুন্দর শহর, আর একদিকে গ্রাম, মাঠ, বন-জঙ্গল। সব মিলে চমৎকার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, শহরের লোক গাঁয়ে আসতে পারে না—গাঁয়ের লোকের শহরে যাওয়ার জো নেই। মাঝখানে একটা দারুণ বাধা।

কিসের বাধা? মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দুর্দান্ত এক পাহাড়ে নদী। এমন কিছু চওড়া তা নয়, কিন্তু যেমন সে গভীর, তেমনি প্রবল তার স্রোত। জায়গাটা হচ্ছে সুইটজারল্যাণ্ড। একদম পাহাড়ের দেশ—পাথরে পাথরে ঘা দিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঝড়ের বেগে বয়ে চলেছে নদী। তার গর্জন শুনলে কানে তালা ধরে যায়, কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকলে মাথা ঘুরতে থাকে।

সমস্যা হচ্ছে, এই নদীর ওপরে একটা পুল বাঁধা যায় কী করে।

চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। অনেক পরিশ্রম, অনেক খরচ করে, ঢের মাথা খাটিয়ে একটা সাঁকো হয়তো তৈরি করা হলো। একদিন রইল, দু'দিন রইল, তারপরেই—ব্যস! কোত্থেকে নেমে এল ভয়ংকর পাহাড়ী ঢল—হুড়মুড় করে এক ঘায়ে ভেঙে ফেলল সাঁকো, তার ইট-পাথর লোহালক্কড় যে কোন্ চুলোয় ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তার আর পাত্তাই মিলল না।

শেষকালে দেশ-বিদেশের অনেক পণ্ডিত এসে, বিস্তর হিসেব-নিকেশ করে—হাজার হাজার মোহর খরচ করে এক জব্বর সাঁকো তৈরি করলেন। দিন কয়েক সেটা রইলও। তারপর আর কী? আবার পাহাড় থেকে নামল বরফ-গলা জলের ঘূর্ণি—হাজার হাজার বুনো মোষের মতো ডাক ছাড়তে ছাড়তে ছুটে এল, আর অত পরিশ্রম আর খরচের সাঁকোটা, প্রায় চোখের পলকেই উধাও!

দেশের লোক চটে লাল হয়ে গেল। তারা দল বেঁধে, পতাকা-টতাকা নিয়ে শহরের মেয়রের বাড়ির সামনে এসে দারুণ চ্যাঁচামেচি করতে লাগল: 'হয় সাঁকোটা বানিয়ে দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও।' মেয়রের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। গদি না হয় ছেড়েই দেবো, কিন্তু এ কী কাণ্ড! একটা নদীর ওপরে কিছুতেই পুল বাঁধতে পারা গেল না! এ অপমান কখনো সহ্য হয়?

অনেক রাত হয়ে গেছে, সারা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু মেয়রের চোখে আর ঘুম নেই। রাত জেগে ঠায় টেবিলের সামনে বসে আছেন। সামনে কাগজপত্র, তাতে নতুন পুল তৈরির হিসেব! ইস্—এতগুলো টাকা! একেই বলে জলে যাওয়া, জলই নিয়ে গেল!

নদীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল দূর থেকে, মেয়রের মনে হলো—নদীটা তাঁকে ঠাট্টা করছে। রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে মেয়র বললেন, 'এ নদীকে জব্দ করতে পারে—না, ভগবানও নয়, একমাত্র শয়তান। আঃ—শয়তান এসে যদি সাঁকোটা বেঁধে দিত!'

বলবার অপেক্ষামাত্র। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে মেয়রের চাকর এসে ঢুকল।

'হুজুর, শ্রীশয়তান এসেছেন দেখা করতে।'

মেয়র ভয়ানক চমকে বললেন, 'কে এসেছে?'

'নাম বললেন—শ্রীশয়তান।'

শয়তান! মাঝ রাত্তিরের এই থমথমে নির্জনতায় একবারের জন্যে মেয়রের হাত-পা ভয়ে হিম হয়ে গেল। পরক্ষণেই হিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও ভেতরে।'

চাকর চলে গেল এবং শয়তান এসে ঢুকল ঘরে। চেহারা দেখে মনে হয়, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো বয়েস হবে। উঁচু চোয়াল, থুতনিতে ছাগল-দাড়ি, লম্বা মুখ, বাজপাখির ঠোঁটের মতো নাক; কোটরের ভেতরে চোখ দুটো দু'টুকরো আংরার মতো জ্বলছে। অনেকটা জার্মানদের মতো তার পোশাক, পরনে লাল টকটকে প্যাণ্টুলুন, গায়ে একটা লম্বা কালো কোট—আগুনরঙা তার উঁচু কলার। সার্কাসের ক্লাউনরা যেমন পরে—তেমনি একটা চুড়োওলা কালো টুপি তার মাথায়—তার ওপরে রক্তলাল একটা পাখির পালক থেকে থেকে দুলে উঠছে। পায়ে তার দুটো গোল গোল জুতো—শয়তানের পায়ের পাতা ছাগলের মতো বলে সে অন্য জুতো পরতে পারে না।

মেয়র কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন শয়তানের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, বেশ খাতির করে, শয়তানকে সামনের চেয়ারটাতে বসালেন।

'তারপর বন্ধু'—একটু মিটমিট করে হেসে, মিঠে গলায় শয়তান বললে, 'শেষ পর্যন্ত বুঝি আমাকেই দরকার পড়ল তোমাদের?'

মেয়র খুব বিনীত হয়ে বললেন, 'আপনি না হলে আমাদের তো আর গতি দেখছি না।'

'ওই হতচ্ছাড়া পুলটার জন্যে—তাই না?'

'আজ্ঞে, আপনি তো অন্তর্যামী, সবই জানেন।'

'পুলটা বুঝি খুবই দরকার?'

'আজ্ঞে নইলে যে আমরা নদী পার হতে পারছি না কিছুতেই।'

শয়তান বললে, 'হুম।'

একটু চুপ করে থেকে, হাত কচলে মেয়র বললেন, 'তা দেখুন শয়তান মশাই, আপনি তো অতি মহৎ, দয়া করে ওই সাঁকোটা যদি আমাদের তৈরি করে দিতেন—'

মুচকি হেসে শয়তান বললে, 'আমিও ওই প্রস্তাব নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।'

'তা হলে কি ভাবে কাজটা—'

'পারিশ্রমিক পেলেই করে দেবো।'—শয়তান তার জ্বলন্ত চোখ দুটো মেলে মেয়রের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে শয়তানী দুর্বুদ্ধি ঠিকরে পড়ছিল।

মেয়র একটু কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, 'সে তো বটেই—সে তো বটেই। পারিশ্রমিক তো দিতেই হবে।'

চেয়ারে নড়ে-চড়ে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, শয়তান বললে, 'আমি যেরকম পুল তৈরি করে দেবো, তা হবে সবার সেরা। এমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি।'

'তাতে আমারও কোনো সন্দেহ নেই—' মাথা নেড়ে জবাব দিলেন মেয়র। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'এর আগের সাঁকোটা তৈরি করতে আমাদের ছ'হাজার মোহর খরচ হয়েছিল। আমরা এবার তার দ্বিগুণ পর্যন্ত খরচা করতে পারি। কিন্তু তার বেশী আপনাকে আমরা দিতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারব না।'

'মোহর—সোনা!'—শয়তান হেসে উঠল : 'তোমাদের সোনা দিয়ে আমি কী করব? আমি তো যত ইচ্ছে ও-সব তৈরী করতে পারি। দেখবে?'

ঘরের ভেতরে ফায়ার-প্লেসে ঝাঁ-ঝাঁ করে আগুন জ্বলছিল। টক করে উঠে পড়ল শয়তান, তারপর ফায়ার-প্লেসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গনগনে রাঙা একটা কয়লা তুলে নিলে। যেন রুটির দোকান থেকে একখানা কেক তুলে নিয়েছে—ভাবখানা এই রকম।

সেইটে মুঠো করে এনে সে মেয়রকে বললে, 'হাত পাতো।'

মেয়র উসখুস করতে লাগলেন।

শয়তান বললে, 'কিচ্ছু ভয় নেই, হাত পাতোই না!'

অগত্যা মেয়র হাত পাতলেন।

কিন্তু একি! শয়তান তাঁর হাতে যা দিলে—সে তো জ্বলন্ত কাঠকয়লা নয়। সেটা যে মস্ত একটা খাঁটী সোনা—! আর কী কনকনে ঠাণ্ডা সেটা! যেন এই মুহূর্তে সেটাকে খনি থেকে তুলে এনেছে কেউ।

খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে থেকে মেয়র সেটা নেড়ে-চেড়ে উলটে-পালটে দেখলেন। তারপর ফিরিয়ে দিতে গেলেন শয়তানকে।

'আরে না-না'—পায়ের ওপর পা তুলে, আবার জাঁকিয়ে বসে শয়তান বললে, 'ওটা আর তোমায় ফেরত দিতে হবে না। ও আমি তোমাকে উপহার দিলুম।'

মেয়র সোনার তালটা নিজের ব্যাগে পুরে বললেন, 'তা হলে সোনা যখন আপনি নেবেন না, তখন অন্য কোনোভাবে আপনাকে পারিশ্রমিকটা দিতে হবে। কিন্তু সেটা যে কী, আমি তো তা বুঝতে পারছি না। আপনি অনুগ্রহ করে বাতলে দিন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল শয়তান। পরক্ষণেই কুটিলতায় ভরে উঠল তার জ্বলন্ত চোখ দুটো।

শয়তান বললে, 'আমার পারিশ্রমিক আর কিছুই নয়। পুল তৈরী হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে ওটা পার হবে, তার আত্মাটাকে আমি নেব।'

শোনবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়র শিউরে উঠলেন। শয়তান আত্মা নিয়ে যাবে! তার অর্থ যে কী সাংঘাতিক, সে তো মেয়রের জানতে বাকী নেই। যে আত্মাকে শয়তান একবার অধিকার করবে, তার আর কখনোই নিষ্কৃতি মিলবে না। অনন্তকাল ধরে তাকে নরকের অন্ধকারে ঘুরতে হবে, শয়তানের দাসত্ব করতে হবে, শয়তানের যত বীভৎস পাপের কাজ—তাতেও তার অংশ নিতে হবে। চিরকালের মতো অভিশপ্ত হয়ে যাবে সে।

মেয়র চুপ করে রইলেন। অধৈর্য হয়ে শয়তান বললে, "কী ভাবছ! উত্তর দিচ্ছ না যে! রাজী?'

একটু পরে মেয়র বললেন, 'রাজী।'

শয়তান বললে, 'তা হলে কাগজ-কলম বের করো। ভদ্রলোকের মতো চুক্তিপত্র তৈরি করে ফেলা যাক একটা।'

কাগজ-কমল নিয়ে মেয়র বললেন, 'চুক্তিপত্রে কী লিখতে হবে, আপনিই বলুন।'

শয়তান বলে গেল, মেয়র লিখে নিলেন। চুক্তি হলো এই : আজ রাত ভোর হওয়ার আগেই শয়তান ওই দুর্ধর্ষ দুরন্ত নদীটার ওপর দিয়ে একটা সাঁকো তৈরি করে দেবে। সে সাঁকো যেমন সুন্দর হবে—তেমনি শক্তও হবে, আর পুরো পাঁচশো বছর সেটা অক্ষয়-অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে, সর্বপ্রথমে এই সাঁকোটা যে পার হয়ে যাবে, তার আত্মার ওপর কায়েম হবে শয়তানের অধিকার। সে ভুল করেই যাক আর ইচ্ছে করেই পার হোক, শয়তানের কাছ থেকে তার আর পরিত্রাণ নেই।

চুক্তিপত্র লেখা হলো, দুটো নকলও করা হলো তার। যেমন নিয়ম, মেয়র সমস্ত শহরের পক্ষ থেকে সেই দুটোতে সই করলেন, শয়তানও গোটা গোটা করে নিজের নাম সই করে দিলে। তারপর একটা নকল নিলেন মেয়র, আর একটা নিয়ে শয়তান তার ঝোলা কালো কোটের পকেটে ভাঁজ করে পুরে ফেলল।

উঠে দাঁড়িয়ে, এক গাল হেসে শয়তান বললেন, 'তা হলে কথা পাকা। কাল ভোরেই দেখবে তোমার সাঁকো তৈরী হয়ে গেছে।'

বলেই খুট খুট করে গোল গোল জুতোর আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

রাতে মেয়রের আর ঘুম হলো না। পরদিন খুব ভোরে, শহরের জনপ্রাণীটিও জেগে ওঠবার আগেই, কাঁধে একটা মুখ-বন্ধ মস্ত ঝোলা নিয়ে তিনি নদীর ধারে গিয়ে হাজির হলেন।

শয়তানের যে-কথা সেই কাজ! মেয়র দেখলেন, অতি চমৎকার, দারুণ পাকাপোক্ত এক পুল নদীর ওপর দিয়ে তৈরী হয়ে রয়েছে। আর পুলের ওপারে, ভোরের ঝাপসা আলোয় একটা পাথরের ওপরে বাঘের মতো ঘাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান। সে হতভাগা না জেনে সকলের আগে এই সাঁকোটা পার হবে—তার আত্মাটাকে অমনি সে খপাৎ করে কেড়ে নেবে। তার পারিশ্রমিক।

মেয়রকে সাঁকোর মাথায় দাঁড়াতে দেখে শয়তান হাঁক দিয়ে বললে, 'দেখছ তো, আমি কি রকম কথার লোক!'

'আমিও কথার লোক'—মেয়র জবাব দিলেন।

শুনে, শয়তানের ধোঁকা লাগল।

'সে কি! তুমি নিজেই প্রথম সাঁকো পেরিয়ে আমার খপ্পরে পড়তে চাও নাকি? এত বড়ো আত্মত্যাগ?'

'আত্মত্যাগের নিকুচি করেছে। আমাকে কি তুমি এমন গর্দভ ভেবেছ?'—বলেই মেয়র কাঁধের মস্ত ঝোলাটা নামিয়ে খুলতে আরম্ভ করলেন।

শয়তান বললে, 'ওটা কী হচ্ছে?'

উত্তরে মেয়র বললেন, 'ভু-উ-উ—ভৌ-ঔ-ঔ—'

শয়তান অবাক্ হয়ে বললে, 'তার মানে?'

মেয়র বললেন, 'তার মানে ভৌ-ঔ-ঔ—'

'অ্যাঁ!'

বলতে বলতেই মেয়র থলেটা খুলে ফেললেন। আর তার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা বদমেজাজী রাস্তার নেড়ী কুকুর—সেটার ল্যাজে আবার ভাঙা একটা সস্‌প্যান বাঁধা রয়েছে। থলে থেকে ছাড়ান পেতেই সেটা সাঁকো পেরিয়ে ভোঁ-দৌড়!

মেয়র বললেন, 'নাও হে শয়তানদা—তোমার আত্মা নিয়ে যাও। এই কুকুরটাই তো প্রথম সাঁকো পার হয়েছে।'

শয়তান বললে, 'বা-রে, তা কী করে হয়! কুকুরের আত্মা দিয়ে কোন্ ঘোড়ার ডিম হবে? আমি তো মানুষের আত্মার কথা বলেছিলুম।'

মেয়র বললেন, 'বার করো চুক্তিপত্র। তাতে কেবল আত্মা লেখা আছে। মানুষ, কুকুর, গোরু, ছাগল—কিছুই আলাদা করে বলা নেই। অতএব, তোমার পারিশ্রমিক তুমি পেয়ে গেলে। এবার আনন্দে নাচতে নাচতে নরকে চলে যাও!

রেগে আগুন হলো শয়তান। তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা বোকা বানিয়েছে তো তাকে! সে হলো মূর্তিমান শয়তান, তার মগজে যত কুবুদ্ধির কারখানা, আর লোকটা এমন করে তাকেই বেকুব করে দিলে!

www.boiRboi.blogspot.com

'পুলটাই ভেঙে ফেলব'—শয়তান ভাবল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করে সে সাঁকোর এক টুকরো নুড়িও নড়াতে পারল না। চুক্তি অনুসারে সেটা পাঁচশো বছরের মতো অটল হয়ে আছে—বজ্রের মতন তার গাঁথুনি। খেপে গিয়ে শয়তান একটা হাজার মন পাথর ছুঁড়ে মারল সাঁকোর ওপর। সাঁকোয় টোলটি পর্যন্ত খেলো না, তার বদলে পাথরটাই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে গেল নদীর জলে।

দাঁত কিড়মিড় করে শয়তান বললে, 'তা হলে ওই বজ্জাত মেয়রটাকেই মেরে ফেলি।' আর বলেই যেই মেয়রের মাথা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে যাচ্ছে, অমনি মেয়র বললেন, 'লে ভোলা—ছু-ছু-ছু'—

বস্তার মধ্যে আটকে থেকে নেড়ী কুকুর চটেই ছিল, আর বলতে হলো না। তার ওপরে ল্যাজে ভাঙা সসপ্যান বাঁধা থাকায় তার মেজাজ আরো খারাপ। আর শয়তানের বিতিকিচ্ছিরি চেহারাও তার ভালো লাগেনি। সেও 'ঘোঁ-ঘঁক্'—বলে শয়তানকে তাড়া করল।

'বাপ্-রে—মা-রে'—বলে শয়তান দে দৌড়!

কিন্তু নেড়ী কুকুর কি তাকে ছাড়ে? 'ঘোঁ—ঘঁক্—ঘঁক্' করে সমানে ছুটে চলল তার পেছনে!

মেয়র আনন্দে নাচতে শুরু করে দিলেন, কিন্তু কোটের পকেট থেকে ধোঁয়া বেরুতে আর গায়ে গরম ছ্যাঁকা লাগতে নাচ বন্ধ হয়ে গেল। হুড়মুড় করে কোটটা ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। বাপ্স্—একটুর জন্যে প্রাণ বেঁচে গেছে। পকেটে শয়তানের সেই সোনার তাল কখন আবার জ্বলন্ত কয়লা হয়ে গিয়ে জামায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাঁর।

ওদিকে শয়তান সেই যে ছুটে পালালো, আর কোনোদিন তার টিকিও দেখা গেল না। নেড়ী কুকুরটা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিনা কে জানে! চুক্তিমতে কুকুরের আত্মা তো অনন্তকালের জন্যে তার সঙ্গী।

আর সেই সাঁকোটা? দুরন্ত নদীটার বুকের ওপর সে পাঁচ শো বছরের জন্যে অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘোড়ামামার কাটলেট

ঘোড়া মামা বললেন, 'এই যে পেলারাম, কী বেপার?'

ঘোড়া মামা মোটেই ঘোড়া নন, কিংবা কারুর মামাও নন। মুখে বড়ো বড়ো দাড়ি, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, একটা থলে কাঁধে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অভ্যেস। হঠাৎ তাঁকে দেখে কাগজ কুড়ুনে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কাগজ তিনি কুড়োন না। ঘোড়া মামার ধারণা, লোকে না বুঝে রাস্তায় অনেক কাজের জিনিস ফেলে দেয়, সেগুলো কুড়িয়ে রাখলে তা দিয়ে কত কী যে হতে পারে তা বলে বোঝানো যায় না। এই ধরো, একদিন ঘোড়া মামা জুতোর

একটা শুকতলা পেলেন; একমাস বাদে হয়তো খানিক চামড়া পাবেন; আরো ছ'মাস বাদে একটা সোল পেয়ে যেতে পারেন। এগুলো একসঙ্গে সেলাই করে নিলেই একপাটি জুতো বিনে পয়সায় তৈরি হয়ে গেল। এইভাবে আর এক বছর খুঁজে বেড়ালে হয়তো আর এক পাটিরও জোগাড় হয়ে যাবে। তখন একেবারে ফ্রীতে একজোড়া জুতো—আর আজকাল জুতোর যা দাম!

এ থেকে যদি ভেবে থাকো যে ঘোড়া মামার অবস্থা খারাপ, তা হলে ভুল করেছো। ঘোড়া মামা মোটেই গরীব নন। তাঁর নিজের বাড়ী আছে, একতলা দোতলায় ভাড়াটে আছে, তারকেশ্বরে নিজেদের দেশে অনেক জমিজমা আছে। আসলে স্বভাবই এই। তাঁর বাড়ীর তেতলার ঘরে উঠলেই দেখবে—দেশলাইয়ের খাপ, খালি সিগারেটের বাক্স, ছেঁড়া রিবনের টুকরো, খালি কৌটো থেকে শুরু করে ফেলে-দেওয়া তোবড়ানো সাইন বোর্ড পর্যন্ত জমানো রয়েছে। একটা সাইন বোর্ডে লেখা আছে: 'এখানে উত্তম চিঁড়া পাওয়া যায়', আর একটাতে লেখা আছে: 'পাগলের মহৌষধ'। শেষটা ঘোড়া মামাকে খাওয়াতে পারলে ভালো হতো—কিন্তু সেটা কোথায় পাওয়া যাবে আমাদের জানা নেই।

ঘোড়া মামার জিভে একটু দোষ আছে। প্যালারামকে বলেন 'পেলারাম', ব্যাপারকে 'বেপার', চ্যাঁচানোকে 'চিঁচানো'—এই রকম। তাই আমাকে বললেন, 'এই যে পেলারাম, কী বেপার?'

দাড়ির ফাঁকে ঘোড়া মামার গোটা কুড়িক দাঁত বেরিয়ে এল। আর তাই দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার। ঘোড়া মামার পাল্লায় পড়ে দু-দুবার আমার হাড়ির হাল হয়েছে।

বললুম, 'ব্যাপার আর কী ঘো—' বলেই সামলে নিলুম, 'মানে মামা, আমি ক্যাবলার জন্যে ওয়েট করছি এখানে।'

'কেবলা? ও মিত্তিরদের কেবলা? কেনো?'

'ও আমাকে কাটলেট খাওয়াবে বলেছে।'

'তা—কেট্‌লেট্।'—ঘোড়া মামার আবার দাড়ির ফাঁকে দন্তশোভা বিকাশ করলেন: 'তা বেশ তো, চলো না আমার সঙ্গে। আমিই তোমায় কেট্‌লেট্ খাওয়াব।'

আমি বললুম, 'সরি ঘো—মানে মামা, একবার আপনি আমাকে ক্ষীরমোহন, চমচম, ছানার জিলিপি এইসব খাওয়াবেন বলে পটলডাঙা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত হাঁটিয়েছেন, তারপর ল্যাজে দড়ি বাঁধা একটা নেংটি ইঁদুর ধরিয়ে দিয়ে—'

'কেনো—কী অন্যায় হয়েছে? সেই ইঁদুর বাড়ীতে নিয়ে গেলে তোমার বাবা বিড়েল আনতেন—' ঘোড়া মামা বলে যেতে লাগলেন: 'সেই বিড়েলকে দুধ খাওয়াবার জন্যে তোমার বাবা গোরু পুষতেন, সেই গোরুর দুধ থেকে ক্ষীরমোহন, ছেনার জিলিপি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'খুব হয়েছে, আর আমার দরকার নেই। সেই নেংটি ইঁদুর নিয়ে বাড়ী গেলে বড়দা আমাকে একটা বিরাশী সিক্কার চড় বসাতো, তারপর ইঁদুরটাকে টেনে একেবারে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ফেলে দিত। ক্ষীরমোহন, ছানার জিলিপি—হুঁ! যত সব বোগাস। মাঝখান থেকে রবিবারের সকালে আমাকে পাক্কা দেড় মাইল হাঁটালেন আপনি।'

'আহা পেলারাম, তুমি বুঝতে পারছ না। সব কাজ প্লেন করে (মানে প্ল্যান করে) করতে হয়। চমচম, ক্ষীরমোহন ঝাঁ করে খেলেই হলো? একটা এরেন্‌জমেন্ট করতে হয় না? আজ তুমি চলো আমার সঙ্গে, নিশ্চয় তোমার কেট্‌লেট খাওয়াব।'

'আবার হয় হাওড়া ব্রিজ, নয় শ্যামবাজার পর্যন্ত হাঁটাবেন তো! আর আপনার সঙ্গে সঙ্গে জুতোর সুকতলা, রাংতা, ঘুড়ির কাগজ, রাস্তার পেরেক, এই সব কুড়োতে হবে? শেষে একতাল গোবর আমার হাতে তুলে দিয়ে বলবেন—এই গোবর থেকে ঘুঁটে হবে, ঘুঁটে দিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

উনুন ধরানো হবে, উনুন ধরালে কড়াই চাপবে, কড়াই চাপলে তোমার মা কাটলেট ভাজবেন—চালাকি ! ঘো—সরি মামা, ও-সবের মধ্যে আমি আর নেই।'

'তুমি মিথ্যে এফরেড হচ্ছ পেলারাম।'—ঘোড়া মামা মনে ভীষণ ব্যথা পেলেন : 'আজ তোমায় কোথাও যেতে হবে না, কিচ্ছু কুড়োতে হবে না। আমার বাড়ীতে গেলেই তোমার কেটলেটের ব্যবস্থা হবে। তোমার কেবলা তো এল না—টিচামিচি না করে আমার সঙ্গেই তুমি চলো।'

ক্যাবলা যে আসবে না, সে তো বুঝতেই পারছি। বর্ধমান থেকে ওর ছোট মামা এসেছে শুনেছি, আর যুদ্ধের ফিলিম দেখানো হচ্ছে—নিশ্চয় ক্যাবলা মামার সঙ্গে সেই ফিলিম দেখতে গেছে। টেনিদা কলকাতায় নেই, বেড়াতে গেছে গোবরডাঙায় পিসিমার বাড়ীতে, হাবুল সেন সেই যে পরশু থেকে বালীগঞ্জে বড়দির বাড়ী গিয়ে বসে রয়েছে—এখনো, ফেরবার নাম করছে না। পুজোর ছুটির দিনগুলোতে ভারী একা পড়ে গেছি আমি।

'চলো হে পেলারাম, রাস্তায় দেঁড়িয়ে হাঁ করে থেকে আর কী করবে ?'—ঘোড়া মামা আবার ডাকলেন। ভাবলুম, এস্‌পার ওস্‌পার যা হোক একটা হয়েই যাক। বলা তো যায় না—জুটেও যেতে পারে একটা কাটলেট—চান্‌স নিয়ে দেখাই যাক না ! আজ তো আর রাস্তায় রাস্তায় কুড়িয়ে বেড়াতে হবে না, ভয় কিসের ?

ঘোড়া মামার সঙ্গেই গেলুম।

একতলা-দোতলায় ভাড়াটে, ঘোড়া মামা তেতলায় একটা ঘর আর এক টুকরো বারান্দা নিয়ে থাকেন। সেই ঘরের দিকে তাকিয়েই আমার প্রায় দমবন্ধ হয়ে এল।

কী নেই সেখানে ?

সারা কলকাতার যত ফেলে-দেওয়া—যত কাগজের বাক্স, কাঠের টুকরো, ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতের বুরুশ, ছেঁড়া জুতো, মরচে-পড়া পেরেক, 'এখানে উৎকৃষ্ট চিঁড়া পাওয়া যায়', 'পাগলের মহৌষধ'—কিছুই আর বাকী নেই ; আর স্তূপাকার কাগজের টুকরো তো আছেই, যত কাগজ-কুড়ুনের অন্ন মেরে দিয়েছেন ঘোড়া মামা। তাকিয়েই সমস্ত মনটা আঁতকে উঠল—যেন সারা গায়ে একজিমা কুটকুট করছে, এই রকম বোধ হলো আমার।

বললুম, 'ঘোড়া—'

'ঘোড়া ? ঘোড়া কী ?'

জিভ কেটে বললুম, 'সরি, মামা ! আমি বলছিলুম কি মামা, আপনার ওই ঘরে বসে কাটলেট খাওয়া চলবে না। ঘরটা—কী বলে ইয়ে, বিষম নোংরা !'

'নোংরা !'—ঘোড়া মামা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন : 'তুমি কী বলছ হে পেলারাম ! ওই ঘরে যা জিনিস আছে তা দিয়ে আমি দেড় পাটি জুতো বানাতে পারি, ছ'টা ঘুড়ি তৈরি করতে পারি, টিনের কৌটোয় হাতল লাগিয়ে পাঁচটা মগ বানাতে পারি—'

আমি বললুম, 'থাক, থাক। জুতো, ঘুড়ি কিংবা টিনের মগে আমার দরকার নেই। আমি জানতে চাই—কাটলেট কোথায় ! আর সেটা আপনার ওই ঘরেই আছে কিনা—মানে রাস্তা থেকে পচা-টচা একটা কুড়িয়ে এনেছেন কিনা।'

'পোচা ? রাস্তার পোচা কেটলেট !'—ঘোড়া মামা যেন ভীষণ ব্যথা পেলেন আবার : 'তুমি কি আমায় এতই ছোটলোক ভাব্‌লে পেলারাম ! তোমার জন্যে কেটলেট আসবে পাড়ার "দি গ্রেট আবার খাবো" রেস্টুরেন্ট থেকে—গরম গরম—প্রাণকাড়া—'

শুনতে শুনতে আমার রোমাঞ্চ হলো—চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে গেল "দি গ্রেট আবার খাবো" রেস্তোরাঁর এক জোড়া গরম কাটলেট। এমন যে ঘোড়া মামা—যাঁর গাল ভর্তি ঝাবু দাড়ি আর মুখভর্তি কাঁটাল-বিচির মতো দাঁত, যিনি মাসে একবারও স্নান করেন কিনা সন্দেহ,

দশ হাত দূর থেকেও যাঁর গায়ের চিমসে গন্ধ পাওয়া যায় ; ইচ্ছে করল, দু-হাতে জাপটে ধরি তাঁকে।

বললুম, 'ঘো—আই মীন মামা, আর দেরী কেন তা হলে ? আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না—টাকা দিন, আমি এক্ষুণি দুটো গরম কাটলেট খেয়ে আসব—কথা দিচ্ছি আপনাকে। যাকে বলে, 'ওয়ার্ড অব্ অনার !' ঘোড়া মামা হাসলেন।

'আহা-হা, ব্যস্ত কেন পেলারাম ? এস্‌বে এস্‌বে, কেটলেট এস্‌বে। কিন্তু কেটলেট খাওয়ার জন্যে রেড়ি হতে হবে না ? খেলেই হলো ?'

'রেড়ি ? রেডি আবার কী ?'—আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, 'রেডি তো আমি হয়েই রয়েছি ! কাটলেট খেতে আমি ভীষণ ভালবাসি, ক্যাবলার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দারুণ খিদেও পেয়েছে—পেলেই তক্ষুণি খেয়ে ফেলব—আপনি দেখে নেবেন।'

'আহা, সে তো দেখবই'—ঘোড়া মামা আবার একমুখ দাড়ি নিয়ে হাসলেন : 'তার আগে একটু হাত লাগাও।'

'কিসে হাত লাগাব ?'

'কেটলেটের জন্যে।'

'কাটলেট পেলে তক্ষুণি হাত লাগাব। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই।'

'দেখো, পেলারাম, একটু কোষ্টো করতে হয়, নইলে কি আর কিষ্টো মিলে ? কেটলেটের জন্যেও একটু পরিশ্রম করতে হবে বই কি।'—বলতে বলতে ঘোড়া মামা ঘরের ভেতর থেকে ঘড় ঘড় করে একটা পুরোনো ইজিচেয়ারের ফ্রেম টেনে আনলেন : 'এসো আগে এটাকে মেনেজ করি।'

'এআবার কী ? এটাকে কোথায় পেলেন ?'

'মুখুজ্জেদের বাড়ীর পেছনে—আস্তাকুঁড়ে।'

'আরে রাম রাম !'—আমি নাক সিঁটকে বললুম, 'আপনি যে কী একটা ঘো—আই মীন মামা—যেখান-সেখান থেকে যা-তা কুড়িয়ে আনেন !'

'যা-তা ? যা-তা হলো এটা ? পুরোনো কাঠ, ভারী পোক্ত জিনিস। মুখুজ্জেদের আর কী—বড়লোক, যখন যা খুশি ফেলে দিলেই হলো। কিন্তু এ দিয়ে যখন আমি একটা ফেস্‌টো ক্লেস ইজিচেয়ার বানাব, তখন ওই কোট-পেণ্টুল পরা ছোট মুখুজ্জেও হাঁ করে থাকবে। বুঝবে, কী জিনিস তারা ফেলে দিয়েছে।'

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, 'কিন্তু কাটলেট ?'

'আঃ—কেটলেট কেটলেট করে তুমি যে ক্ষেপে গেলে পেলারাম !' —ঘোড়া মামা ঘর থেকে এবার যতগুলো ভাঙা ছাতার কালো কালো, কাপড়, রাস্তায় কুড়িয়ে-পাওয়া গিঁট-মারা কতটা টোয়াইন সুতো আর দুটো মরচে পড়া চট সেলাইয়ের ছুঁচ বের করে আনলেন : 'এসো—আগে চেয়ারটাকে বেনিয়ে ফেলি। চেয়ার হয়ে গেলেই কেটলেট—বুঝেছ ?'

'বুঝেছি—' গোঁজ হয়ে জবাব দিলুম আমি। অর্থাৎ আমাকে আদর করে কাটলেট খাওয়াবেন, খামোকাই খাওয়াবেন—এমন পাত্তর ঘোড়া মামা নন। তার আগে এই নড়বড়ে একটা বিচ্ছিরি ফ্রেমে এইসব ফুটোফাটা ছাতার কাপড় সেলাই করে, তাঁকে ইজিচেয়ার বানিয়ে দিতে হবে। কাটলেট হলো তারই পারিশ্রমিক !

ঘোড়া মামা বললেন, 'তোমায় বেশী কোষ্টো করতে হবে না। দুটো পেরেক ঠুকতে হবে, একটু সিলাই করতে হবে আমার সঙ্গে—ব্যাস !'

'সেলাই ?'—বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমি কোনোদিন সেলাই করেছি নাকি ? আমি কি দার্জি ?

www.boiRboi.blogspot.com

'আহা—চটো কেনো পেলারাম ! তুমি দর্জি হবে কেনো ? কিন্তু সব কাজ তো শিখতে হয়—যাকে বলে সেলেফ-হেলেপ !—এসো লেগে যাও।'

কী আর করা—জোড়া কাটলেটের আশায় আমি লেগে গেলুম। ঠিক কথা—বিনা খাটনিতে কে আর কাকে খেতে দেয় ! মনে মনে বললুম, 'প্যালারাম—জাগো, রাগো এবং লাগো—তারপরে নিজের শ্রমের অন্ন—অর্থাৎ কিনা কাটলেট—খুশি হয়ে খাও।'

ছেঁড়া ছাতার কাপড়—দু'ভাঁজ করে সেলাই করা—চারটিখানি কথা নাকি ! তার ওপর আবার ঘোড়া মামার গজগজানি।

'আঁ—উঃ কী হচ্ছে ! অমনি করে সিলাই করে নাকি ? ও তো এক্ষুণি খুলে যাবে।'

ঘোঁ-ঘোঁ করে বলুম, 'আমি তো আর দর্জি না।'

'আরে দর্জি না হলে কী হয়—হেলেপ, সেলেফ-হেলেপ ! এই এমনিভাবে পোটাপোট—'

'পোটাপোট' মানে পটাপট সেলাই করতে গিয়ে খুচ করে ছুঁচের ডগা বিঁধে গেল বুড়ো আঙুলে।

'উরেব্বাপ্'—বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

'দেখো একবার কেণ্ডো (মানে, কাণ্ড) ! আমি কি তোমায় আঙুল সেলাই করতে বলেছি নাকি ?' বিরক্ত হয়ে ঘোড়া মামা জানতে চাইলেন।

'এক্সকিউজ মী ঘোড়া—মানে মামা, আমি আর সেলাই করতে পারব না'—বিদ্রোহ করে এবারে আমি বললুম, 'যথেষ্ট খেটেছি, এবার টাকা দিন, কাটলেট খেয়ে আসি।'

'এ্যাঃ,কেটলেট কেটলেট করে এ পাগল হয়ে যাবে দেখছি।'—ঘোড়া মামা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর একটু—এই একটুখানি। তা হলেই কেটলেট রেডি হয়ে যাবে।'

আরো আধ ঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, আরো একবার আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে, সেই অত্যাশ্চর্য ইজিচেয়ার সেলাই শেষ হলো। তখন আমি বেদম হয়ে বসে পড়েছি। আঙুল টনটন করছে, ঘাড় ব্যথা করছে, সারা গা বেয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। সেই অবস্থায় আমি বললুম, 'কাটলেট ?'

ঘোড়া মামা হেসে বললেন, 'হেঁ, কেটলেট। ইজিচেয়ারে বসে কেটলেট খেতে হয়। কিন্তু কেটলেট রাখার জন্যে তো একটা টিবিল চাই। সেই টিবিল বানাতে হবে। পেলারাম, কাল থেকে রাস্তায় আমরা টিবিলের কাঠ খুঁজব। তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে খুঁজবে—কেমোন ? ধরো, এক বছর দেড় বছরের মধ্যে টিবিলের কাঠ হয়ে যাবে। তারপর টিবিল তৈরি হলে—'

আমি ক্ষেপে গিয়ে বললুম, 'থামুন—থামুন। তারপর ভাঙা প্লেটের টুকরো জোগাড় করে করে, পুড়িং জুড়ে ছ' মাস পরে প্লেট তৈরি হবে, ভাঙা কাচ কুড়িয়ে আরো ছ'মাস পরে গ্লাস—'

'হেঁ-হেঁ পেলারাম, মিথ্যে চেঁচাচ্ছ কেন ? কেটলেট খাওয়া কি সোজা বেপার ? ধৈর্য ধরতে হয়, কত এরেনজমেণ্ট করতে হয় তার জন্যে। দু'বছর, তিন বছর, চার বছর—যতদিন বাদেই হোক, কেটলেট তোমায় আমি খাওয়াবই। তবে কিনা তুমিও একটু হেলেপ করবে—বুঝেচো না ? এই বছর দু-তিন আমার সঙ্গে রাস্তায় একটু কুড়বে—ব্যাস, তার পরেই গরমা-গরম কেটলেট। হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ—'

বলে, দিলখোলা হাসি হেসে ঘোড়া মামা সেই ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। এবং—এবং সেই রদ্দিমার্কা ছাতার কাপড়, পুরোনো ফ্রেম, আর আমার অনবদ্য সেলাই !

ফড়-ফড়-ফড়ড়াৎ ! খটাং !

ভাঙা ইজিচেয়ারের ফ্রেমের মধ্যে চার হাত-পা তুলে চেঁচাতে লাগলেন ঘোড়া মামা ঃ 'বেজায় আটকে গিয়েছি পেলারাম—টেনে তোলো—টেনে তোলো—'

এবার আমি স্পষ্ট গলায় বললুম, 'না ঘোড়া মামা, না। টেনে আমি তুলব না। আপনি ওর

মধ্যে হাত-পা ছুঁড়তে থাকুন—ছুঁড়তেই থাকুন। ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক মাস, দু'মাস, তিনমাস পরে আস্তে আস্তে আপনার হাত দুটো ডানা হয়ে যাবে। তারপর আপনি আকাশে ফ্রেমসুদ্ধ উড়তে থাকবেন, উড়তেই থাকবেন, তারপর আরো দু-তিন বছর রোদে-জলে, বৃষ্টিতে পুড়ে—ফ্রেমটা খসে পড়ে যাবে—তখন আপনি ফ্রী ! ইজিচেয়ারের ফ্রেম থেকে বেরুনো কি সোজা কথা ঘোড়া মামা ? কত ধৈর্য ধরতে হয়, কত এরেনজমেণ্ট করতে হয়—কেষ্টো না করলে কি আর কিষ্টো মিলে ?'

এই বলে—এক লাফে, আমি রাস্তায় নেমে পড়লুম।

www.boiRboi.blogspot.com

খাঁড়ামশাই

বংশীবদন খাঁড়ার ছেলে হংসবদন—যার ডাকনাম চিচিঙ্গে—সে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এল।

ঝোলাগুড়ের ব্যবসায়ী বংশীবদন তখন নাকের নীচে চশমা নামিয়ে দু'শো বত্রিশ মণ গুড়ের হিসেব করছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, ক্যা হয়েছে রে চিচিঙ্গে ? অমন করে শেয়ালের বাচ্চার মতো কাঁদছিস কেন ?

শেয়ালের বাচ্চা নিশ্চয় ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদে না, কিন্তু বংশীবদন ও-সব গ্রাহ্য করেন না। আর 'কি'—'কে'—এগুলোকে তিনি 'ক্যা' বলেন।

চিচিঙ্গে বললে, হেড মাস্টার কেলাসে তুলে দেয়নি।

—ক্যা বললি ?

—হেড মাস্টার আমাকে—

ঠাঁই করে বংশীবদন একটি চড় বসিয়ে দিলেন চিচিঙ্গের গালে। বললেন, পাঁটার বাচ্চা কোথাকার ! হেড মাস্টার ! তোর গুরুজন না ? বিদ্যের গুরু। বাপের চুয়েও বড়ো। কেন, মাস্টার মশাই—হেড স্যার এইসব বলতে পারিসনে ? 'তুলে দেয়নি' নয়—তুলে দেননি। মনে থাকবে ?

চড় খেয়ে চিচিঙ্গের কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোঁজ হয়ে, ঘাড় নেড়ে সে জানালো—মনে থাকবে।

বংশীবদন বললেন, কিন্তু ক্যা হয়েছে ? কেন দেননি ওপর কেলাসে তুলে ?

—আমি অঙ্ক আর ভূগোলে পাশ করতে পারিনি। সবাই বলছে, তুই পেসিডেনের ছেলে হয়ে—

বংশীবদন রেগে আগুন হয়ে গেলেন : আমার বাপের নামে ইস্কুল, আমি জমি দিইছি, বাড়ী করে দিইছি—আর আমার ছেলেকেই ফেল করানো ? আচ্ছা, তুই ভেতরে যা—আমি দেখছি।

চিচিঙ্গে ভেতরে চলে গেলে বংশীবদন তক্ষুণি একটা চিঠি লিখলেন হেড মাস্টার শ্রীনাথ

আচার্যিকে। লিখলেন, 'মহাশয়, অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। আর চিচিঙ্গের কেলাসের একখানা ভূগোল আর একখানা অঙ্কের প্রশ্নপত্র সঙ্গে লইয়া আসিবেন।'

হেড মাস্টার আচার্যি মশাই তখন কেবল প্রমোশন দিয়ে, খুব ক্লান্ত হয়ে, নিজের ঘরে বসে হুঁকোয় টান দিয়েছেন। এমন সময় বংশীবদনের লোক ভূষণ মণ্ডল চিঠিটা এনে হাজির করল। বললে, বাবু আপনাকে এক্ষুণি যেতে বলেছেন।

—যাচ্ছি—তটস্থ হয়ে হেড মাস্টার বললেন, তুমি এগোও, আমি আসছি।

ভূষণ চলে গেল। তামাক খাওয়া মাথায় রইল, হুঁকো নামিয়ে হেড মাস্টার ডাকলেন, ওহে বিমল!

বিমলবাবু ইস্কুলের জুনিয়ার টিচার। কিন্তু ছেলেমানুষ হলে কী হয়, যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি চটপটে। খুব ভালো পড়ান। সব কাজেই হেড মাস্টার তাঁর পরামর্শ নেন।

বিমলবাবু আসতেই হেড মাস্টার বললেন, দ্যাখো কাণ্ড। খাঁড়ামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। তখনই তোমায় বললুম, প্রেসিডেন্টের ছেলে—দিয়ে দিই প্রমোশন—কী হবে ঝামেলা করে। কিন্তু তোমার কথায় ওকে আটকে দিলুম, এখন—

বিমলবাবু বললেন, স্যার, স্কুলের একটা নিয়ম তো আছে। প্রেসিডেন্টের ছেলে তো কী হয়েছে, ফেল করলেও প্রমোশন দিতে হবে? তাহলে গরীবের ছেলেরা আর কী দোষ করল—সব্বাইকেই তো পাশ করিয়ে দেওয়া উচিত।

—আরে, উচিত অনুচিত আর মানছে কে! যার টাকা আছে ও-সব তার বেলায় খাটে না। এখন খাঁড়ামশাই যদি খেপে যান, তাহলে আমাদের অবস্থাটা ভাবো! তাঁর টাকায় স্কুল, তিনি প্রেসিডেন্ট। এদিকে সায়েন্স ব্লকের জন্যে সামনের মাসে পনেরো হাজার টাকা দেবেন কথা আছে। এখন যদি বিগড়ে যান, আমরা মারা পড়ে যাব।

বিমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আমার তা মনে হয় না স্যার। খাঁড়ামশাই অত অবিবেচক নন। টাকা অনেকেরই আছে, কিন্তু এ রকম মহৎ মানুষ দু'জন দেখা যায় না। স্কুল করেছেন, হেল্‌থ সেন্টার খুলিয়েছেন, দু'মাইল রাস্তা করেছেন। নিজেদের খরচে গ্রামের লোকের জন্যে তিনটে টিউবওয়েল করে দিয়েছেন। কত লোককে যে দু-হাতে দান করেন তার হিসেব নেই। তিনি নিশ্চয় বুঝবেন।

ব্যাজার মুখে হেড মাস্টার মশাই বললেন, কে জানে! সেকেলে লোক, মেজাজের থই পাওয়া শক্ত। যা হোক, তুমিও চলো। তুমি সঙ্গে থাকলে একটু ভরসা পাবো।

—আচ্ছা, চলুন—

দু'জনে গিয়ে হাজির হলেন খাঁড়ামশাইয়ের বাড়ীতে।

বংশীবদন দু'শো বত্রিশ মণ ঝোলা গুড়ের কতটা ইঁদুর খেয়েছে, নাগরী ফুটো হয়ে কতটা নষ্ট হয়েছে, কতটাই বা আরশোলা-পিঁপড়ের পেটে গেছে—এইসব লোকসানের হিসেবের মধ্যে তলিয়ে ছিলেন। হেড মাস্টার আর বিমলবাবুকে দেখে প্রথমটায় বললেন, ক্যা ব্যাপার, আপনারা—বলতে বলতেই তাঁর চিচিঙ্গের কথাটা মনে পড়ে গেল।

—বসুন, বসুন।—তার পরেই বিনা ভূমিকায় তাঁর সোজা জিজ্ঞাসা : চিচিঙ্গে ওপরের কেলাসে উঠতে পায়নি কেন?

হেড মাস্টার মশাই একটা ঢোক গিলে বললেন, আজ্ঞে, ও অঙ্কে আর ভূগোলে ফেল করেছে।

—কত পেয়েছে?

—অঙ্কে সাত। ভূগোলে বারো।

—হুম্।—বংশীবদন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ওদের কেলাসের যে দুটো কোশ্চেন আনতে বলেছিলুম এনেছেন?

—আজ্ঞে এনেছি—বিমলবাবু তক্ষুণি দু'খানা প্রশ্নপত্র এগিয়ে দিলেন খাঁড়া মশাইয়ের হাতে।

চশমাটাকে তুলে, জায়গামতো বসিয়ে, বংশীবদন উল্‌টে-পাল্‌টে প্রশ্ন দু'খানা পড়লেন। একবার বললেন, 'ইরে বাবা', একবার বললেন, 'ও-ওয়াফ', আর একবার বললেন, 'এ-সব ক্যা কাণ্ড!' মাথার ওপরে যেন খাঁড়া উঁচিয়ে রয়েছে, এইভাবে তটস্থ হয়ে বসে থাকলেন দুই মাস্টারমশাই।

তারপর :

—এটা বুঝি ভূগোল!

হেড মাস্টার বললেন, আজ্ঞে।

—অ। কেরল রাজ্যের রাজধানী ক্যা? হুম্। ভারতের কোথায় কোথায় কয়লা ও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়, তাহা বল। হুঁ-হুম্। ভারতের একখানি মানচিত্র আঁকিয়া গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রধান প্রধান শহরগুলি—বেশ, বেশ।—প্রশ্নপত্রটি একদিকে সরিয়ে রেখে খাঁড়ামশাই বললেন, এ-সব না জানলে বুঝি বিদ্যে হয় না?

কথার সুরটা বাঁকা। হেড মাস্টার ঘামতে লাগলেন।

বললেন, আজ্ঞে, নিজের দেশটাকে তো জানতে হবে!

—ক্যা? নিজের দেশ? তা ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা হেড মাস্টার মশাই, আপনি তো জ্ঞানী লোক, নিজের দেশের সব খবরই জানেন—দু-দুবার এম. এ. পাশ করেছেন। বলুন দিকিনি, আমাদের এই জেলায় ক'টা গ্রাম আছে?

দুই মাস্টার মশাই এ-ওর মুখের দিকে চাইলেন। ওঁরা অনেক খবর জানেন, কিন্তু—

খাঁড়া মশাই একটু হাসলেন : আচ্ছা বলুন দেখি, বাংলা দেশের কোন্ কোন্ জেলায় বেশি আখের চাষ হয়?

বিমলবাবু বললেন, মুর্শিদাবাদ।

—আর?

দু'জনেই চুপ।

—বলতে পারেন, আমাদের এই কাঁসাই নদীর ধারে—এই জেলায় ক্যা-ক্যা গঞ্জ আছে?

তিন নম্বর খাঁড়ার ঘা। বিদ্যের জাহাজ দুই মাস্টার মশাই স্রেফ বোবা বনে গেলেন।

মিটমিট করে হাসলেন খাঁড়ামশাই : আপনারা দুই জাঁহাবাজ পণ্ডিত হয়ে নিজের বাংলা দেশ, নিজের জেলার এটুকু খবর বলতে পারলেন না, আর চিচিঙ্গে কেরলের রাজধানী কিংবা কোথায় কয়লা আর পেট্রোল পাওয়া যায়—তা লিখতে পারল না বলেই ফেল হয়ে যাবে? আচ্ছা, এবার অঙ্কে আসুন। এই যে—

আতঙ্কে হেডমাস্টার মশাইয়ের দম আটকে এল, এর পরে যদি কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া, মণকষা কিংবা শুভঙ্করের ফাঁকি নিয়ে পড়েন, তাহলে আর দেখতে হবে না। হাত জোড় করে বললেন, ঠিক আছে—আমি এক্ষুণি গিয়েই হংসবদনকে প্রমোশন দিয়ে দিচ্ছি! মানে, আমাদেরই ভুল হয়ে গিয়েছিল।

—প্রমোশন দেবেন?—বংশীবদনের কপাল কুঁচকে গেল : কেবল চিচিঙ্গেকেই?

—আজ্ঞে, আপনার ছেলে—

—আমার ছেলে বলে পীর হয়েছে নাকি? ওটা তো একটা শেয়ালের বাচ্চা। ওকে একা কেন—দিতে হলে সবগুলোকেই দিতে হয়। যারা গোল্লা খেয়েছে, তাদেরও। পারবেন?

www.boiRboi.blogspot.com

মাস্টারমশাইরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

—একটা কাজ করুন। সবগুলোকে কেলাসে তুলে দিন। যারা পাশ করেছে, একেবারে ডবল প্রমোশন দিয়ে দিন তাদের। বাপ্‌রে—কী বিদ্যে! যারা গঙ্গানদীর উৎপত্তি থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছবি এঁকে দেখাতে পারে—সব শহর-গঞ্জের খবর দিতে পারে, তারা সামান্যি লোক!

খুক খুক করে একবার কাশলেন হেড মাস্টার।

—আজ্ঞে, বোর্ডের নিয়ম মেনে তো আমাদের পড়াতে হয়। এ-সব করতে গেলে স্কুল তুলে দেবে।

খাঁড়ামশাই বললেন, দিক তুলে। যে শিক্ষে দেশ-গাঁয়ের খবরটুকুও জানায় না, তা থাকলেই কি আর গেলেই কি। তাহলে তাই করুন। যারা ফেল হয়েছে, সব পাশ। যারা পেট্রোল আর কয়লার খবর দিয়েছে, তাদের ডবল প্রমোশন। যান।

মামলা মিটিয়ে দিলেন বংশীবদন। তারপর খাতা খুলে আবার দু'শো বত্রিশ মণ ঝোলা গুড়ের হিসেব মেলাতে বসে গেলেন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুই মাস্টার মশাই কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বিমলবাবু আস্তে আস্তে ডাকলেন : খাঁড়ামশাই?

অনামনস্কভাবে বংশীবদন বললেন, আবার ক্যা হলো?

—আমি একটা কথা বলব?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

—মই বেয়ে ওঠার সময় লোকে ওপরে তাকায়, না নীচের দিকে?

—নীচে তাকাবে কেন, ওপরেই তাকায়।

—আর ওপরে উঠে কাছের জিনিস দেখে, না দূরের?

—ওপরে উঠলে দূরেই তো চোখ যায়। কিন্তু এখন কেন?

—বলছি। বিদ্যে হলো সেই মই। ওপরে যত উঠবে তত দেশবিদেশের খবর জানবে সে। কোথায় গঙ্গার উৎপত্তি, কোথায় কেরোসিন-পেট্রোল, কেরলের রাজধানী কী, ইত্যাদি—

বংশীবদন হাসলেন : বুঝেছি আপনার কথাটা। কিন্তু মইটা যে মাটির ওপর—মানে দেশ-গাঁ, সে মাটিটাকে কে চেনাবে?

—খাঁড়ামশাই, শিক্ষা তো কেবল স্কুলের জিনিস নয়। তার অর্ধেক ঘরে, অর্ধেক স্কুলে। অপনি জ্ঞানী লোক, এত বড়ো ব্যবসায়ী—আপনার ছেলেকে কি আপনি শেখাবেন না, আমাদের থানায় ক'টা গ্রাম, কাঁসাইয়ের ধারে কী কী গঞ্জ? আপনি কি তাকে চেনাবেন না চারদিকের কোন্ গাছের কী নাম, কোন্‌টা কী ফুল, কোন্ পোকাটা কোন্ জাতের? আপনারা শেখাবেন ঘরের খবর, আমরা বাইরের। অভিভাবক যদি তাঁর কাজ না করেন, আমরা কতটুকু পারি বলুন। এই ঘরের শিক্ষাটা আমরা পাইনি বলেই তো আপনার কথার জবাব দিতে পারিনি। আপনারা এই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিন, আমরা সারা দুনিয়াকে চিনিয়ে দিই। আপনি তো গুড়ের ব্যবসা করেন, আপনার ছেলেও কি জানে—বাংলা দেশের কোথায় কোথায় আখের চাষ হয়?

একটু চুপ করে থেকে হা-হা করে হেসে উঠলেন খাঁড়ামশাই।

—ঠিক বলেছেন। এ তো আমাদেরই কাজ। আপনারা মই দিয়ে তুলবেন ওপরে, আমরা ভালো করে নীচের মাটিটাকে চিনিয়ে দেবো। হুঁ, আমারই ভুল হয়েছে। আজ থেকেই আমি চিচিঙ্গেকে নিয়ে পড়ব। ফেল করিয়েছেন, বেশ করেছেন—কেরলের রাজধানীর খবর দিতে না পারলে আরো সাতবার ফেল করিয়ে দেবেন। তারপর দেখি আমি ওই হতচ্ছাড়াকে নিয়ে কী

করতে পারি।

বলেই চিৎকার :

ওরে ভূষণ, শিগ্‌গীর মাস্টার মশাইদের জন্যে ভালো করে জলখাবার নিয়ে আয়। ওঁরা অনেক খেটেখুটে এসেছেন।—বলে নিজেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন ভেতরে।

হেড মাস্টারের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

—বাঁচালে বিমল, যা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিলেন খাঁড়ামশাই!

বিমলবাবু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

—না স্যার, উনি আমাদেরও চোখ খুলে দিয়েছেন। আজ বুঝতে পারছি, এতগুলো ডিগ্রী পেয়েও নিজের দেশকে আমরা কিছুই চিনিনি। সব আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

নামরহস্য

আমার জ্ঞাতি ভাই গজানন গাঙ্গুলী ফোঁৎ করে নাক দিয়ে আওয়াজ করলেন একটা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাগলের কী কী নাম হতে পারে হে প্যালারাম?'

এমন একটা বেয়াড়া প্রশ্নে আমি ঘাবড়ে গেলুম। ছাগলের কী নাম হতে পারে এ নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। পরীক্ষায় এরকম কোশ্চেন কোনোদিন আসেনি।

আমি ঘাড়-টাড় চুলকে বললুম, 'ছাগলের নাম কী আর হবে! যারা বাঁদর নাচায়, তাদের সঙ্গে তো প্রায়ই একটা ছাগল থাকে দেখি। তারা তাকে গঙ্গারাম বলে ডাকে। আমার ধারণা, সব ছাগলেরই নাম গঙ্গারাম।'

বিকট মুখ করে গজাননদা বললেন, 'তোমার মুণ্ডু! নিজের নাম প্যালারাম, তাই গঙ্গারাম ছাড়া আর কীই বা ভাববে তুমি? অথচ তুমি না পরীক্ষায় বাংলায় লেটার পেয়েছিলে?'

বাংলায় লেটার পাওয়াটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার, স্বীকার করতে হলো সেকথা। ছাগলের নাম কী কী হতে পারে, এ যার জানা নেই, তার লেটার পাওয়ার এক্তিয়ার নেই কোনো।

আমার খুব অপমান বোধ হলো। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ছাগলের কী আবার নাম হবে? রুমকি, টুমকি, মেনি—'

যেই মেনি বলেছি, গজাননদা অমনি ফ্যাঁচ করে উঠলেন।

'মেনি? তোমার মাথা! মেনি তো একচেটে বেড়ালের নাম, ছাগলের হবে কী করে? বোর্ডের উচিত, তোমার লেটারটা কেটে দেওয়া।'

এবার আমি চটে গিয়ে বললুম, 'তা হলে আপনিই বলুন না, ছাগলের কী কী নাম হয়?'

'আমিই যদি জানব, তাহলে তোমায় জিজ্ঞেস করব কেন হে? ভেবেছিলুম তোমার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছ, তুমি একটা বাতলে দিতে পারবে। এখন দেখছি

তোমার মাথায় স্রেফ ড্রায়েড্ কাউ ডাং—অর্থাৎ কিনা ঘুঁটে।'

বৌদি বাড়ির ভেতরে তালের বড়া ভাজছেন, বাতাসে তার প্রাণকাড়া গন্ধ আসছে। বৌদি আবার বলে গেছেন, দুটো তালের বড়া খেয়ে যেয়ো প্যালারাম, তালক্ষীরও করে রেখেছি। এসব জটিল ব্যাপার না থাকলে অনেক আগেই উঠে পড়তুম আমি—ছাগলের নাম নিয়ে এ অপমান কে সহ্য করত এতক্ষণ!

আমি বললুম, 'আপনিই বা এ নিয়ে এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ছাগলের নাম যা খুশি হোক না আপনার তাতে কী! আপনি তো আর ছাগল পোষেন না।'

গজাননদা থেমে থেকে একটা আধপোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে চটপট বাঁ কানটা চুলকে নিলেন। তারপর মুখ বাঁকা করে বললেন, 'ঘাবড়াচ্ছি কেন? আরে—টু হান্ড্রেড্ অ্যাণ্ড ফিফটি রুপিজ।'

'অ্যা!'

'অ্যা আবার কী! আড়াইশো টাকা। ক্যাশ।'

'কার টাকা? কিসের ক্যাশ?'—আমি কাকের মতো হাঁ করে চেয়ে রইলুম গজাননদার দিকে।

'অমন জগদ্দল একটা হাঁ করেছ কী বলে?'—গজাননদা এবার ডানদিকের কানটা চুলকোতে লাগলেন: 'টাকা আমার ব্রহ্মময়ী মাসিমার। তাঁরই ক্যাশ।'

তালের বড়ার সঙ্গে বেশ উৎসাহ বোধ করতে করতে আমি ঘন হয়ে বসলুম।

'কিছু বুঝতে পারছি না, খুলে বলুন।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে গজাননদা সবটা বিশদ করলেন।

মেসোমশাই অনেক টাকা রেখে অনেক দিন আগে স্বর্গে গেছেন। ব্রহ্মময়ী মাসিমা সেই টাকা দিয়ে এতদিন তীর্থ-টীর্থ করছিলেন। মেসোমশাই নামকরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, অনেক শিষ্যও তাঁর ছিল। সেই শিষ্যদের একজন হালে মাসিমাকে একটা ছাগলছানা দিয়ে গেছেন প্রণামী হিসেবে।

এখন মাসিমার তো ছেলেপুলে নেই—এই ছাগলছানাটাকে ভীষণ ভালবেসেছেন তিনি। এর জন্যে স্পেশ্যাল ছোলা-কলা বরাদ্দ, মায় ছোট্ট একটা খাট—তাতে নেটের মশারি পর্যন্ত। কিন্তু মুশকিল হলো, এমন আদরের ছাগলের জন্যে কোনো নামই তিনি ঠিক করতে পারছেন না। এর এমন একটা নাম চাই যে শুনলে কান জুড়িয়ে যাবে, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। তাই ব্রহ্মময়ী মাসিমা ডিক্লেয়ার করেছেন, তাঁর ছাগলের জন্যে নাম যে ঠিক করে দেবে—তাকে তিনি আড়াইশো টাকা প্রাইজ দেবেন। ক্যাশ!

ছাগলের এই আপ্যায়ন শুনে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। মনে মনে ভাবলুম, শ্রীমান প্যালারাম না হয়ে ব্রহ্মময়ীর ছাগল হতে পারলে জন্মটা সার্থক হতো।

গজাননদা বললেন, 'বুঝলে, সেই জন্যেই—'

বললুম, 'ওপন কম্পিটিশন গজাননদা?'

'উঁহু!'—ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে গজাননদা বললেন, 'তুমি যদি প্রাইজটা মেরে দেবার তালে থাকো, তা হলে সে গুড়ে বালি। কম্পিটিশন মাসিমার রোনপোদের মধ্যে স্ট্রিক্টলি রেস্ট্রিক্টেড্। আর তাও কি কম নাকি?

ব্রহ্মময়ী মাসীকে ছেড়ে দিয়ে—আমার মা আর বাকী পাঁচজনের ছেলেমেয়ে নীট বত্রিশজন! জানো তো আমার দু' বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের বলেছিলুম যে, তোরা পার্টিসিপেট করিসনি—তা হলে দু'জন কম্পিটিটর কম হয়, তা তারা বললে, আড়াইশো টাকা যদি ফাঁকতালে পেয়ে যাই, ছাড়ব কেন? কি রকম মীনলেস্ দেখছ?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়।'

'তা হলে প্যালারাম—' কাতর হয়ে গজাননদা বললেন, 'দাও না একটা নাম-টাম বলে। বাংলায় যখন লেটার পেয়েছ, তোমার অসাধ্য কী আছে? আর যদি পাই, বুঝেছ প্যালারাম—পঁচিশ টাকা কমিশন দেবো তোমাকে।'

এ-কথা শুনে আমার মনটা নরম হলো একটু। পঁচিশ টাকাই বা মন্দ কী! পাঁচ টাকাই বা কে দিচ্ছে আমাকে!

'শুধু একটাই নাম পাঠাতে হবে?'

'না—সেরকম বাঁধাবাঁধি নেই কিছু।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। অনেকগুলো নাম পাঠিয়ে দিই। একটা লেগে যাবে নির্ঘাত।'

'সে কথা ভালো। আমি কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আসি বরং।

গজাননদা কাগজ-পেনসিল আনলে আমি বললুম, 'তা হলে প্রথম অ দিয়েই শুরু করা যাক।'

'অ?'—গজাননদা আঁতকে উঠলেন: 'তোমার মতলব কি হে? গোটা স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ কপচাতে চাও নাকি?'

আমি বললুম, 'ডিসটার্ব করবেন না। আমার মুড আসছে—লিখে যান। প্রথমে লিখুন অঞ্জনা।'

'অঞ্জনা? অঞ্জনা মানে কী?'

'অঞ্জন মানে কাজল। অঞ্জনা মানে কাজলের মতো যার রঙ, অর্থাৎ কিনা—কালো।'

'ধ্যুৎ!'—গজাননদা আপত্তি করলেন: 'ছাগলটা মোটেই কালো নয়। লাল-সাদা-কালো-হলদে এসব মিশিয়ে বেশ চিত্তির-বিচিত্তির চেহারা।'

'অ—চিত্তির-বিচিত্তির। তা হলে—তা হলে—অপরূপা।'

'এটা বেশ হয়েছে—' খুশি হয়ে গজাননদা বললেন, 'লেগে যেতে পারে। দিই পাঠিয়ে।'

ব্যস্ত হবেন না—চান্স্ নিয়ে লাভ কী? আরো লাগান গোটা কতক। এবারে আ। আ—আ—লিখুন আজীবনী।'

'আজীবনী! সে আবার কী?'

'মানে সারা জীবন বেঁচে থাকবে, এই আর কি! নামের ভিতর দিয়ে আশীর্বাদ করা হলো ছাগলকে।'

গজাননদা বললেন, 'সারাজীবন তো সবাই-ই বেঁচে থাকে, যখন মারা যায় তখন একবারেই মারা যায়। এ নামের কোনো মানে হয় না।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আপনি তো বি-কম ফেল, সাহিত্যের কী বোঝেন? যা বলছি লিখে যান। লিখুন আজীবনী।'

আজীবনী লেখা হলো।

'এবারে ই। ই—ই—ই—ই—আচ্ছা, ইন্দ্রলুপ্তা হলে কেমন হয়?'

'ইন্দ্রলুপ্তা?'—গজাননদা খাবি খেলেন: 'সে কাকে বলে? ওতো—ইন্দ্রলুপ্ত মানে তো টাক! এ তুমি বলছ প্যালারাম! ছাগলের নাম টাক হলে মাসিমা আমায় প্রাইজ দেবেন?'

'তা হলে ওটা থাক। আচ্ছা ইন্দীবরী?'

'ইন্দীবরী?'—গজাননদা ভুরু কোঁচকালেন।

ইন্দীবর মানে নীলপদ্ম।'

'নীলপদ্ম? বাঃ—বেড়ে।'—গজাননদা বেশ ভাবুকের মতো হয়ে গেলেন: 'আহা

www.boiRboi.blogspot.com

নীলপদ্ম। চোখ জুড়ায়, প্রাণ জুড়ায়। কিন্তু ছাগলটার রঙ তো নীল নয়।'

'তাতে কি হয়েছে ? আমাদের নীলিমাদির রঙও তো নীল নয়, ফুটফুটে ফরসা। পাড়ার কাঞ্চনবাবুর রঙ মোটেই সোনার মতো নয়। স্রেফ কুচকুচে কালো। জানেন তো কবি বলেছেন—নামে কিবা করে—'

গজাননদা ফিল-আপ করলেন : 'ছাগলকে যে নামে ডাকো—ডাকে ব্যা-ব্যা করে। ঠিক, ইন্দীবরীও থাক।'

বললুম, 'এবার উ। লিখুন—উপ্-উপ্-উপ—'

'হনুমানের মতো উপ্-উপ্ করছ কেন ?'

'উপেন্দ্রবজ্রা।'—এই জাঁদরেল নাম শুনে গজাননদা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন : 'ভীষণ কড়া নাম হে—উচ্চারণ করতেই হৃৎকম্প হয়। কাকে বলে ?'

কাকে বলে সেকি আমিই জানি ! কোথায় যেন দেখেছিলুম শব্দটা। বললুম, 'নামে কি আসে যায়, চালিয়ে দিন না। জাঁদরেল নামেরও তো গুণ আছে একটা।'

অনিচ্ছার সঙ্গেই গজানন লিখলেন উপেন্দ্রবজ্রা।

'এবার উ। উ। উ-উ-নাঃ, উ বড় বেয়াড়া, উর্ধ্বময়ী ছাড়া কিছু মনে আসছে না। আর উর্ধ্বময়ী নাম দিলে—'

গজাননদা বললেন, 'মাসিমা ভাবতেন—তাঁর ছাগলের উর্ধ্বলোক, মানে মৃত্যু কামনা করা হচ্ছে। তা হলেই প্রাইজের আশা ফিনিশ ! ও সব চলবে না। তা ছাড়া প্যালারাম, তুমি যেভাবে অ-আ-ই-ঈ-চালাচ্ছ—'

'ঈ বাদ দিয়েছি তো। ওতে ঈশ্বরী ছাড়া আর কিছু হয় না।'

'না না, ঈশ্বরী নয়। ঈশ্বরী ছাগল মানে স্বর্গীয় ছাগল, উর্ধ্বময়ীও তাই। ডেনজারাস। আমি বলি কি প্যালারাম—এই স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের প্যাঁচ ছাড়ো—নইলে গোটা দিনেও শেষ হবে না যে।'—

গজাননদা কাতর হয়ে বললেন, 'ওদিকে তালের বড়াগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে !'

তালের বড়ার নামে আমাকেও প্ল্যান বদলাতে হলো !

'তা হলে শর্টকাট করা যাক। লিখুন—ক-এ কুসুমিকা, খ-এ—আচ্ছা খ থাক—গ-এ গরবিনী, ঘ-এ ঘোরাননা ? না—ঘোরাননা বাজে—মাসিমা ভাববেন তাঁর ছাগলের মুখ ঘোড়ার মতো বলা হচ্ছে—চ-এ—চ-এ চিত্রলেখা।'

'না-না, চিত্রলেখা তোমার বৌদির নাম।'—গজাননদা আর্তনাদ করলেন : 'ছাগলের ও নাম দিলে তোমার বৌদি আর রক্ষে রাখবে না, তালের বড়া আর তালক্ষীর একেবারে গেল।'

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন। তা হলে চ-এ চারুপ্রভা, ছ-এ—ছএ ছাগলিকা, জ—জ-এ জয়ধ্বজা, ঝ-এ—ঝ-এ ঝঞ্ঝিকা—'

'ঝঞ্ঝিকা—ঝড়-টড় নাকি ? না-না, ও-সবের মধ্যে যেয়ো না।' —গজাননদা ছটফট করতে লাগলেন : 'প্লীজ প্যালারাম, শর্টকাট কর—তালের বড়াগুলো—'

'ঠিক—তালের বড়াগুলো।'—আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম : 'তা হলে আর বর্ণমালা নয়—অ্যাট র‍্যানডম—মানে যা মনে আসে। লিখে যান—বিচিত্রিতা, নবরূপা, মনোহরা—'

'মনোহরা কি একটা খাবার নয় ? মাসিমা ভাববেন, কে তার ছাগলকে কেটে খাওয়ার—'

'তা হলে মনোরমা। লিখুন পল্লবিকা—পাতা-টাতা খায়—ফুল্লনলিনী—দেবভোগ্যা—'

গজাননদা আবার বাধা দিলে : 'দেবভোগ্যা ? সে তো ঘিয়ের বিজ্ঞাপনে লেখে হে ! তুমি কি ঘি দিয়ে ছাগল রান্না-টান্নার পরামর্শ দিচ্ছ ?'

'থাক—থাক। লিখুন দেবকন্যা, টঙ্কারিণী, ডামরী—'

'বেজায় শক্ত ঠেকছে।'

'হোক শক্ত। ব্রহ্মময়ী নামটাই বা কি এমন নরম ? অমন নাম যাঁর, কড়া নামেই হয়তো তিনি খুশি হবেন। লিখে যান—শূরসুন্দরী, সুখময়ী—'

লিষ্টি যখন শেষ হলো, তখন পুরো আটশটা নাম।

আমি বললুম, 'আরো দুটো মনে পড়েছে। য-র-ল-ব-হ-ক্ষ—লিখুন হংসপদিকা, ক্ষুরেশ্বরী—'

'ক্ষুরেশ্বরী ?'

'ক্ষুরের ঈশ্বরী যে। অর্থাৎ কিনা—মাসিমার ছাগলের মতো ক্ষুর আর কোনো ছাগলেরই নেই।'

'রাইট। ক্ষুরেশ্বরী চলতে পারে। কিন্তু প্যালারাম, লিস্ট একটু বড় হলো না ?'

'তা হোক। লটারীতে বেশি টিকেট কিনলে প্রাইজের আশাও বেশি—বুঝতে পারেন তো ? দিন, দিন পাঠিয়ে—একটা লেগে যাবে নির্ঘাৎ।'

'ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার মুখে।'

'ফুল-চন্দনের আগে তালের বলা পড়া দরকার। আর পঁচিশ টাকা কমিশন।'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়। সে আর বলতে ! তবে পঁচিশ টাকা একটু বেশি হলো, না প্যালারাম ? যদি কুড়ি টাকা দিই ?'

আমি চটে বললুম, 'বলেন কি ? লিস্ট ফেরত দিন আমার।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, পঁচিশ টাকাই যাক। চলো—তালের বড়া খেয়ে আসা যাক।'

বিস্তর খাটুনি হয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে তালের বড়া খেতে গেলুম।

খেতে খেতে এবার মিটমিট করে হাসতে লাগলেন গজাননদা।

'কী হলো, হাসছেন যে ?'

'জানো, ভূতো এসেছিল কাল।'

'ভূতোদা ?'

'হ্যাঁ, আমার আর এক মাসতুতো ভাই। এক নম্বর গবেট। আমার কাছ থেকে আবার নামের সাজেস্‌ন্ চায় !'—গজাননদা বললেন, 'তা দিয়েছি বলে।'

'কী বলে দিলেন ?'

'আন্দাজ করো দিকি ?'—চোখ মিটমিট করতে লাগল তাঁর।

'বলতে পারলুম না।'

'গঙ্গারাম। ও যেমন হাবা গঙ্গারাম—তাতে ও নাম ছাড়া ওকে আর কী দেবো ? শুনে ধন্যি হয়ে চলে গেল। হা—হা—হা—'

শুনে আমিও হাসলুম : 'হা—হা—হা—'

প্রাইজের রেজাল্ট বেরুবে পরের রবিবার। পঁচিশ টাকার আশায় আশায় খবর জানতে গেলুম।

দেখি গজাননদা আরশোলার মত মুখ করে বসে।

'পাননি প্রাইজ ?'

'নাঃ !—' হাঁড়ি ফাটার মতো আওয়াজ করে গজাননদা বললেন, 'তোমার ইন্দীবরী—আজীবনী—অপরূপা— ফুল্লনলিনী—হংসপদিকা —সব চিৎ। প্রাইজ কে পেয়েছে, জানো ? ভূতো।'

'অ্যাঁ !'

'হ্যাঁ, সেই গঙ্গারাম ! একত্রিশ জন বোনপো-বোনঝি বাংলা ডিক্শনারি উজাড় করে

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়েছিল। মাসীমা বললেন, ছাগলের নামে ও-সব কাব্যি দিয়ে কী হবে! গঙ্গারাম! আহা—মা গঙ্গা, তায় রাম নাম! নাম করতেই পুণ্যি!—বলে, ছাগলটার পায়ে ঢুপ করে একটা পেন্নাম করে প্রাইজটা ভুতোকেই দিয়ে দিলেন।'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। আজও বাড়ির ভেতর থেকে ভাদ্র মাসের তালের বড়ার গন্ধ আসছিল, কিন্তু বৌদি যে সে বড়া আমায় খেতে দেবেন, সে ভরসা আর হলো না আমার।

রচনার রহস্য

ট্যাক্সিটা যেই বড় রাস্তায় পড়েছে, অমনি দেখি সামনে ভোম্বলদা। হাত বাড়িয়ে বললে, 'এই দাঁড়া, দাঁড়া একটু। আমিও তোর সঙ্গে যাব।'

বলতে যেটুকু দেরি। তারপরেই টুক করে উঠে এল গাড়িতে। ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'তুমি আবার কোথায় যাবে?"

'কেন, তুই যেখানে যাচ্ছিস। মানে, দেওঘরে।'

আরো আশ্চর্য হয়ে গেলুম আমি। রাঙামাসীর বিয়েতে আমি যে দেওঘরে যাচ্ছি সে খবরটা পাড়ায় কারুর জানা নেই, সাতদিন ধরে ঢাক- ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াচ্ছি সকলকে। এমন কি ভোম্বলদাকেও। কিন্তু সেও যে আজকেই, এই ট্রেনেই, দেওঘরে যাবে—মাত্র এই মুহূর্তেই, আমি সেটা জানতে পারলুম।

বললুম, 'তুমিও কি রাঙামাসীর বিয়েতে যাচ্ছ নাকি?'

'তোর রাঙামাসীর বিয়েতে আমি কেন যেতে যাব? আমার বুঝি ফুলপিসী থাকতে নেই?'

'তোমার ফুলপিসীর বিয়ে? দেওঘরেই?'

ভোম্বলদা নাক কুঁচকে বললে, 'কেন, তোর রাঙামাসী ছাড়া দেওঘরে আর বুঝি কারুর বিয়ে হতে নেই? আবদারতো দেখছি মন্দ না।'

শুনে আমি একটু দমে গেলুম। তারপর খানিকটা ভেবে-চিন্তে বললুম, 'কিন্তু কই, আগে থাকতে তুমি তো কিছু বলোনি।'

'আমি কি তোর মতো হাঁদারাম যে একমাস ধরে পাড়ায় পাড়ায় ফিরিওলার মতো চেঁচিয়ে বড়াব? স্রেফ চেপে রেখেছিলুম। দ্যাখ না—কেমন সারপ্রাইজ দেলুম তোকে।'

আমি আবার মাথা চুলকোতে লাগলুম।

'কিন্তু ভোম্বলদা—'

'থামলি কেন, বলে যা।'

'বিয়েবাড়ি যাচ্ছ—সঙ্গে তো জিনিসপত্র কিচ্ছু দেখছি না।'

'আমার পিসীবাড়ি তোর মাসীবাড়ির মতো নাকি?'—খুব অহঙ্কার করে, নাকটাকে কপালে তুলে দিয়ে ভোম্বলদা বলল, 'সেখানে কিছু নিয়ে যেতে হয় না। জামা-কাপড় বাক্স—স্রেফ কিচ্ছু না।'

www.boiRboi.blogspot.com

'সব রেডি থাকে?'

'সব—সব।' বলতে বলতে ভোম্বলদা টক করে পকেট থেকে একটা লেবেনচুস বের করে খেলো।

আমি জুলজুল করে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু আমাকে দিলে না।

একটু পরে ভোম্বলদা বললে, 'তুই আগে কখনও দেওঘরে গেছিস?

বললুম, নিশ্চয়—আরো তিনবার। তুমি?'

'সাতবার।'

'কই, কখনো তো...।'

'তোকেই কি যেতে দেখেছি এর আগে? তুই যে চালিয়াতি করে মিথ্যে করে বলছিস না—কেমন করে তা জানব?'

ভীষণ রাগ হল আমার।

'আমি মিথ্যে কথা বলছি? বেশ, জিজ্ঞেস করো আমাকে।'

ভোম্বলদা গম্ভীর হল।

'আচ্ছা বেশ, যাচাই করে নিচ্ছি তোকে। আচ্ছা, বল্ দেখি কি কি পাড়া আছে দেওঘরে?'

আমি বললুম, 'এ আর শক্তটা কি! বম্পাস টাউন, উইলিয়মস্ টাউন, কাস্টোয়ার্স টাউন, বিলাসী টাউন—'

'থাক থাক, এতেই যথেষ্ট হবে।'—ভোম্বলদা একবার যেন নিজে নিজে আউড়ে নিলে : 'বম্পাস টাউন, উইলিয়মস্ টাউন, কাস্ট—মরুক্ গে, বিলাসী টাউন—হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

আমি খুব খুশি হয়ে বললুম, 'বিশ্বাস হল এবারে?'

'কী করে বিশ্বাস হবে? ও তো লোকের মুখে মুখেই শোনা যায়।'

চটে বললুম, 'কক্ষনো না। তুমি আরো জিজ্ঞেস করো না।'

'আচ্ছা বল তো, দেওঘর জায়গাটা কি রকম?'

'খুব ভালো। খাসা জায়গা। বাড়িগুলো সব ফাঁকা ফাঁকা, কত গাছপালা, কত পাখি। কেবল বাজারটা একটু ঘিঞ্জি, আর মন্দিরটা।'

'দেওঘরে কিসের মন্দির আছে বল্ তো?'

আমি হেসে উঠলুম।

'এ আর কে না জানে? বাবা বদ্যিনাথের মন্দির।'

'মন্দিরটা কেমন দেখতে?'

'কেমন আবার? ছোট মতন শিবের মন্দির। ভিতরটা বেশ অন্ধকার, ভীষণ ভিজে ভিজে, আর খুব ভিড় হয়। একবার তো মেজোমামা ধুম করে একটা আছাড়াই খেয়ে গেলেন।'

'হুঁ, বদ্যিনাথের মন্দির। শিবের মন্দির। অন্ধকার—ভিজে ভিজে, লোকে ধুম করে আছাড় খায়। কারেক্ট। ঠিক বলেছিস।'

আমি আরো খুশি হলুম।

'কেমন, বিশ্বাস হল এবারে?'

'কী করে হবে? মাসী-পিসীমাদের মুখেও তো এসব গল্প শোনা যায়। আচ্ছা, আর একটুখানি বাজিয়ে নিই তোকে।'

আমার ভীষণ অপমান বোধ হল।

'বেশ, আরো জিজ্ঞেস করো। যত ইচ্ছে তোমার।'

'আচ্ছা—বল্ দিকি, লোকে মন্দিরে কেন যায়?'

'কেন যায় আবার? বদ্যিনাথ নাকি সকলের অসুখ-বিসুখ ভালো করে দেন। তাছাড়া

মন্দিরের গলিতে খুব ভালো ক্ষীরের প্যাঁড়া পাওয়া যায়। তাই কিনতেও যায় অনেকে।'

'তুই বদ্যিনাথের প্যাঁড়া খাস?'

'পেলেই খাই।'—বলতে বলতে আমার জিভে জল এসে গেল : না পেলেও খেতে ইচ্ছে করে। যেমন বড়ো বড়ো, তেমনি খেতে খাসা।'

'হুঁ, বদ্যিনাথের ক্ষীরের প্যাঁড়া। খেতে খাসা। না পেলেও খেতে ইচ্ছে করে।'—ভোম্বলদা আবার কথাগুলো আউড়ে নিলে : 'বল্ দিকি, আর কী খেতে ভালো লাগে ওখানে?'

'কেন, আতা? যেন রাবড়ি। তাই দিয়ে আবার ফার্স্ট-কেলাস পায়েস হয়।'

বলতে গিয়ে আবার আমার জিভে জল এল। ভোম্বলদা লেবেনচুসটা গালে নিয়ে খানিকক্ষণ ভাম হয়ে বসে রইল—যেন আমারই মতো সে মনে মনে আতার পায়েস খাচ্ছিল।

একটু সামলে-টামলে নিয়ে ভোম্বলদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'থাক গে, খাওয়ার কথা ছেড়ে দে। মন উদাস হয়ে যাচ্ছে।'

মন আমারও উদাস হচ্ছিল। বড় মামীমার তৈরিপায়েসেরগন্ধ যেন এই চল্‌তি ট্যাক্সিতেই নাকে ভেসে আসছিল আমার।

ভোম্বলদা লেবেনচুসটার শেষ অংশটুকু কুড়মুড় করে চিবোতে লাগল। তারপর বললে, 'আচ্ছা, এবারে বরং একটু প্রকৃতিপ্রকৃতির কথা জিজ্ঞেস করা যাক। বল্ তো, দেওঘরে নদী কাছে কি না?'

'আলবৎ আছে। ধারোয়া।'

'কী নাম বললি?'

'কেন—ধারোয়া'—ভোম্বলদার অবিশ্বাসে আমার রাগ হয়ে গেল : 'কক্ষনো আমার ভুল হয়নি, আরো তিনবার আমি গেছি না ওখানে? কত বেড়িয়েছি ধারোয়ার বালির ওপর দিয়ে। এই তো একটুখানি জল—হেঁটে পার হওয়া যায়, ছোট ছোট মাছ চিক চিক করছে। তার ব্রীজের ওপর দিয়েই তো জসিডি যাওয়ার রাস্তা।'

'কোথায় যাবার?'

'কেন জসিডি।'—

'হুঁ, ঠিক বলেছিস।'—ভোম্বলদা তেমনি আউড় যেতে লাগল : 'নদীর নাম ধারোয়া। বালির ওপর দিয়ে বেড়ানো যায়। অল্প জল, মাছ চিক চিক করে। তার ব্রীজের ওপর দিয়ে জসিডি যাওয়ার রাস্তা। হুঁ।'

'হুঁ কি আবার? ঠিক বলিনি?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'—ভোম্বলদা বললে, 'তুই যে সত্যিই দেওঘরে গেছিস তাতে আর সন্দেহ নেই।'—বলেই ধাঁই করে বেমক্কা আমার পিঠে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে। বেশ জোরেই লাগল, কিন্তু এতক্ষণে ভোম্বলদাকে বিশ্বাস করাতে পেরেছি ভেবে আমি ওইটুকু সহ্য করে গেলুম।

ভোম্বলদা বললে, 'তুই দেখছি বাহাদুর ছেলে। খুব ভালো মেমারি তোর। আচ্ছা, ওয়ান মোর্ কোয়েশ্চেন—মানে আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞস করব। বল্ দেখি, দেওঘরে পাহাড় আছে কিনা?

'বা রে, পাহাড়েরই তো জায়গা।'

'ভুম। দুটো পাহাড়ের নাম কর।'

'কেন, নন্দন পাহাড়? সে তো শহরের ভেতরেই। সেখানেই তো জলের ট্যাঙ্ক, আর ক'টা মন্দির। তারপরে তপোবনের পাহাড় আছে, ছোট্ট, খুব সুন্দর। আর সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ত্রিকুট—তেরো মাইল দূরে।'

'ঠিক।'—ভোম্বলদা মাথা নাড়ল : 'নন্দন পাহাড়, ক'টা মন্দির আর জলের ট্যাঙ্ক। তপোবনের পাহাড়—ছোট্ট, খুব সুন্দর। আর কী বললি?'

'বাঃ, ত্রিকুট।'

'হুঁ, ত্রিকুট। কত বড়ো?'

'বিরাট। তাতে ত্রিকুটেশ্বর শিবের মন্দির, সেখান থেকে একেবারে ওপরে উঠতে প্রায় দু' ঘণ্টা লাগে।'—সবজান্তার মেজাজ নিয়ে আমি বক বক করতে লাগলুম : 'তবে তার প্রায় সবটাই ঘন জঙ্গল—ভালুক-টালুকও নাকি আছে। তবে মন্দিরের দিকটায় ও-সব কিছু নেই, খালি বাঁদর আছে বিস্তর।'

'হুঁ, বাঁদর। তোরই দলের, কী বলিস?' ভোম্বলদা খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হাসল।

আমার বিরক্ত লাগল এবার। চুপ করে রইলুম।

ট্যাক্সি এতক্ষণে হাওড়া স্টেশনে এসে গিয়েছিল। দুজনেই নেমে পড়লুম, ট্যাক্সির ভাড়াটাও মিটিয়ে দিলুম আমি। তখন হঠাৎ ভোম্বলদা বললে, 'চলি তা হলে প্যালা, টা-টা—'

আমি বললুম, 'টা-টা আবার কেন? এক ট্রেনেই তো যাব। একসঙ্গেই যাচ্ছি।'

ভোম্বলদা মুখ ব্যাজার করে বললে, 'ট্রেনে যেতে বয়ে গেছে আমার। পরশু টেস্ট্ পরীক্ষা না? আমি বাড়ি ফিরছি।'

'সে কি। তোমার ফুলুপিসীর বিয়েতে যাবে না?'

'কে ফুলুপিসী?'—যেন মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়াচ্ছে, এই ভাবেই কথাটা উড়িয়ে দিলে ভোম্বলদা : 'কোনো পিসীই নেই আমার। এক মাসী আছে, সে তো থাকে শ্যামবাজারে।'

'তা হলে তুমি দেওঘরে—'

'কে যেতে যাচ্ছে দেওঘরে? এদিকে চুঁচড়ো, ওদিকে কাঁচড়াপাড়া, এর বাইরে কোথাও আমি পা-ই বাড়াইনি।'

আমার কিরকম ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল। কিছু বুঝতে পারলুম না। সুটকেস্ হাতে আর বিছানা বগলে নিয়ে আমি ভোম্বলদার দিকে চেয়ে রইলুম।

ভোম্বলদা বললে, 'অমন ড্যাব্ ড্যাব করে চেয়ে আছিস কেন গরুর মতো? এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছিস না? পরশু থেকে টেস্ট্ পরীক্ষা আরম্ভ—ক্লাসের ছেলেরা বলছিল, বাংলায় নির্ঘাৎ এবার 'এসে' আসবে ভ্রমণকাহিনী। আমার ভ্রমণ তো চুঁচড়ো পর্যন্ত—সে কাহিনী লিখলে কুড়ির মধ্যে পাঁচ দেবে, তিন-টিনও দিতে পারে।'

আমি ঠিক তেমনি তাকিয়েই রইলুম। বেশ বুঝতে পারছিলুম মুখটা হাঁ হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। মুচকে হেসে ভোম্বলদা বললে, 'তাই কায়দা করে তোর কাছ থেকে দেওঘর ভ্রমণ শুনে নিলুম। বেশ মজা করে ট্যাক্সিতে বেড়ানোও গেল খানিকটা। তুই দেখিস প্যালা—'এসে'তে এবার অন্তত বারো মেরে দেব। বমপাস টাউন—বিলাসী টাউন—আতার পায়েস—ক্ষীরের প্যাঁড়া—ধারোয়া নদীর জল, চিকচিকে মাছ, নন্দন পাহাড়, ত্রিকুটের বানর, কিচ্ছুটি বাদ যাবে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ—আর এই নে তোর রিয়োয়ার্ড—এই বলে, আমার হাঁ-করা মুখের ভেতরে একটা লেবেনচুস্ গুঁজে দিয়ে ছিটকে চলে গেল সামনে থেকে আর তিড়িং করে নীল রঙের দোতলা বাসটায় লাফিয়ে উঠল।

www.boiRboi.blogspot.com

হাতে হাতেই

কেউ যদি আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দেন, তা হলে সেগুলো আমাদের নিশ্চয়ই খুব মন দিয়ে শোনা উচিত। উপদেশের চাইতে দামী জিনিস আর কী আছে। তা থেকে আমাদের অনেক জ্ঞান-টান হতে পারে, জীবনে আমরা দারুণ উন্নতি করতে পারি। ভালো লোকের ভালো কথা সব সময়েই আমাদের শোনা দরকার।

কিন্তু তারও তো একটা সময় অসময় আছে? মনে করো, তোমার এমন খিদে পেয়েছে যে পেটের ভেতরে একেবারে তিন-তিনটে চিতা বাঘ দাপাদাপি করছে। তুমি কেবল খেতে বসতে যাবে, এই সময় কেউ এসে তোমার পথ আটকে দাঁড়ালেন। তারপরে সমানে দেড় ঘন্টা ধরে বক্তৃতা করতে লাগলেন, খাদ্য সম্পর্কে। কোন্ খাবারে কী ভিটামিন, কিসে কত ক্যালোরী, ডিম আধসেদ্ধ ভালো বা পুরো সেদ্ধ ভালো, খাওয়ার সময় বাটিবার কিংবা আশীবার চিবানো উচিত—এই সব জ্ঞান তিনি তোমায় দিতে লাগলেন। পেটে খাঁ—খাঁ ক্ষিদে, সামনে খাবার তৈরি—অথচ খাওয়া বন্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে তোমায় উপদেশ শুনতে হচ্ছে—এ-রকম হলে কেমন লাগে?

এ রকম হলে নিশ্চয় মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর উপদেশের ওপর অরুচি জন্মে যায় চিরকালের মতো।

আমি মকরন্দবাবুর কথা বলছি।

পাড়ার পয়সাওলা লোক। কী একটা বড়ো চাকরি করতেন— এখন পেনসন নিয়েছেন। কলকাতায় খানচারেক ভাড়াটে বাড়িও আছে। এখন আর ভাবনা কী—সকাল-বিকেল বাড়ির রোয়াকে বসে রয়েছেন, আর যাকে পাচ্ছেন—একটানা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। আর কী ঘোরতর উপদেশ! দু ঘন্টার আগে কিছুতেই থামবেন না।

পাড়ার ছেলেরা ওঁকে দেখলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায়। মকরন্দবাবু ভেবে দেখলেন, একটু ঘুষ-টুষ না দিলে কাউকেই পাকড়াও করা যাচ্ছে না। অগত্যা নিজের পয়সায় কাউকে মুড়ি কিনে দিতে লাগলেন, কাউকে আলু-কাবলী, কাউকে আলুর চপ। কিন্তু ঘুগ্‌নি কিংবা আলুর চপ তো পাঁচ মিনিটেই সাবাড়—তারপর দেড় ঘন্টা ধরে যে যন্ত্রণা, তার ধাক্কা কে সামলায়?

এই ধরো আমাদের ন্যাদা। মোহনবাগানের খেলা দেখবে বলে নাচতে নাচতে বেরচ্ছিল, খপ করে পড়ে গেল মকরন্দবাবুর পাল্লায়।

'কোথায় যাচ্ছহে ন্যাদারাম?'

'আজ্ঞে, মোহনবাগানের খেলা দেখতে!'

ন্যাদারা পাড়ায় কেবল নূতন এসেছে, বেচারা জানত না—মকরন্দবাবুর খপ্পরে পড়বার মানে কী! বেশ বিনীত হয়েই দাঁড়িয়ে গেল।

মকরন্দবাবু খুশী হয়ে বললেন, 'বেশ—বেশ, খেলাধুলো খুব ভালো জিনিস। স্পোর্টসম্যান ছেলেদের আমি ভীষণ পছন্দ করি।'

সামনে দিয়ে আইসক্রীম যাচ্ছিল। মকরন্দ বললেন, 'আইসক্রীম খাবে নাকি?'

কে আর খেতে চায় না? আনন্দে ন্যাদা তো গলেই গেল।

বেশ বড়ো সাইজের একটা আইসক্রীম ন্যাদাকে খেতে দিলেন মকরন্দ। আদর করে তাকে

www.boiRboi.blogspot.com

পাশে বসালেন। ভদ্রলোকের উদারতায় ন্যাদা মুগ্ধ হয়ে আইসক্রীম খেতে থাকল আর মকরন্দ তখন তাকে ফুটবল সম্পর্কে কাজের কথা বলতে লাগলেন।

ফুটবল খেলা কবে কী করে শুরু হয়েছিল, প্রথমটায় এক ঘন্টা ধরে সেটা বোঝালেন তিনি। ন্যাদা উসখুস করতে লাগল—আর দেরি হলে মাঠে টিকিট পাওয়া মুশকিল হবে।

একজন পাঁটার ঘুগ্‌নি ফিরি করছিল। মকরন্দ বললেন, 'একটু ঘুগ্‌নি খাও না।' অগত্যা ঘুগ্‌নির কৃতজ্ঞতায় আর একটু বসতে হল ন্যাদাকে।

তার পরের দৃশ্যটা কল্পনা করে নাও।

ন্যাদা এক-একবার দাপিয়ে দাপিয়ে উঠছে আমায় যেতে দিন, আমায় যেতে দিন—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর মকরন্দ এক হাতে সমানে তাকে পাকড়াও করে বলে যাচ্ছেন: আর একটু শুনে যাও হে—এসব কথা তোমার জানা দরকার।

সুতরাং ন্যাদা জানতে লাগল, কী করে কলকাতার মাঠে গোরা সৈন্যরা প্রথম ফুটবল আনল। তাই দেখে নগেন সর্বাধিকারীর ফুটবল খেলার সখ হল। তৈরি হল বাঙালী টীম, কুমারটুলী, মোহনবাগান। সেখান থেকে প্রথম আই-এফ-এ শীল্ড—শিবু ভাদুড়ী, বিজয় ভাদুড়ী—

ন্যাদা ভাঙা গলায় খ্যাঁ খ্যাঁ করতে লাগল: আমি জানি, আমি জানি। বইয়ে পড়েছি। দয়া করে এবার আমায় ছাড়ুন—এতক্ষণে বোধহয় খেলা—

মকরন্দ বললেন, 'ওই তো গরম আলুর দম আসছে। একটু খাও না।'

আর আলুর দম! ন্যাদার মুখে দুনিয়ার সব খাবার তখন চিরতার মতো তেতো লাগছে।

'আলুর দম চাই না। আমি যেতে চাই।'

'আহা যাবেই তো—যাবেই তো। তোমায় তো কেউ আর চিরকালের মতো আটকে রাখছে না। তারপরে কী হল শোনো। দিল্লীর ডুরাণ্ড ট্রফি—'

মোহনবাগানের শীল্ড-ট্রফি-লীগ সবকিছু বিজয়ের বিবরণ বিশদভাবে শোনবার পর ন্যাদা যখন খালাস পেল, তখন সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে—খেলার মাঠে তখন আর খেলোয়াড় নেই, তার আনাচে-কানাচে ঝিঁঝির ডাক উঠছে। ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ফিরে গেল ন্যাদা।

তারপর থেকে এ রাস্তাই আর মাড়ায় না সে। আধ মাইল ঘুরে সে স্কুলে যায়, গলি-ঘুঁজি দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে খেলার মাঠে রওনা হয়—কিন্তু আর সে মকরন্দবাবুর পাল্লায় পড়তে রাজী নয়।

ছেলেদের যখন আর কিছুতেই পাকড়ানো যাচ্ছে না—তখন মকরন্দ যাকে পান, তাকেই ধরতে লাগলেন। একটা গো-বেচারী লোক কাচের চুড়ি বিক্রি করছিল, তাকেই হয়তো ফস্ করে ডাকলেন: 'এই ইধার আও—জলদি আও।'

লোকটা খুশী হয়ে এসে বোঝা নামাল। ভাবল, বড়ো বাড়ি—স্বয়ং বড়োবাবু বসে রয়েছেন—বিক্রি-টিক্রি ভালোই হবে হয়তো।

'মাইজী লোগোঁকো বোলাইয়ে বড়াবাবু। চুড়ি দেখাব।'

'আরে রাখো মাইজী। আমার গিন্নী তো বুড়ডী হো গিয়া—উ কাচের চুড়ি নেহি পরেগা, শুনলে তুমকো ভি বকেগা—হামকো ভি বকেগা। ভীষণ রাগী হ্যায়।'

মকরন্দবাবুর ধারণা—উনি খুব ভালো হিন্দী বলতে পারেন।

যাই হোক, চুড়িওলা ব্যাপারটা বুঝে নিলে। মন খারাপ করে বললে, 'তব্ আর কী হোবে—মাইজীর গোসা হলে বহুৎ মুশ্‌কিল। হামি যাচ্ছে বাবু।'

ফিরিওলার ধারণা—সে খুব ভালো বাংলা বলে।

মকরন্দ বললেন, 'আরে— থোড়া বৈঠকে যাও না। দেখতা নেহি—কেত্‌না রোদ্দুর উঠা হ্যায় ? রোদ্দুর মে তোমার গা পুড়ু যায়েগা। একটু বৈঠো ! আমি তেমাকে একঠো রুপেয়া দেব মিঠাই খেতে।'

মিঠাই খাওয়ার প্রস্তাবে কে আর আপত্তি করে ? তার ওপর ফিরিওলা তো নেহাৎ গরীব মানুষ—সারাদিন বিক্রি-পাটা করে— সাত পাড়ায় ঘুরে তার হয়তো এক টাকা দেড় টাকার বেশি রোজগারই হয় না। সে ন্যাদার মতো ফাঁদে পা দিলে।

মকরন্দ বললেন, 'কাচের চুড়িকা হিস্টরি জানতা হ্যায় ?'

'কেয়া ?'

তারপর যা হল সে আর কহতব্য নয়। চুড়িওলা যতই উঠতে যায়, মকরন্দবাবু ততই খপ করে তার চুবড়িটাকে টেনে ধরেন। চুড়ি ভাঙবার ভয়ে সে জোরে টানতেও পারে না—খালি আকুল হয়ে বলতে থাকে : 'ছোড় দিজিয়ে—গরীব-পরবর—মর জায়েগা—'

মকরন্দ বলেন, আরে, আউর থোড়া বৈঠো না। খালি চুড়িই বেচতা হ্যায়—চুড়িকা হিস্টরি নেহি জানুনে সে মানুষ হোগা কেইসে ? শুনো—উস্‌কো বাদ—'

বলতে বলতে যখন মকরন্দর মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে লাগল, ভাব এসে গেল, চোখ বুজে মুকুন্দ দাসের গান গাইতে লাগলেন : 'ফেলে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী আর পোরো না—'আর ভাবের আবেগে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন—সেই ফাঁকে চুড়িওলা তার চুবড়ি টেনে নিয়ে 'বাপ রে—মা-রে' বলে দে দৌড়।

মকরন্দ পেছন থেকে ডাকতে লাগলেন : 'আরে মিঠাই খাওয়ার রুপেয়া লে যাও—'

কিন্তু আর সে ফেরে ? হিতোপদেশের কঙ্কণলুব্ধ পান্থের গল্প তার পড়া নেই বটে, কিন্তু এক টাকার মিঠাইয়ের লোভে কে আর যেচে ব্যাঘের মুখে পা বাড়ায় ?

এ হেন মকরন্দবাবুও সম্প্রতি একেবারে গম্ভীর হয়ে গেছেন। রকে প্রায় বসছেনই না। আর যখন বসছেন, তখনো কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে থাকছেন। লোককে উপদেশ তো দিচ্ছেনই না—বরং কেউ যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করে : 'এই যে কেমন আছেন'— সঙ্গে সঙ্গে চামচিকের মত দাঁত খিচিয়ে চলে যাচ্ছেন ঘরের ভেতর।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। একটি লোক তাঁর উপদেশ একটু কাজে লাগিয়েছে—এই যা।

সেদিনও রোয়াকে বসে মকরন্দ চারদিকে খুঁজছিলেন—উপদেশ দেবার মতো কাউকে ম্যানেজ করতে পারেন কিনা—এই আশায়। এমন সময়—

এমন সময় মেঘ না চাইতেই জল !

একটি মাঝবয়সী লোক, মাথায় কদমছাঁট চুল, ঘোর কালো রঙ, মুখে একটু ঝাঁটা-ঝাঁটা গোঁফ, গায়ে একটা তেল চিটচিটে খাকী শার্ট, চোখ দুটো গোল গোল করে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'একটু সাহায্য করবেন দাদা ?'

মকরন্দ প্রায় নেচে উঠলেন আনন্দে।

'কিসের সাহায্য ?'

'বেকার। পেট চলে না। একটা টাকা যদি দেন, খেয়ে বাঁচি।'

'বেকার ? কেন বেকার ?'—বোতল-খোলা সোডার ফেনার মতো উৎসাহে বিজ বিজ করে উঠলেন মকরন্দ : 'বেকার মানে—নিজের অপদার্থতা, উৎসাহের অভাব—সুযোগ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা না করা। বরাবরই এই পেশা নাকি ?'

'আজ্ঞে না—আগে কাজ-কর্ম এক-আধটু করতাম।'

'কী কাজ ?'

লোকটি একটু কেশে নিয়ে বললে, 'এই—এই অল্পবিস্তর হাতের কাজ। মানে, একটু

যন্তর-টন্তর নাড়াচাড়া করতাম।'

'যন্তর ? সে তো ভালো কথা—অতি উত্তম কথা।'—তৎক্ষণাৎ লোকটির হাত ধরে মকরন্দ তাকে নিজের পাশে বসিয়ে নিলেন : 'যন্ত্রই তো শক্তি—যন্ত্রেরই জয়জয়কার। তোমাকে বুঝিয়ে বলছি সব। তার আগে—ওই যে কলাওলা যাচ্ছে—দুটো কলা খাবে নাকি ?'

ঝাঁটা গোঁফের ভেতর দিয়ে লোকটা একটু হাসল : 'আজ্ঞে খাওয়ালে আর কেন খাব না ? খিদেয় মরছি। আর কলা খেতে আমি ভালোই বাসি।'

ভালো যে বাসে, তার প্রমাণ দিলে পাকা দু' টাকার কলা খেয়ে। একটু ব্যাজারই হলেন মকরন্দ—এই রেটে চালালে গোটা দশেক টাকার না খেয়ে নড়বে না। কিন্তু তা থাক। উপদেশ দিতে না পেরে মকরন্দ দম আটকে মরবার জো হয়েছেন, তার চেয়ে দশটা টাকা যায় তো যাক।

মকরন্দ আড় চোখে তার কলা খাওয়া দেখতে দেখতে বললেন, 'তা যন্তরের কাজ ছেড়ে দিলে যে ?'

'আজ্ঞে, অনেক অসুবিধে।

'অসুবিধের মধ্যে দিয়েই তো বীরের মতো এগিয়ে যেতে হয়।'

'বিপদে পড়ি যে মধ্যে মধ্যে।'

'বিপদ আবার কিসের ? জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন ! যে বীর পুরুষ—সে কাউকে মানে না—কিছু ভয় করে না। বিদ্রোহী কবি কী লিখেছেন জানো ? আমি মানি নাকো কোনো আইন—আমি ভরা তরী করি ভরাডুবি—'

লোকটির কলা চিবুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

'তা হলে আপনি বলছেন যে, আইন-টাইন মানা উচিত নয় ?'

উৎহাসের চোটে মকরন্দ বলতে লাগলেন : 'কিসের আইন ? কার আইন ? আইন হচ্ছে পুরুষকার। হাতের জোর। যন্ত্রের শক্তি। তা হলে তোমাকে কয়েকজন কর্মবীরের কাহিনী বলতে হল।'

লোকটি নড়ে-চড়ে ঘন হয়ে বসল।

'আহা, বলুন বলুন। আপনার যত ইচ্ছে বলুন। এমন প্রাণের কথা আমি কারো মুখে শুনিনি।' মকরন্দ লোকটিকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন। তার তেলচিটচিটে খাকী শার্টটা থেকে যে দুর্গন্ধ আসছিল—সেটা পরোয়াই করলেন না। এমন উৎসাহী—এমন অনুরাগী এত মনোযোগী শ্রোতা তিনি জীবনে আর কখনো পাননি।

লোকটি কলার পরে আলুর দম—আলুর চপ খেলো, আইসক্রীম খেলো, ফুচকা কিনে খেলো, ঝাল-মুড়ি খেলো, ঝাল-নুন দিয়ে চারটে শশা খেলো, এক প্যাকেট সিগারেটের পয়সা আর একটা টাকা বাসভাড়া নিয়ে, নগদ ন' টাকা বত্রিশ পয়সা খসিয়ে যখন ভক্তিভরে মকরন্দবাবুকে প্রণাম করল—তখন তিন ঘণ্টা পার, মকরন্দর গলা বসে গেছে—তিনি ফ্যাস ফ্যাস করছেন—'ওঠো—জাগো-বাগো—লাগো—উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ—'

লোকটা বললে, 'উঠলাম—জাগলাম—লাগলাম আজ থেকেই। ভেবেছিলাম, আর যন্তরের রাস্তা মাড়াব না, কিন্তু আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। শিগ্‌গীরই জানতে পারবেন—আপনার উপদেশ কিভাবে কাজে লাগিয়েছি।'

জানলেন মকরন্দবাবু, দু-দিন পরেই। ভোরবেলায়।

তাঁর শোওয়ার ঘরের লোহারআলমারি সাফ। জানলার গরাদ কেটে চোর ঢুকেছিল। আলমারির তালা কেটেছে আরো ওস্তাদির সঙ্গে। উধাও হয়েছে বিশ হাজার টাকার গয়না—আর নগদ টাকা হাজার বারো।

www.boiRboi.blogspot.com

তাঁর রাগী গিন্নীর রাগে দুঃখে বার বার ফিট হতে লাগল। পুলিশ এসে বলল, 'এ যে পাক্কা দাগী চোরের ব্যাপার দেখছি! একেবারে ওস্তাদের হাতের কাজ।' অন্য সময় হলে—এত দুঃখের ভেতরেও চোর সম্পর্কে ঘণ্টা দুই উপদেশ দারোগাকে নিশ্চয়ই দিতেন মকরন্দবাবু। কিন্তু আজ তিনি স্পীকটি নট।

কারণ, সাফ করা আলমারির ভেতরে এক টুকরো চিঠি পেয়েছিলেন তিনি। আজে-বাজে কাগজে কাঁচা কাঁচা হরফে পেনসিলে লেখা। কিন্তু কথাগুলো পরিষ্কার।

'ছয়-সাতবার জেল খাটিয়া ভাবিয়াছিলাম, আলমারি ভাঙার লাইন ছাড়িয়াই দিব। কিন্তু আপনার কথায় বুকে বল পাইলাম। মানি নাকো কোনো আইন। বিপদ আসে তো আসুক। যন্ত্রের কাজ চালাইব—বাক্স সিন্দুক ভাঙিব। না হয় আরো পাঁচিশবার জেলই খাটিব। তাই উঠিলাম, জাগিলাম এবং লাগিলাম—আর আপনার উপদেশ কিভাবে মানিয়াছি, তাহাও আপনাকে জানাইয়া গেলাম। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন। ইতি—সেই যন্তরওলা লোকটি।'

এর পরেও কি কেউ কাউকে উপদেশ দিতে পারে? পারে কখনো?

হরিদাস আর নীল মাছি

বাড়িতে কেউ নাই, টালিগঞ্জের পিসীমা কলতলায় আছাড় খেয়ে হাঁটু ভেঙেছেন—এই খবর পেয়ে সবাই দেখতে গেছেন তাঁকে। শুধু বাড়ি পাহারা দিচ্ছে হরিদাস। আনন্দের সঙ্গেই রাজী হয়েছে সে।

কারণ, আজই পাটনা থেকে মেজোমামা দু' ঝুড়ি বাছাই ল্যাংড়া আম পাঠিয়েছেন। তাদের গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছে। তাছাড়া গোটা চারেক কাঁঠালও পেকেছে ভাঁড়ার ঘরে। কাল থেকে ঠাকুমার অম্বুবাচী, সেইজন্যই তোলা আছে সব। মা-র মনে একটু সন্দেহ ছিলই। যাওয়ার আগে পই পই করে বলে গেছেন, এই হরে, আম-কাঁঠালগুলোর দিকে যেন নজর দিসনি। ওগুলো অম্বুবাচীর জিনিস—খেয়াল থাকে যেন। হরিদাস একটু ঢেঁকুর তুলে বলেছে, তুমি আমাকে যে কী ভাবো মা! এই এক্ষুণি তো চিংড়ীর কালিয়া আর মুড়িঘণ্ট দিয়ে গাণ্ডে-পিণ্ডে খেলাম। এর পর আবার আম-কাঁঠাল খাবো, কী যে বলো তার ঠিক নেই।

—তোমায় বিশ্বাস নেই বাপু—তুমি সব পারো।

—না মা, পারি না। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও।

মা গেছেন। কিন্তু খুব যে নির্ভয়ে গেছেন তাঁর মুখ দেখে সে কথা মনে হয়নি। এইখানে হরিদাসের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার।

অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী-ঘরের ছেলে। সবচাইতে ছোট বলে আর ছেলেবেলায় খুব পেটের অসুখে ভুগত বলে, শাসন তো পায়ইনি, প্রশ্রয় পেয়েছে অতিরিক্ত। ফলে চারবারের চেষ্টাতেও স্কুল-ফাইনাল ডিঙোতে পারেনি। বিরক্ত হয়ে বাবা বলেছেনে, আর ওর পড়বার দরকার

নেই—এবার ব্যবসাতেই ঢুকিয়ে দেব।

কিন্তু জাঁদরেল তিন-তিনটে দাদা থাকতে হরিদাসের বয়ে গেছে ওসব করতে। এখন সে পাড়ার জিমনাস্টিক ক্লাবের পাণ্ডা—ইয়া তাগড়া জোয়ান। পেটরোগা তো নয়ই—বরং সাধারণ মানুষের পাঁচগুণ না খেলে তার পেট ভরে না। শেষ রাতে উঠে একটা হারমোনিয়াম নিয়ে দরাজ গলায় কালীকীর্তন গাইবার চেষ্টা করে। তাতে করে এই হয়েছে যে, কলকাতার এমন ভিড়ের দিনেও সামনের দিকের দো-তলা বাড়িটা আজ বছরখানেক ধরে প্রায় খালিই পড়ে থাকে। ভাড়াটে আসে না তা নয়, কিন্তু তেরাত্তিরের বেশী কেউ টিকতে পারেনি, বাক্স-বিছানা ঘাড়ে তুলে যেদিকে পারে দৌড় মেরেছে। শুধু এক লম্বা 'চুলওলা কবি-কবি ভদ্রলোক দিন দশেক কাটিয়ে দিলেন, এগার দিনের দিন যখন তিনি দুটো লাল লাল চোখ পাকিয়ে পাড়ার হিন্দুস্থানী গয়লা দেওলালকে জাপটে ধরে সমানে ইংরেজী গান শোনাতে লাগলেন, সেদিন সবাই মিলে চাঁদা করে তাঁকে রাঁচির ট্রেনে তুলে দিয়ে এল।

যাই হোক, বাড়ি যখন খালি আর ঠাকুর-চাকরেরা বিকেল চারটে পর্যন্ত আড্ডা দিতে বেরিয়েছে, তখন এক পেট গিলে হরিদাস তেতলার ঘরের মেঝের একটা শীতলপাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, প্রচুর পরিমাণে চিংড়ীর কালিয়া আর মুড়িঘণ্ট খেয়ে মেজাজটাও বেশ খুশীই আছে। ঝিমঝিম করছে দুপুর—হরিদাসের ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু পাটনাই ল্যাংড়া আর পাকা কাঁঠালের গন্ধ এমন বেয়াড়াভাবে এসে নাক দিয়ে ঢুকে তার পেটের মধ্যে সুড়সুড়ি দিতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত হরিদাস 'দুত্তোর' বলে উঠে বসল। তখন হরিদাসের মনে হল, খেয়ে নিশ্চয় তার পেট ভরেনি—নইলে আম-কাঁঠালের গন্ধে তার প্রাণ এমন উদাস হয়ে যাচ্ছে কেন? আর কে না জানে,কম করে খেলে শরীর টেকে না—এমন কী হাতী পর্যন্ত চীৎপাত হয়ে পড়ে?

মা-কে অবিশ্যি কথা দিয়েছি—মনটা প্রথমে খুঁত খুঁত করতে লাগল। তারপরে আরো নিবিষ্টমনে চিন্তা করে দেখল, প্রাণটাই যদি অনাহারে গেল, তাহলে কথা দিয়ে আর কি হবে! আর সে মারা গেলে মা-ই তো সবচাইতে কান্নাকাটি করবেন! মিছিমিছি অকালে মারা গিয়ে মা-কে কষ্ট দিয়ে লাভ কি।

অতএব মাতৃভক্ত হরিদাস উঠে পড়ল, দোতলার ভাঁড়ারে গিয়ে ঢুকল, বেছে বেছে পাঁচিশটা বড়ো বড়ো ল্যাংড়া আম আর একটা কাঁঠাল খেয়ে অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচালো। তারপর আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে শীতলপাটিতে লম্বা হলো। হ্যাঁ, এইবারে ঘুম আসছে—বেশ জমাটে ঘুম একখানা।

তিন মিনিটের মধ্যেই ঘর কাঁপিয়ে হরিদাসের নাক ডাকতে লাগল। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই এই নাকের ডাক চলতে পারত, কিন্তু গোল বাধল আরো মিনিট দশেক পরেই। আম-কাঁঠালের গন্ধে একটা নীল মাছি অনেকক্ষণ ধরেই ঘোরাঘুরি করছিল, সেটা এবার হরিদাসের ঘরে এসে ঢুকল। এই তো—এখানেও যে সেই প্রাণকাড়া গন্ধ। কিন্তু কোথায় সেই মন-হরা কাঁঠাল—আর হৃদয়-হরা ল্যাংড়া আম?

কই—কোথায়?

হরিদাসের হাঁ-করা মুখ থেকে 'ফোঁ—ফরর্' আওয়াজটা যেন মাছিকে ডাক দিয়ে বললে, কেন, এই এখানে?

হরিদাস ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল, তার মাথার সামনে কে যেন একটা মণখানেক ওজনের কাঁঠাল ঝুলিয়ে রেখেছে আর সে হাঁ করে তাতে কামড় দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ কাঁঠালটা থেকে কাঠবেড়ালির মতো একটা ল্যাজ বেরিয়ে এল, সেটা আবার হরিদাসের মুখে, সমানে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। ভীষণ বিরক্ত হয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আরে খেলে যা! কাঁঠালের

www.boiRboi.blogspot.com

ল্যাজ আছে এ কথা তো কখনো শুনিনি। আর বলতেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

আরে, রামো—এ যে একটা নীল মাছি। দিব্যি গুড়গুড়িয়ে তার মুখর আর নাকের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—যেন ইডেনগার্ডেন-এ হাওয়া খাচ্ছে।

হাত নেড়ে হরিদাস মাছিটাকে তাড়িয়ে আবার ঘুমোবার উদ্যোগ করল।

কিন্তু মাছিদের মতো এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রাণী সংসারে আর নেই। যতবার তাড়াও—ততবার ঠিক ঘুরে ফিরে সেইখানটিতেই এসে বসবে। যদি একবার তার মনে হয় যে, তোমার কানের মতো উৎকৃষ্ট বসবার জায়গা দুর্লভ, যতই বাধা দাও—বার বার তোমার কর্ণটি প্রদেশই আক্রমণ করতে থাকবে, ভুলেও নাসিকের দিকে পা বাড়াবে না। তার ওপর আবার নীল মাছি, যেমন তার বোঁ করে আওয়াজ—তেমনি তার শূয়োরর মতন গোঁ। লম্বমান হরিদাসের নাক মুখ থেকে সমানে আম-কাঁঠালের যে আকুল-করা গন্ধ আসছে—সেখান থেকে তাকে নড়ায় কার সাধ্যি!

অতএব একটুখানি ঘুরপাক খেয়েই আবার মাছিটা এসে তার নাকের ডগায় বসল। একটুখানি কাঁঠালের রস শুকিয়ে ছিল সেখানে, কুটুস্ করে ছোট্ট একটি কামড় বসিয়ে ছিল।

—আঃ, জ্বালালে—

হরিদাসের হাতখানা তীরের বেগে তার দিকে এগিয়ে আসতে সে বীরের মতো রণে ভঙ্গ দিয়ে একটা জলের গ্লাসের কানায় গিয়ে বসল। এবং এক মিনিট পরে হরিদাস যেই আবার হাঁ করে 'ফর্‌র্ ফোঁ' বলে আওয়াজ ছেড়েছে, অমনি উড়ে এসে তার ঠোঁটে বসল আর শুঁড় নেড়ে নেড়ে ল্যাংড়া আমের সন্ধান করতে লাগল।

—তবে রে রাস্কেল মাছি!

এক লাফে হরিদাস উঠে বসল আর নীল মাছিও সঙ্গে সঙ্গে পাশের টিপয়ে সেই কাঁচের গ্লাসে গিয়ে আশ্রয় নিলে!

—তোমার ভিরকুটি আমি ভাঙছি—বলেই হরিদাস ধাঁ করে একটা চড় হাঁকড়ে দিলে গ্লাসটার দিকে।

মাছি অক্ষত শরীরে উড়ে পাখার রেগুলেটারে গিয়ে বসল, আর ঝনাৎ! গ্লাসটা টিপয় থেকে মেজেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল—জলের স্রোত বইল ঘরময়।

—আরে ছি-ছি, একি হল!

গ্লাসটা গেল, বড়দার শখ করে কেনা বিলিতি কাচের গ্লাস—বিস্তর দাম। ওদিকে জলথই থই। শীতলপাটিটাও ভিজে একাকার! কোথায় পঁচিশটা আম আর একটা কাঁঠাল খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো—তার বদলে এখন কাচ কুড়োও, ঘর পরিষ্কার করো বসে বসে।

—স্টুপিড, ইডিয়ট, মাছি!

হরিদাস যতক্ষণ গৃহকর্ম করতে লাগল, ততক্ষণ রেগুলেটারে বসে দুটো বড়ো বড়ো গোল চোখ মেলে মাছি তাকে পর্যবেক্ষণ করে চলল। বেশ ভালোই লাগছিল তার—বেশ করে হাত পা চেটে নিয়ে আবার নূতনভাবে আক্রমনের মতলব আঁটতে লাগল।

ঘর সাফ করে হরিদাস এবার খাটে এসে শুয়ে পড়ল। অতগুলো আম আর একটা কাঁঠাল—পেটটা যেন ফুলে ফুলে উঠতে চাইছে। তার ভেতর আবার এই পণ্ডশ্রম—ওঃ! হরিদাস একটা হাই তুলল, আবার চোখ বুজল তারপরে! তৎক্ষণাৎ আবার বোঁ-ও-ও—এবং জেট বিমানের মতো নীল মাছিটা এসে অবতীর্ণ হল তার গালে।

—তবে রে—

হরিদাস এবার ধাঁ করে একটা পেল্লায় চাঁটি হাঁকড়ালো। হাতের ফাঁক দিয়ে নীল মাছি নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গেল আর চড়টা এসে বাজের মতো নামল তার নিজের গালে। জিমনাস্টিক

www.boiRboi.blogspot.com

করা হাতের চড়, চোয়ালের দুটো দাঁত নড়েই গেল বলে বোধ হল। আর পাক্কা তিন মিনিট ধরে মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল হরিদাসের।

উঠে বসে হরিদাস মাছিটাকে লক্ষ্য করতে লাগল—ওই যে—ওই তো!

ঘরের আলোটার নীল রঙের শেড্‌টার ওপর বেশ করে জাঁকিয়ে বসেছে।

—দাঁড়া, দেখাচ্ছি।

দেওয়ালের পাশ থেকে খন্তাটা তুলে নিয়ে ধপাশ করে এক ঘা।

—বাপরে মা-রে, একটুর জন্যে বেঁচে গেছিরে—মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে ওঠে মাছিটা। বোঁ করে একেবারে ছাত বরাবর পৌঁছে গেল! আর আলগা করে লাগানো শেড্‌টা তক্ষুনি দু টুকরো হয়ে খসে পড়ল নীচে। একটা মেজেতে পড়ল ঝনাৎ করে আর একটা হরিদাসের মাথায় পড়ল ঠনাৎ করে!

ভাগ্যিস এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ছিল—নইলে কেটে রক্তগঙ্গাই হয়ে যেত।

হরিদাস লাফাতে লাগল। আচ্ছা ধড়িবাজ তো এই মাছিটা? ওর জন্য কাচের গ্লাসটা গেল, আলোর শেড ভাঙল, নিজের গালে একটা নিদারুণ চড় পড়ল আর অল্পের যন্যে রক্তারক্তির হাত থেকে রেহাই পেল মাথাটা। দাঁতে দাঁত ঘষে হরিদাস বললে, দাঁড়াও, একবার যদি ধরতে পারি—ধরা দেবার জন্যেই যেন মাছিটা সাঁ করে নেমে এল আর হরিদাসের কানের পাশ দিয়ে বাঁই করে বেরিয়ে গেল। তক্ষুণি আঁই আঁই করে হরিদাস তাকে ধরবার জন্যে শূন্যে লাফিয়ে উঠল।

লাফিয়ে উঠল এবং মেজেয় নামল। কিন্তু মেজেতে ঠিক সোজা হয়ে নামল না। গ্লাসের জলে চকচকে মেজেটা খানিক পিছল হয়ে ছিলই, সুতরাং পা হড়কে একেবারে চীৎপটাং। পায়ের লাথি গিয়ে লাগল ঘরের কোণের আলনাটায় সেটা এসে হরিদাসের ঘাড়ে পড়ল। সেই সঙ্গে পড়ল মণখানেক শাড়ি-জামা-বর্ষাতি-ছাতা-লাঠি—সব মিলে হরিদাসের মনে হল যেন গোটা বাড়িটাই তার পিঠের ওপর নেমে এসেছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধস্তাধস্তি করে জামা-কাপড়-লাঠি-ছাতার তলা থেকে বেরিয়ে এল হরিদাস। তখন তার মাথার ওপর জয়ধ্বজার মতো একটা মোজা ঠায় বসে আছে।

আর মাছিটা?

সে এতক্ষণ রুম-এরিয়ালে বসে পরম পুলকে হরিদাসকে দেখছিল। আর মনের আনন্দে অনেকগুলো পা চেটে নিচ্ছিল পর পর। হরিদাসও তাকে দেখতে পেলো এবং খন্তাটা তুলে নিয়ে আবার ভীম বেগে এক ঘা বসিয়ে দিল। খন্তার মাথাটা অনেকখানি চওড়া এবং সেটা যে দস্তুরমতো বিপজ্জনক, প্রথম বারের অভিজ্ঞতাতেই মাছি সেটা বুঝে নিয়েছিল। কাজেই হরিদাস খন্তা তুলতেই সে বোঁ করে একটা গোঁৎ খেলো। আর খন্তার ঘায়ে এরিয়ালটার একদিকে খুলে গিয়ে সেটা চাবুকের মতো হরিদাসের পিঠে এসে পড়ল!

—উঃ, গেছি, গেছি—

পুরো দু মিনিট হাহাকার করে হরিদাস যখন ধাতস্থ হল, তখন তার মাথায় দস্তুরমতো খুন চেপেছে। এবার যা হোক একটা কিছু ঘটে যাবে। এসপার কিংবা ওসপার! এই দিল্লীর সিংহাসন—অর্থাৎ এই ঘরে দুজনের জায়গা হতে পারে না। হয় আমি থাকব, নইলে ওই নীল মাছিটা। কিন্তু, যেহেতু এটা আমার পৈতৃক ঘর সেজন্যে আমাকেই থাকতে হবে এখানে। আলবাত্!

কানের কাছ দিয়ে আবার বোঁ করে বেরিয়ে গেল মাছিটা। যেন ঠাট্টা করেই গেল ওকে।

বটে—বটে!

এবার আর ঊর্ধ্বলোকে নয়—খন্তাটা ভারী বিপজ্জনক জিনিস।

মাছি এবারে সোজা খাটের তলায় গিয়ে ঢুকল।

—আচ্ছা—আচ্ছা, আমিও আসছি—

হামাগুড়ি দিয়ে নীচু খাটটার তলায় ঢুকে পড়ল হরিদাস। আর অমনি কোত্থেকে মাছি এসে তার মুখে পড়ল।

—এত বড় সাহস। এমন ধাষ্টামো!

উত্তেজিত হয়ে হরিদাস মাছিকে খাবা বসাতে গেল। কিন্তু জায়গাটা যে নিতান্তই খাটের তলা এবং সেখানে যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়, এই কথাটাই তার খেয়াল ছিল না। মাছি সোঁ করে চম্পট দিল আর হরিদাসের মাথাটা দড়াম করে ঠুকে গেল খাটের সঙ্গে। যেন দেড় মণ একটা হাতুড়ি দিয়ে কে তার মাথায় গা বসিয়ে দিল।

—উ-রেঃ বাপ—

চোখে রাশি রাশি সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে হরিদাস খাটের তলায় ভিরমি খেল। যখন বেরিয়ে এল, তখন মুখে ঝুল, চুল ভরতি জাজিমের ধুলো আর তালুর উপর ঠিক একটা বেলের মত ফুলে উঠেছে। রণক্ষেত্রে আহত সৈনিকের মত উলটে-পড়া আলনার জামা-কাপড়ের গাদার ওপর সে বিমর্ষ মুখে বসে রইল।

মাছিটাকে আর দেখা যাচ্ছে না—বোধহয় পালিয়েছে। হতচ্ছাড়া—নচ্ছার—উল্লুক—বোঁ-ও-ও—

আবার—আবার সেই কামান গর্জন।

শত্রুপক্ষ হরিদাসের ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল এবং ঠাকুরদার মস্ত ছবিখানার উপর আশ্রয় নিয়ে একমনে পরিস্থিতিটা লক্ষ্য করতে লাগল।

—ওরে রে পামর!

হরিদাস আবার খন্তা বাগিয়ে হাঁকড়াতে গেল, কিন্তু মাথায় খাটের ঠোক্কর লেগে কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি গজিয়ে উঠেছে তার। মাছিটা যে রকম শয়তান তাতে খন্তা চালিয়ে তাকে বধ করা যাবে কিনা ঘোর সন্দেহ এবং ঘা লেগে ওই পেল্লায় ছবিখানা এসে মেজেয় পড়বে, তা-ও নিঃসন্দেহ। অতএব—

তখন মনে হল মাছি মারার সবচেয়ে সোজা এবং নির্ভুল উপায় হচ্ছে স্প্রে। তার বাইরের বারান্দাতেই তো স্প্রে-টা পড়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য, এতক্ষণ তার খেয়ালই হয়নি? এক লাফে হরিদাস বারান্দায় বেরিয়ে এল। কিন্তু হায়—স্প্রে-টা শুকনো। পাশেই মারকিটের টিনটা—সেটাও ঠনঠন করছে। দুত্তোর!

তেল কিনে আনতে হবে—এবং এক্ষুণি। এর মধ্যে মাছিটা যদি পালিয়ে বাঁচে সে ওর সাত পুরুষের ভাগ্যি। কিন্তু মাছির রকম-সকম দেখে মনে হল, অধিকার করা দুর্গ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কোনো বাসনা আপাতত তার নেই।

—দাঁড়া দুরাত্মা, আমি আসছি—

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডাক্তার গড়গড়ির ফার্মাসিউটিক্যাল স্টোর্স। এখানেই ফ্লিট্-মারকিট-শেলটক্স—অর্থাৎ মশা-মাছি বধের সব রকম অস্ত্রিবান কিনতে পাওয়া যায়। হরিদাস দোকানে ঢুকে পড়ল। গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁ-ঝাঁ করছে। রাস্তায় একটা লোক নাই—শুধু একটা হাইড্রান্টের মুখ দিয়ে যেখানে ঘোলা জল উঠছে, একটা সাদা-কালো নেড়ীকুকুর পেট পেতে শুয়ে আছে তার ভেতরে। গড়গড়ির দোকানও ফাঁকা, আর গড়গড়ির কম্পাউন্ডার জগু কাউন্টারের ওপর একটা তেল চিটচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমাচ্ছে। জগুকে দেখলেই হরিদাসের মেজাজ খিঁচড়ে যায়।

জগুও তাদের জিমনাস্টিক ক্লাবের মেম্বার এবং হরিদাসের চাইতেও জোয়ান। দুবার দুজনে

কুস্তি লড়েছে আর দুবারই জগু হরিদাসকে পটকে ফেলে দিয়েছে।

কিন্তু আসল কারণ সেখানে নয়। হরিদাস মোহনবাগানের ভক্ত জগু ইস্টবেঙ্গলের। এই নিয়ে দুজনের যে কতবার হাতাহাতির জো হয়েছে, তার ঠিকানা নেই। হরিদাস কড়া গলায় ডাকল: এই জগা, একটা মারকিট দে শীগগির। জগু বোধহয় তখন ইষ্টবেঙ্গল আই-এফ-এ শীল্ড পেয়েছে এই রকমের একটা মনোরম স্বপ্ন দেখছিল। সে জাগল না।

—এই জগা, এই হতচ্ছাড়া—জগু সাড়া দিল না।

—জগা শুনছিস? হরিদাস জগুকে ধরে নাড়া দিল। উত্তরে কী যেন বিড় বিড় করে বকতে বকতে জগু পাশ ফিরল। আর তো পারা যায় না। এ তো দেখা যাচ্ছে কৃম্ভকর্ণের চাইতেও সরেশ। ঝুঁটি ধরে হ্যাঁচকা মারলে হয়তো জাগতে পারে কিন্তু জগার গায়ে জোর বেশী, আর কিল-চড়টাও তার ভালোই চলে। কাজেই ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে লাভ নেই। সামনেই তো সারি সারি মারকিটের টিন রয়েছে। একটা আপাতত নিয়ে যাওয়া যাক—বিকেলে এসে ডাক্তার গড়গড়িকে দামটা দিয়ে দিলেই চলবে। হরিদাস একটা টিন ধরে টান মারল।

তক্ষুণি কয়েকটা শিশি-বোতল ছিটকে পড়ল মেজেয়—বিরাট আওয়াজ হল, আর তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল জগু। তারপরেই 'চোর-চোর' বলে একটা আকাশ-ফাটানো হাঁক ছেড়ে সোজা এসে পড়ল হরিদাসের ঘাড়ে। হরিদাস বলতে গেল, জগা—আমি—আমি—! তুমি? তুমি? অরে চোরা—আইজ তোঃ তোরে কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইমু। আমি জগু বোস—আমারে তুই চিনস নাই! আরসে কি কিলের বৃষ্টি। জগা সমানে বলতে লাগল: তরে আমি খাইছি—তরে আমি খাইছি—! একটা পুলিসের গাড়ি তখন রাউন্ড দিতে বেরিয়েছিল। সেটা দোকানের সামনে এসে থামল সেই সময়। তারপর—

তারপর থানা থেকে টেলিফোন পেয়ে টালিগঞ্জ থেকে বড়দা ছুটে এসেছেন এবং হাজত থেকে খালাস করে কানে ধরে হরিদাসকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন। মা কাঁদতে কাঁদতে এসেছেন—সবাই এসেছে, এমন কি পিসিমা পর্যন্ত ভাঙা পা নিয়ে আসতে চাইছিলেন, অনেক কষ্টে ঠেকানো হয়েছে তাঁকে।

পরের ব্যাপারটানা না বলাই ভাল।

কিন্তু আরো একটু বাকী আছে।

বিকেলের ছায়া নেমেছে ঘরে—হরিদাস উদাস হয়ে বসে রয়েছে। ঠাকুরদার ছবির ফ্রেমে আলেকজান্ডারের মতো সেই নীল মাছিটা বসে—রাতের জন্যে আশ্রয় নিয়েছে মনে হয়।

থাকুক বসে—ওর ওপরে হরিদাসের আর রাগ নেই। অনেক দুঃখে সে বুঝেছে ক্ষমাই পরম ধর্ম এবং জীবে প্রেম করার মতো মহৎ কাজ আর কিছু হতেই পারে না। হরিদাসের মন ভাবুক ভাবুক হয়ে গেল। হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে সে গান ধরল—সেই বিখ্যাত কালী কীর্তন। হাঁ করে একটিমাত্র টান—এবং—

এবং টপাত! গানের প্রথম ধাক্কাতেই দিগ্বিজয়ী মাছি ফ্রেম ছেড়ে শূন্য উঠল, তারপরেই বোঁ করে পড়ল হরিদাসের হারমোনিয়ামের ওপর। পড়েই মরল না মরেই পড়ল মাছিটার কাছ থেকে পাকাপাকি কিছু জানা গেল না।

ব্রহ্মাস্ত্র আর কাকে বলে।

www.boiRboi.blogspot.com

একদিনের উপোস

জীবনে কখন যে ইতিহাস রচিত হয়, কোন বস্তুটি যে অকস্মাৎ ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে, আগে থেকে তা চট করে বুঝে নেওয়া শক্ত। পাড়ার এক ভদ্রলোক কবে অল্প বয়সে মাস তিনেক আলুর ব্যবসা করবার চেষ্টা করেছিলেন—সেই থেকেই তিনি 'আলুদা' হয়ে গেলেন—কোনোকালে যে তাঁর নাম ছিল অবনীধর বসুমল্লিক, সে-কথা লোকের আর মনেই পড়ে না। আমার এক দূর-সম্পর্কের মামার দারুণ অ্যালার্জি ছিল বেড়ালে—অর্থাৎ বেড়াল দেখলেই তিনি সেটাকে লাথি মারতে চাইতেন। একদিন অন্ধকার বারান্দায় একটা জল-ভরা প্রকাণ্ড ঘটিকে তিনি বেড়াল ভ্রমে পদাঘাত করলেন, করেই চিৎকার ছেড়ে বসে পড়লেন এবং আজ পর্যন্তও তাঁকে অল্প-অল্প খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরে যিনি সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যে দাড়ি রেখেছিলেন, দেড় বছর পরেই আবার তিনি বিয়ে করলেন, পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন তাঁর জমাট সংসার—কিন্তু দাড়ি সেই থেকে গোকুলে বেড়েই চলেছে। জীবনে এইভাবেই ইতিহাস রচিত হয়ে থাকে।

ছাঁটা চুল, খাড়া নাক, ঘন ঘন নস্যি নেন এবং কথা বলার সময় চোখ পিটপিট করে—এরকম কোনো মাঝবয়েসী লোক দেখলেই যে আমি ভেতরে ভেতরে হিংস্র হয়ে উঠি, তারও নেপথ্যে এইরকম একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার আছে। এই লোকটি গ্রাম-সুবাদে আমার দাদা হন, নানারকম যৌগিক ব্যাপার-ট্যাপার করেন, সাধু-সন্ন্যাসীতে তাঁর গভীর আস্থা, এককথায় আমি তাঁকে অত্যন্ত সাত্ত্বিক ব্যক্তি বলে জানতুম। একদিন সকালে আমার মেসে তাঁর পদধূলি পড়ল। আমি তখন সর্দিতে কাতর হয়ে একটা মাফলার জড়িয়ে বসে ছিলুম—দেখেই তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

'আজ সর্দি, কাল পেটে ব্যথা, পরশু দাঁত-কনকনানি—বেঁচে আছিস কী করে? পঁচিশ বছরেই এই—পঞ্চান্ন বছরে যে বেঘোরে মারা যাবি।'

তাতে আমারও সন্দেহ ছিল না। অতএব করুণ সুরে জানতে চাইলুম, কী করে পঞ্চান্ন বছরের এই ফাঁড়াটা আমি কাটিয়ে উঠতে পারি।

দুই নাকে প্রায় আড়ঙ্গ দেড়েক নস্যি পুরে, তিনি 'নয়ে-লয়ে' একাকার করে প্লুতস্বরে বললেন, —'ফাস্‌টিং—ফাস্‌টিং—মানে বাংলায় যাকে বলে উপোস। এইজন্যেই তো আমাদের ভারতবর্ষে একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যার ব্যাপার-ট্যাপারগুলো ছিল। তোকে আমি পাঁজি মাফিক একাদশী-টশী করতে বলছি না—তবে মঝে মাঝে ফাস্‌টিং করবি। প্রথমে—এই ধর্ মাসে একদিন, তারপর হপ্তায় একদিন, তারপর হপ্তায় দু'দিন হলেও দেখবি কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। আমাকে দেখছিস তো—কি রকম লোহায় তৈরী শরীর। আমি তো হপ্তায় তিন দিন পর্যন্ত—'

চোখের সামনে ফাস্‌টিং-এর এই জলজ্যান্ত মূর্তিটিকে দেখে—ভারতীয় খাদ্যসমস্যার এমন আশ্চর্য সহজ সমাধানের কথা শুনে আমি তৎক্ষণাৎ অনুপ্রাণিত হলুম। দাদা চলে যাওয়া মাত্র স্থির করলুম—শুভ-সংকল্পে বিলম্ব করতে নেই, তাছাড়া কাল অফিস ছুটি আছে—কালকেই আমার ফাস্‌টিং-এর উদ্বোধন করব।

পরদিন সকালে মেসের ম্যানেজারকে গিয়ে জানালুম, আমি উপোস করব।

'উপোস করবেন? কেন? কালীঘাটে হত্যে দিতে যাচ্ছেন নাকি?'

'না-না, ওসব কিছু নয়। এমনিই উপোস করব।'

'এমনিই?'—ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন: 'বলেন কি! আজ যে আবার তেতলার গৌরবাবু নিজের টাকায় স্পেশ্যাল ফীস্ট দিচ্ছেন মশাই!'

শোনবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল। এই গৌরবাবু দিল্লীতে বড়ো একটা চাকরি পেয়েছেন, ক'দিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছেন তা-ও শুনেছিলুম, কিন্তু আজই তাঁর স্পেশ্যাল ফীস্ট! বেছে বেছে ঠিক আজকের দিনেই! উপোসের সূত্রপাতেই এমন মর্মভেদী দুঃসংবাদ কে কল্পনা করেছিল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার বললেন, 'আমি বলি কি মশাই, উপোসটা বরং কালই করুন। এমন খাঁটি ছেড়ে—'

যেটুকু দুর্বলতা আসছিল, 'খাঁটি' শব্দটা অত্যন্ত ভালগার হয়ে কানে লাগতেই আমি তৎক্ষণাৎ সেটাকে বিদায় করে দিলুম। আমি কি পেটুক, না জীবনে ভালোমন্দ কখনো কিছু খাইনি? আত্মমর্যাদায় টান-টান হয়ে ভাবলুম, আজই আমার উপোসের শ্রেষ্ঠ দিন—আজই আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে তুচ্ছ মাংস-পোলাও-রাবড়ী-রসগোল্লার অনেক ঊর্ধ্বে আমার অবস্থান। কড়া গলায় বললুম, 'না, আজই আমায় উপোস করতে হবে—ইট ইজ সেট্‌লড্!

'সেটল্‌ড্! তবে যা ইচ্ছে করুন।'

সংকল্পে কঠিন হয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়া গেল। এখন পরিপূর্ণ নৈষ্কর্ম্যযোগ। উপোস করলে বোধ হয় গীতা-টীতা পড়তে হয়, কিন্তু আমার ঘরে ওসব কিছু ছিল না—অগত্যা পড়ে-ফেলা খবরের কাগজটা থেকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাত্র-পাত্রী চাই, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ, বাড়ি-জমি এবং চালু কারখানা বিক্রয়—এইসব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে লাগলুম।

কিন্তু বেশিক্ষণ আত্মস্থ থাকা গেল না! একটু পরেই সমস্ত বাড়িটা মাংস-পেঁয়াজ-ঘি-মশলার এমন অনির্বচনীয় সুরভিতে ভরে উঠল যে, পাত্র-পাত্রী সংবাদের রহস্যভেদ করেও আমার সব শিরা-স্নায়ুতে শিহরণ জাগল। পরিষ্কার বুঝতে পারলুম এ সেই পৌরাণিক যুগের চক্রান্তের মতো, সবটাই আমার তপস্যাভঙ্গের আয়োজন! আর বেশিক্ষণ এর মধ্যে থাকলে আমার অনিবার্য চিত্তবিকার—এবং, এখনো তো ডেকচিতে পোলাও-এর উর্বশী নৃত্য শুরুই হয়নি।

শুধু উঠে পড়লুম না—প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে গেলুম। 'হেথা নয়—অন্য কোনোখানে' কোথায়? কেন—ইডেন গার্ডেন। সেখানেই তো কলকাতার বানপ্রস্থ!

গাছের ছায়ায় বসে কিছুক্ষণ ভাবুকের মতো কাটানো গেল। বেশ বেলা হয়েছে, সামনে দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে চলে যাচ্ছিল দু'চারজন, অর্থাৎ খেয়েদেয়ে বেশ ভরা পেট নিয়ে বেরিয়েছে। আমিও একটা নিদারুণ চনমনে খিদে টের পাচ্ছিলুম, কিন্তু প্রাণপণে সেটাকে ভুলবার চেষ্টায় সামনের গাছে কাকের বাসা-বাঁধা দেখতে লাগলুম। আর তাই দেখতে দেখতে নিজের ভেতরে বেশ একটা নিবিড় সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হল। মনে হল, চারদিকের এইসব স্থূল উদরসর্বস্ব মানুষের চাইতে আমি কত আলাদা—ভাত-ডাল মাছ-মাংস দিয়ে এরা যখন নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজন মেটাচ্ছে, তখন সংযমের কী সমুচ্চ শিখরে,কী গভীর প্রশান্তি নিয়ে আমি বসে আছি। এইভাবেই মানুষের আত্মিক সমুন্নতি ঘটে থাকে। দাদার ওপর আমার কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল।

এই অধ্যাত্ম-পুলকে এবং খিদের তাড়াতেও খুব সম্ভব, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমটা ভাঙল দারুণ এক গন্ধের চমকে।

রেলিং-এর ওপারে, একটা তোলা উনুনে কতগুলো শস্তার ডিম কিনে তেলের ওমলেট ভাজছে একজন, কিছু খরিদ্দারও জড়ো হয়েছে তার। এ দৃশ্য আরো অনেকবার আমি দেখেছি,

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু আমার রসনা কোনোদিন রসায়িত হয়নি। আজ দুপুরের গরম বাতাসে আমার মনে হল—এমন তীব্র এমন সর্বনাশা সুগন্ধ জীবনে আমি কখনো পাইনি—আমার পেটের ভেতরে মুহূর্তে যেন একপাল দুর্ভিক্ষের ইঁদুর নাচতে শুরু করে দিয়েছে।

না—বানপ্রস্থও চলল না। আমি আবার পালালুম।

কিন্তু কোথায় পালাব? সারা কলকাতা আজ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। কেউ চীনেবাদাম চিবুচ্ছে কড়মড়িয়ে, কেউ আখের রসে চুমুক দিয়েছে, কেউ ফুচকার স্বাদে মশগুল। রেস্তোরাঁ থেকে সব আশ্চর্য অপরূপ গন্ধ, ফিরিওয়ালার ফুটন্ত আলুর দমে যেন একটা ক্রূর জিঘাংসা—এত মিষ্টির দোকান যে চারদিকে ছড়িয়ে—তাই বা কে জানত। আজ আমি একটি পরিষ্কার সত্যকে আবিষ্কার করলুম—গোটা কলকাতার একটি মাত্রই কাজ—সে খেয়ে চলেছে, খেয়েই চলেছে—

উপোসের গৌরবে ক্ষত বিক্ষত হয়ে টলতে টলতে মেসে ফিরলুম রাত ন'টায়। তেষ্টায় ক্লান্তিতে জ্বলতে জ্বলতে সে রাত বোধ হয় শেষ হল আটত্রিশ ঘন্টা পরে। ভোরে উঠে চা খেতে যাব, হঠাৎ হড় হড় করে একরাশ পিত্তি বমি হয়ে গেল, তেতো স্বাদে ভরে উঠল মুখটা।

কোনমতে উঠে দাঁড়িয়েছি, সামনে সেই দাদা।

'কিরে, বমি করছিস কেন? কি হল আবার?'

মাথা ঘুরছিল, তবু আত্মপ্রসাদে উজ্জ্বল হয়ে বললুম, 'কাল সারাটা দিনরাত নিরম্বু ফাস্‌টিং করেছি দাদা, তাই—'

'নিরম্বু ফাস্‌টিং! দাদা চমকে উঠলেন : 'তুই পাগল নাকি রে। কি বললুম, কি বুঝলি। ফাস্‌টিং মানে—এই ধর কিছু লুচি, দুটো তরকারী—চারটে মিষ্টি—রাত্রে পরোটা, একটু কোর্মা-টোর্মা—'

আর বলতে দিলুম না। চিৎকার করে জানালুম : 'গেট আউট—গেট আউট—বেরোও বলছি—'

সেই থেকে, ছাঁটা ছাঁটা চুল, খাড়া নাক, কথা বলার সময় চোখ পিট পিট করে, আর ঘন ঘন নস্যি-নেওয়া মাঝবয়েসী কোনো লোককে দেখলেই আমি অকারণে হিংস্র হয়ে উঠি। জীবনে এইভাবেই ইতিহাস রচিত হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী

ময়নাটার ওপর বাড়িশুদ্ধু সবাই চটে উঠেছে।

কেনা হয়েছে প্রায় তিনমাস আগে। বেশ বড়োসড়ো হয়েছে এর ভেতরে, তেল চকচকে হয়েছে চেহারা। খাওয়ার ব্যাপারেও পাখিটার প্রচুর উৎসাহ। বাটিভর্তি ছোলার ছাতু মেখে দিতে না দিতে তিন মিনিটেই সাবাড়।

www.boiRboi.blogspot.com

তা ভালো থাকদাক, মোটা হোক—তাতে কে আর আপত্তি করতে যাচ্ছে। কিন্তু কথা বলবার ব্যাপারে তার এতটুকুও উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। গলা দিয়ে তার একটি মাত্র আওয়াজই বেরুচ্ছে—চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ! এবং ওই ডাক শুনলেই বোঝা যাবে তার খিদে পেয়েছে—তারো কিছু ছাতু তাকে মেখে দেওয়া হোক।

ওই-কথাটাই যদি বলতে পারে, মানে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করতে পারে : 'ছাতু দাও'—তা হলেই তো কোথাও কোনো ঝামেলা থাকে না। কিন্তু তার ধার দিয়েই নেই ময়নাটা। ভাবটা যেন হনোলুলু কিংবা সেনিগেম্বিয়া থেকে এসেছে—বাংলাটা তার রপ্ত হচ্ছে না কোনোমতেই।

অথচ চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

ভোর ছ'টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সবাই তাকে পড়াতে চেষ্টা করছে।

—ডাক : খোকন—খোকন—বল্ : বাবলু—বাবলু—

—হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ

—বলো, মা ছাতু দাও, জল দাও—

কেউ বা সমানে চুঁ চুঁ করে শিস টানছে।

ময়না ঘাড় কাত করে সব শোনে—দারুণ মনোযোগী ছাত্রের মতোই। ভাবখানা এমন যে সব সে সঙ্গে সঙ্গে মুখস্ত করে ফেলল, এখন পড়া ধরলেই টকাটক বলে যেতে পারবে। ব্যাস—ওই পর্যন্তই। তারপরেই চাঁছাছোলা গলায় একেবারে আদিম অকৃত্রিম চিৎকার ছাড়ল : চ্যাঁ—চ্যাঁ—চ্যাঁ—

তিন মাস ধরে চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত তিত-বিরক্ত হয়ে গেল সবাই। তখন কোথায় হরেকৃষ্ণ, কোথায় শিস; কোথায় খোকন, কোথায় বাবলু। যেই চেঁচিয়ে ওঠে, অমনি কেউ বলে ওঠে : দূর হ আপদ—দূর হ।

শেষ পর্যন্ত কমিটি বসল বাড়িতে। কী করা যায় ওটাকে নিয়ে? যখন মনে হচ্ছে, কোনদিন ও ডাকবে না। মাঝখান থেকে প্রত্যেকদিন ওকে ছাতুর পিণ্ডি গিলিয়ে লাভ কী? এই তিন মাসে কমসে কম দশ টাকার ছাতু খেয়ে বসে আছে।

কাকা বললেন, খাঁচা খুলে তাড়িয়ে দাও ওটাকে।

বাবলু আপত্তি করল : না—না, উড়তে পারবে না হয়তো। শেষে বেড়ালে ধরে খেয়ে নেবে।

কথাটা মিথ্যে নয়। বাড়ির বেড়াল টুনির বেশ নজর আছে পাখিটার ওপর। প্রায়ই খাঁচার তলায় বসে মুখ উঁচু করে খুব করুণ সুরে ডাকাডাকি করে থাকে। ভাবটা এই : কেন খাঁচার মধ্যে বসে কষ্ট পাচ্ছ ভাই? বেরিয়ে এসো, আমার পেটে জায়গা করে দিই—দিব্যি আরামে থাকবে।

তখন বাবা বললেন, তাহলে পাখিওলা আসুক। তাদের হাতে ওটাকে দিয়ে দাও।

পাখিওলা প্রায়ই যায় পথ দিয়ে। কিন্তু প্রস্তাবটা সকলের মনে থাকলেও ময়নাটাকে কেউ আর বিদেয় করে না। আসল কথা, ছাতু খাওয়াতে খাওয়াতে গা জ্বালা করলেও কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে সকলেরই। দেখলে গা জ্বালা করে, আবার তাড়িয়ে দেবার কথা ভাবলেও কষ্ট হয়। আছে সখন—থাক। বাড়িতে বেড়ালটাও যখন এক মুঠো খেতে পায় তখন ওটাও না হয় খেলো ছটাক খানেক ছাতু। পূর্ব জন্মের বোধহয় দেনা ছিল ওর কাছে—সেইটেই শোধ করে নিচ্ছে এইভাবে।

আরো মাসখানেক গেল। ময়নাটা ছাতু খায় আর চেঁচায়। সেই একটি মাত্র ডাক : চ্যাঁ-চ্যাঁ-চ্যাঁ!

—দূর হ মুখপোড়া লক্ষ্মীছাড়া পাখি। আপদ কোথাকার।

এই সময় বাবা একদিন পাখিওলা ডাকলেন। ময়নাকে বিদায় করতে নয়, নতুন পাখি কেনবার জন্যে।

এবার আর ময়না নয়—টিয়াই কেনা হল বেশ দেখেশুনে।

—কি হে, ডাকবে তো? মানে কথাটথা বলবে তো?

—ডাকবে বইকি বাবু। খুব ভালো জাতের পাখি।

—সবাই ওই কথা বলে, মা মুখ ভার করলেন, এই তো চারমাস আগে একজন একটা ময়না গছিয়ে দিয়ে গেছে। একটা বুলিও তার মুখে ফোটে নি, কেবল চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে।

পাখিওলা উঁচুদরের হাসি হাসল। বললে, এ লাইনে অনেক জোচ্চোর আছে বাবু, ভদ্দরলোকদের ঠকিয়ে দিয়ে যায়। তাই মানুষ চিনে কিনতে হয়।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই যে সেই ভালো লোক, তা বুঝব কী করে? সেই ময়নাওলাই এসব অনেক শুনিয়েছিল আমাদের।

—দেখে নেবেন বাবু। পরে বলবেন, কী জিনিস দিয়েছি। বলে পাখিওলা খুব কায়দা করে চলে গেল।

তখন টিয়াটাকে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল ময়নার খাঁচার পাশেই। মা বললেন, মুখপোড়া ময়না দেখে নে। এবার থেকে ওকেই ছাতুকলা সব খাওয়ার, তুই হাঁ করে থাকবি। কাকা বললেন, দ্যাখো বাপু টিয়া, খুব সাবধান। ওই ময়নার কুসংসর্গে যেন পড়ো না। আর দু-মাসের মধ্যে যদি কথা না বলো—তা হলে একসঙ্গে ল্যাজ কেটে দুটোকেই বিদায় করে দেব।

ময়নাটা এতক্ষণ একমনে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টিয়াটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল। হঠাৎ—হঠাৎ সেই পরমাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল।

টিয়াটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ময়না—না—চ্যাঁ-চ্যাঁ করে উঠল না। তার বদলে, পরিষ্কার মোটা গলায় যেন টিয়াটাকে সম্ভাষণ করেই সে বললে, দূর হ আপদ—দূর হ।

হলদে বাস

আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল মস্ত পাঁচিল দেওয়া একটা মাঠ আর সেই মাঠের শেষে ছিল হরিশ খাজাঞ্চীর বাড়ি। হরিশ খাজাঞ্চী লোকটা ছিল এত কৃপণ যে সকালবেলায় তার নাম শুনলে সবাই বলত, আজকে আর খাওয়া জুটবে না। আমরা কেউ কখনো ও বাড়িতে সরস্বতী পুজোর চাঁদা পর্যন্ত চাইতে যেতুম না—কেবল সেই চোরকাঁটায় ভরা মাঠটায় একটা তিন নম্বর ম্যাকগ্রেগর ফুটবল নিয়ে সিক্স-এ-সাইড ফুটবল ম্যাচ খেলতুম। আর চার ফুট ছ' ইঞ্চির ম্যাচে কেউ কোমরে দু-দুটো বেল্ট এঁটে বেঁটে হয়ে এলে তাই নিয়ে মধ্যে মধ্যে খুব ঝগড়াঝাঁটি হয়ে যেত।

কিন্তু হরিশ খাজাঞ্চী কিংবা ফুটবল ম্যাচের কথা বলছি না। পুব দিকের গোলপোস্টের পাশ দিয়ে বল মারলে সেটা প্রায়ই একটা ভাঙা মোটরের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেত। সেইটে ছিল ফটিক মিস্ত্রির কারখানা।

খাজাঞ্চী বাড়ির মাঠের পাঁচিলের গায়ে দুখানা টিনের ঘর তুলে কারখানা তৈরি করেছিল ফটিক মিস্ত্রি। কতদিন ধরে সে এই কারখানা চালাচ্ছে আমি জানি না, বাবা মাত্র দুবছর আগে এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। সেই থেকেই আমি ওকে দেখছি। রঙ কালো—মানুষের গায়ের রঙ যে অত কালো হতে পারে এর আগে আমি তা কখনো দেখিনি। মাথার চুলে ছাইয়ের মতো প্রলেপ পড়েছে একটা, অর্থাৎ বয়েস পঞ্চাশের সীমা পেরিয়েছে। বেঁটেখাটো জোয়ান চেহারা, গায়ে তেলকালি মাখা খাকী হাফশার্ট। অত কালো রঙের ভেতরে হাসিমাখা দাঁতগুলো আর বড়ো বড়ো চোখ দুটোকে তার অদ্ভুত শাদা দেখাত।

আমরা এখানে এসে বাড়ি ভাড়া নেবার পর বাবা ওর কী যেন উপকার করেছিলেন, আমার সেটা জানা নেই। কিন্তু ফটিক মিস্ত্রি আমাকে খুব ভালোবাসত। বিকেলে ওর ওখানে কোনোদিন গেলেই অ্যাসিস্ট্যান্ট অজিতকে ডাক দিয়ে বলত, এই, শিগগীর যা—রঞ্জুর জন্যে মহাবীরের ওখান থেকে দু পয়সার আলুর দম নিয়ে আয়।

আমি একটা বেতের মোড়ায় বসে চারটে বড়ো বড়ো ঝাল-ঝাল শুকনো আলুর দম খেতুম শালপাতায় করে। আর ফটিক মিস্ত্রির কাজ দেখতুম।

কী না করত ফটিক মিস্ত্রি। কখনো একটা মোটর গাড়ির বনেট খুলে ফেলে কী সব খুটখুট করত, কখনো একটা বুড়ো ঝরঝরে বাসের তলায় এক টুকরো সতরঞ্চি পেতে অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে থাকত—যখন বেরিয়ে আসত তখন মুখভর্তি কালি। আবার কখনো দেখতুম বাসের গায়ে পুরু করে রঙ দিচ্ছে, তাপিন তেলের গন্ধে ভরে গেছে চারদিক। সেই রঙ শুকিয়ে গেলে তুলি দিয়ে কখনো লাল কিংবা কখনো নীল হরফে লিখছে 'স্বপনতরী' কিংবা 'চলার পথে'। ওগুলো সব বাসের নাম। আবার হাতুড়ি-বাটালি নিয়ে কাঠের কাজ করত—অর্থাৎ বডি তৈরি হত বাসের।

এক কথায় সব। মোটর মেকানিক, রঙের কারিগর, ছুতার মিস্ত্রী। অ্যাসিস্ট্যান্ট অজিত সাহায্য করত বটে, কিন্তু আসল খাটা-খাটনির কাজ ছিল ফটিকেরই। রাস্তার ওপারেই আমরা থাকতুম—খুব ভোরে উঠে পড়তে বসার আগেই শুনতে পেতুম মিস্ত্রির কারখানায় লোহার উপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে ঠনাৎ ঝন্—ঠনাৎ ঝন্। আবার রাত্তিরে দুচোখে ঘুম নিয়ে শুতে যাওয়ার সময় আবছা ভাবে দেখতে পেতুম ফটিকের কারখানা কারবাইড ল্যাম্পের আলোয় উজ্জ্বল-নীল হয়ে আছে (আমাদের শহরে তখন ইলেকট্রিকের কোন বন্দোবস্ত ছিল না)। আর তখনো সেখান থেকে খুটখুট ঠুনঠুন করে আওয়াজ উঠছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতুম, আমাদের এই দোতলা বাড়িটার চাইতেও অনেক বড়ো একটা অন্ধকার বিশাল মোটর বাসের এঞ্জিন খুলে কোথায় যেন দমাদম করে হাতুড়ি ঠুকছে ফটিক মিস্ত্রী, ঠিকরে উঠছে ফুলকি—আকাশে ছিটকে গিয়ে সেগুলো তারা হয়ে জ্বলছে।

আমাদের শহরে এক রাজা ছিলেন। কেল্লার মতো তাঁর বাড়ি। সেখানে গোলাপের বাগান ছিল, জাদুঘর ছিল, শ্বেত পাথরের মস্ত ঠাকুর বাড়িতে সোনা রুপোর সিংহাসনে থাকতেন রাধাগোবিন্দ, রাজার নিজের ডায়নামোতে রাজবাড়ি আর আশেপাশে মাইলখানেক জুড়ে ইলেকট্রিক জ্বলত। আর তাঁর তিন-চারখানা মোটর গাড়ি ছিল।

রাজবাড়ির গাড়িগুলো বাদ দিলে আমাদের শহরে বোধহয় সব মিলিয়ে আর খান সাতেক গাড়ি ছিল। তার মধ্যে দু-একখানা চলবার সময় একটানা ভট্ ভট্ করে আওয়াজ তুলত, ঝড়ের মুখে খোড়ো দোচালার মতো থরথর করে কাঁপত হুড, ধুলোয় অন্ধকার করে দিত আর রাস্তার

www.boiRboi.blogspot.com

কুকুরেরা চিৎকার করে তাদের পিছু নিত। তাছাড়া 'স্বপনতরী', 'চলার পথে' এই সব খানকয়েক বাস ছিল, তাদের গায়ে লেখা থাকত 'মুকুন্দপুর হইতে ঘোষদীঘি'।

কিন্তু লক্কড় পুরোনো মোটর, ঘোষদীঘির বাস কিংবা রাজবাড়ির তিন চারখানা গাড়ি আর একটা প্রাইভেট বাস—সকলকেই আসতে হত ফটিকের কাছে। শহরে সে একাই ছিল একাধারে মোটর-মেকানিক, রঙের কারিগর, আর ছুতার মিস্ত্রী।

হাত একটু ফাঁকা হলে ফটিক গল্প করত আমার সঙ্গে।

—তুমি বড়ো হয়ে একটা মোটর গাড়ি কিনো খোকাবাবু।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যেতুম। বড়ো হলেই যে-কোন অসাধ্য সাধন করে ফেলা যায়, এইটেই নিশ্চিত ধারণা ছিল তখন। আমি বলতুম, কিনব।

—নিশ্চয়। গাড়ি তো গাড়ি—মোটর মাড়ি। সঙ্কলের রাজা। এসব ঘোড়ার গাড়ি-ফোড়ার গাড়ির দিন তো ফুরিয়ে এল। দুদিন পরে একেবারে ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

—ঠিক।

ফটিক একটা বিড়ি ধরিয়ে একটু চুপ করে থাকত, তারপর আবার বলত, মোটর গাড়ি কেবল কিনলেই হয় না। তাকে যত্ন করতে হয়, সেবা করতে হয়। নিজের ছেলের মতো কিংবা মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো। নইলে পয়সাও যায়—গাড়িও থাকে না।

—সে তো নিশ্চয়।

ফটিক আঙুল বাড়িয়ে বলত, এই দ্যাখো না রাজবাড়ির গাড়ি সব। হড্‌সন, চেভ্রলেট্, (পরে শুনেছিলুম উচ্চারণটা শেভ্রোলে), দামী দামী ফোর্ড। কিন্তু কী অবস্থা করেছে তাদের। ভালো করে ধোয় না, দরকার মতো মবিল পড়ে না, আনাড়ী ড্রাইভার বেপরোয়া হয়ে গাড়ি চালায়—স্প্রীঙের দফা রফা করে দেয়। যে গাড়ি চোখ বুজে বিশ বছর চলত, দু বছরেই তার পরমায়ু শেষ।

—ভারী অন্যায়।

ফটিক বিড়িতে ঘন ঘন টান দিয়ে শেষ করে আনত। তারপর আবার বলত, এক এক সময় যখন গাড়ি নিয়ে আসে, তখন যে আমার কত কষ্ট হয় সে আর তোমায় কী বলব! ইচ্ছে করে একবার রাজাবাহাদুরের কাছে গিয়ে বলি, হুজুর—কেবল পয়সা বলে নয়, এমন সুন্দর জিনিসগুলোকে এভাবে হেলায় ছেদ্দায় নষ্ট করতে কি আপনার মায়া হয় না? আপনার সাধের গোলাপ বাগানে ঢুকে কেউ যদি সমস্ত দামী গাছগুলোকে বাগানছাঁটা কাঁচি দিয়ে কচকচিয়ে কেটে দেয় তা হলে আপনার কেমন লাগে? এভাবে এদের নষ্ট না করে একখানা বরং আমায় বখশিস করেই দিন—দেখিয়ে দেব গাড়ি কেমন চলে—কতদিন চলে।

ফটিক মিস্ত্রীর দীর্ঘশ্বাস পড়ত।

কোনদিন বা গাড়ির বনেট খুলে নিজেই দেখাত আমায়।

—দেখেছ অবস্থা? ভেতরে কী ধুলোটাই জমেছে। একটু ঝেড়ে-ঝুড়েও রাখতে পারে না? কিংবা:

—গিয়ারে এক ফোঁটা তেল নেই—ছমাস না পেরুতে নতুন ব্যাটারীতে চার্জ দিতে হচ্ছে অথচ চার্জ থাকছে না। ছি ছি, এমনভাবেও গাড়ি নষ্ট করে।

আমার যেন মনে হত, ফটিক মিস্ত্রীর শাদা শাদা চোখের কোণায় জল চিক চিক করছে।

আমি মশো মধ্যে জিজ্ঞেস করতুম, আচ্ছা মিস্ত্রী, তুমি তো এত পারো—মোটর গাড়ি বানাতে পারো না?

—ইঞ্জিন কোথায় পাব বাবা?

—একটা কিনে নিলেই তো হয়।

—তার তো অনেক দাম। তা ছাড়া আরো অনেক জিনিস চাই—সে সবই বা কোত্থেকে আসবে? আমি গরিব মিস্ত্রী।

এমনি করে কিছুকাল গেল। তারপরে সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল।

হঠাৎ একদিন কোত্থেকে ফটিক খুব সস্তায় একটা ভাঙা বাস কিনে আনল। সেটাকে ভেঙে-চুরে গড়তে আরম্ভ করল নতুন ভাবে। আমাকে বললে, খোকাবাবু, বাস তৈরি করছি।

—কী হবে বাস দিয়ে?

—নতুন পাকা রাস্তা হচ্ছে বোয়ালমারী পর্যন্ত। চালাব সেই রাস্তায়।

—তোমার নিজের বাস, মিস্ত্রী?

—আলবৎ। আর কার? দেখো, নিজের হাতেই গড়ব তোমার সামনে টকটকে হলুদ রঙের বাস, ভেতরে লেখা থাকবে, 'ষোল জন বসিবেক' ঝড়ের মতো চলবে। যারা একবার চাপবে, তারা আর অন্য বাসে উঠতেই চাইবে না।—মিস্ত্রীর গলা আনন্দে কাঁপতে লাগল, তোমায় বলছি, এক মাসের মধ্যে আমার বাস ছুটবে বোয়ালমারীর রাস্তায়।

সত্যি সত্যিই এক মাসের ভেতরে বাসটা তৈরি হয়ে গেল। আর যে ভাবে হল, তার কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না।

কোত্থেকে এল আরো দুজন নতুন লোক, তাদের এর আগে আমি কোনদিন দেখিনি। কিছুদিন আগে, আমাদের বাড়িতে মা-র ঘরের জামাকাপড়ের বিরাট আলমারিটা যারা তৈরি করেছিল, সেই দুভাই মজিদ আর হাফিজ মিঞাও জুটল সেখানে। কাঠ চেরাইয়ের আওয়াজ উঠতে লাগল, লোহার ঝনঝনানি শোনা যেতে লাগল। ভোরে উঠে আমি পড়তে বসবার আগেই শুনতে পেতুম ফটিক মিস্ত্রীর চেঁচামেচি আর হাতুড়ির আওয়াজ—রাতে শোয়ার সময় দেখতে পেতুম আরো দুটো নতুন কারবাইড ল্যাম্প যেন বিয়ে বাড়ির রোশনাই জ্বেলে দিয়েছে ওখানে।

সময় পেলেই ছুটে যেতুম আমি। কখনো চানাচুর চিবুতে চিবুতে কখনো বা শালপাতায় করে শুকনো শুকনো ঝাল-ঝাল আলুর দম খেতে খেতে—সেই বেতের মোড়ায় বসে দেখতুম মস্ত কাঠের ফ্রেমটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, ঠকাঠক শব্দে পেরেক মারা হচ্ছে তার গায়ে, দেখতুম হলদে রঙের পোঁচড়া পড়ছে তার ওপর—রঙ আর বার্নিশের গন্ধ ছাপিয়ে উঠছে পেট্রোল-মবিল আর এঞ্জিন অয়েলের গন্ধ।

তারপর সবশেষে ফটিক মিস্ত্রী পেন্‌সিল দিয়ে প্রথমে আদরা করে নিয়ে তার ওপর বড়ো বড়ো কালো অক্ষরে লিখল 'জগতেশ্বর'। আমি ইস্কুলের যে ক্লাসে পড়তুম সেখানে অন্তত এটুকু জেনেছিলুম যে জগৎ-এর সঙ্গে ঈশ্বরের সন্ধি করলে জগতেশ্বর হয় না, হওয়া উচিত জগদীশ্বর। কিন্তু বলি-বলি করেও ওটা বলা গেল না। হলদে রঙের বাসটাকে তখন একটা ফুটন্ত চাঁপা ফুলের মতো মনে হল, মনে হল কৃপণ হরিশ খাজাঞ্চীর চোরকাঁটা ভরা ন্যাড়া মাঠটা যেন আলো হয়ে উঠেছে। 'জগতেশ্বর' লেখাটাই যেন ঠিক মতো মানিয়ে গেছে ওর ওপর—একটা দয়ে ঈকার পড়লে যেন সবটাই বেমানান হয়ে যাবে।

শুধু আমিই নই। শহরের কত লোক যে সে বাস দেখতে এল।

সবাই বললে, চমৎকার—চমৎকার। দু-একজন এমনও বললেন, কলকাতাতেও এত ভালো ফিনিশ হয় না।

তারপর 'জগতেশ্বর' একদিন চলতে আরম্ভ করল। চলল বোয়ালমারীর নতুন পাকা রাস্তা ধরে।

আমি বলেছিলুম, আমাকে তোমার বাসে চড়াবে না মিস্ত্রী?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়! গাঙ্গুলীবাবুকে (অর্থাৎ বাবাকে) আজই বলছি আমি।

www.boiRboi.blogspot.com

আমাদের মুকুন্দপুর থেকে বোয়ালমারী প্রায় ২৪ মাইল হবে। 'জগতেশ্বর' দিনে দুবার যাতায়াত করত সেখানে। সকাল ছটায় বেরিয়ে ফিরে আসত বেলা দশটায়—কাছারীর যাত্রী নিয়ে আসত, আবার ছাড়ত সন্ধ্যে ছটায়, কাছারী ফেরৎ মানুষগুলোকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসত রাত দশটায়।

এক রবিবারের সকালে বাবার অনুমতি পেলুম আমি। আর বাসের নতুন কণ্ডাক্টার অবনী যখন গুণে গুণে সকলের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে লাগল, তখন বিনা পয়সায়—একেবারে সামনের সীটে ফটিক মিস্ত্রীর পাশে বসে আমি সব দেখতে দেখতে চললুম।

তখন লাল কাঁকর ছাওয়া নতুন পথটার দুধারে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে, মাঠে মাঠে দেখা দিয়েছে ঝিঙে বেগুন, ধানের ক্ষেতে খড় রয়েছে—উড়ে বেড়াচ্ছে পায়রা, ঘুঘু আর বগেরি পাখির ঝাঁক, পদ্ম ঝরে গিয়েছে কিন্তু মস্ত মস্ত দীঘির পদ্মপাতার ভিজে হাওয়া এসে গায়ে লাগছে, তখনো হিঞ্চে-কলমির ফাঁকে ফাঁকে লাল শালুক ফুটে রয়েছে, পানকৌড়ি ডুব দিয়ে দিয়ে গুগলি তুলছে। দুটো ছোট ছোট নদী পেরুলাম—নীল জল আর ঝুরঝুরে বালি, সেখানে দেখি খঞ্জন নেচে ফিরছে সমানে। আমাদের বাস দেখে কত গোরু বাছুর ল্যাজ তুলে ছুটতে লাগল চারদিকে, চাষার ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রূপোর নথ পরা চাষী বৌরা, চাষীরা হাসিমুখে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বললে ফটিককে, পাকী চেপে একটি ছোট্ট নতুন বৌ যাচ্ছিল—বেহারারা পথ ছেড়ে প্রায় নয়ানজুলির কোণায় গিয়ে দাঁড়াল আর বৌটি মাথার লাল শাড়ির ঘোমটা সরিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল বাসের দিকে।

এক জায়গায় পর পর সাতটা শিবমন্দির দেখলুম, বিশখোলার পালদের নাম শুনেছিলুম—তাদের মস্ত বাড়ি আর রথের মেলার প্রকাণ্ড রথটা দেখলুম : লালবিবি বলে এক জায়গায় দেখলুম একজন জেলে রাস্তার ধারে চুবড়ী পেতে মাছ বেচছে। সেখান থেকে ফটিক একটা লাল রুই মাছ কিনল, বললে, 'খুব সস্তা'। বোয়ালমারীর গঞ্জটা খুব বড়ো, সেখানকার একটা মিঠাইয়ের দোকান থেকে ফটিক আমায় গরম গরম পুরী, রসগোল্লা আর আলুর তরকারী খাওয়ালো।

বাড়ি ফিরে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাসটা কেন আরো—আরো অনেক দূর যায় না? কেন বোয়ালমারী পর্যন্ত গিয়েই আবার ফিরে আসে?

রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, সেই হলদে বাসটা চলেছে। এত জোরে ছুটছে যে দু-পাশের মাঠ-ঘাট ঘর-বাড়ি যেন ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে খেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। আর বোয়ালমারীর রাস্তাতেই চলছে না—ছুটছে আমার ভূগোলে পড়া দেশগুলোর ভেতর দিয়ে—যেখানে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ছুটেছে তিমি শিকারী জাহাজ, যেখানে বরফে শুয়ে সীল মাছ রোদ পোয়াচ্ছে—যেখানে আকাশকে নানা রঙের ছটায় ভরিয়ে দিয়ে জ্বলে উঠেছে অরোরা বোরিআলিসের আলো!

কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য ঘটনা—এই হলদে বাসের চাইতেও আরো আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল দিন সাতেক পরেই। হঠাৎ দেখি থানা থেকে পুলিশ আর দারোগা এসে ফটিক মিস্ত্রীর কারখানায় হাজির।

আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেলুম।

রাজার এক ভায়ে বিলেত থেকে এঞ্জিনিয়ার হয়ে ফিরে এসেছে। সে-ই একদিন কী খেয়ালে গাড়িগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ধরে ফেলেছে সব। দেখেছে, গাড়িগুলোর বিস্তর পার্টস উধাও—বাসটা তো প্রায় অকেজোই হয়ে গেছে।

তারপরেই দুই আর দুইয়ে চার। 'জগতেশ্বর'।

কোট-প্যান্ট পরা একজন লোক, মাথায় টুপি—সে-ই 'জগতেশ্বর'-এর বনেট খুলে কী সব দেখাচ্ছিল আর ইংরেজি বাংলায় ফটিককে বলছিল, 'ইউ রাস্কেল, থিফ্—তোমায় জেল খাটাব।' আরো সব কী বলছিল আমি বুঝতে পারছিলুম না। শুধু দেখছিলুম, লোকটার মুখ পাকা টোম্যাটোর মতো টকটকে লাল, তার গলায় বিস্তর ঘামাচি হয়েছে আর দারোগাবাবু সমানে হাত কচলাচ্ছেন সামনে দাঁড়িয়ে।

তারপরে ফটিক আর অজিতকে থানায় নিয়ে গেল।

কদিন পরে ওরা ফিরে এসেছিল, আরো কী কী ঘটেছিল, সব ঝাপসা হয়ে গেছে এখন। শুধু মনে আছে, 'জগতেশ্বর' আর চলল না। তার এঞ্জিন থেকে কী সব খুলে নিয়ে গেল, কারখানা বন্ধ করে দিয়ে কোথায় চলে গেল ফটিক মিস্ত্রী, চোরকাঁটায় ভরা হরিণ খাজাঞ্চীর ন্যাড়া মাঠে রোদুরে বৃষ্টিতে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে 'জগতেশ্বরের' হলুদ রঙ জ্বলে পুড়ে গেল আর আমাদের সিক্স-এ-সাইড্ ফুটবল ম্যাচে এক একটা বল এসে দুম দুম করে পড়তে লাগল তার গায়ে।

বোয়ালমারীর লাল পথটা আর নয়—যার দুধারে কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে। আমাদের মুকুন্দপুর শহরের এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে যখন রাজবাড়ির গাড়িগুলো বিশ্রী শব্দ করতে করতে চলে যেত, তখন কখনো কখনো এমনি ধুলোর ঝড় আসত যে কিছুক্ষণের জন্যে তিন নম্বর ম্যাকগ্রেগর ফুটবলটাও আর দেখতে পেতুম না আমরা।

www.boiRboi.blogspot.com

লাল ঘোড়া

একটা ইংরেজি পত্রিকা ওলটাতে ওলটাতে বাঁদিকে চোখ পড়ল। সবটা পাতা জুড়ে কী যেন টনিকের রঙীন বিজ্ঞাপন। এই টনিক খেলে কী পরিমাণ স্বাস্থ্য লাভ হতে পারে, সেইটে বোঝাবার জন্যে বিরাট একটা লাল ঘোড়ার ছবি। কেশর ফুলিয়ে আশ্চর্য উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে, সামনের একটা পা ভাঁজ করা, মাথাটা ওপর দিকে তোলা, সারা শরীরের প্রত্যেকটা পেশী থেকে তেজ আর শক্তি ফিকরে পড়ছে। যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না—ছবিটা দেখতে দেখতে আমার মনে হতে লাগল, যেন একটু পরেই এই পত্রিকাটার পাতা থেকে এক ঝলক ছুটন্ত লাল আগুনের মতো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে সে।

আমার জানালার বাইরে বর্ষণমুখরিত রাতের কলকাতা। বন্ধ কাচের শার্সির ওপর বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে থেকে থেকে—এক-একটা আলোর ঘোড়া মেঘের গুরু গুরু ধ্বনিতে ক্ষুরের শব্দ বাজিয়ে তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে যেন। ফাঁকা পথের ওপর অতন্দ্র ইলেকট্রিকের সারি, অজস্র বৃষ্টিতে ঝাপসা, নিকষ কালো আকাশ আর ঘুমন্ত বাড়িগুলোর মাঝখানে তাদের কতগুলো সবুজ চোখের মতো মনে হচ্ছিল।

পত্রিকাটা নামিয়ে রাখলুম টেবিলের ওপর। ওই লাল ঘোড়াটা—নিবিড় কালো মেঘে ঢাকা আকাশ, কবরের মতো সারি দেওয়া অন্ধকার বাড়িগুলো, সবুজ চোখের মতো ইলেকট্রিক আলোর সার, আর—

আর, আমি কয়েক মুহূর্তের ভেতরে অনেক—অনেক বছর পেছনে চলে গেলুম। তখন আমার বয়েস তেরো বছরের বেশি নয়। তখন আমার জানালার বাইরে দূরে তালবনের মাথার ওপর সন্ধ্যাতারা উঠত আর সেই তারার দিকে চেয়ে চেয়ে থর থর করে কেঁপে উঠত আমাদের তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখাটা। তখন চৈত্রের দুপুর ভরে যেত আমাদের বাগানের চাঁপার গন্ধে, তখন ভরা বর্ষায় করতোয়ার নীল জল ঘোলা হয়ে, ফেনা তুলে—আমাদের বাড়ির ঘাট ছাপিয়ে প্রায় আস্তাবল পর্যন্ত উঠে আসত।

সেই আস্তাবলে থাকত আমাদের লাল ঘোড়াটা।

একটা নয়—দুটো ঘোড়া। একটা কুচ-কুচে কালো, তার কপালে সাদা একটা দাগ—ঠাকুরমা তার নাম দিয়েছিলেন 'চাঁদকপালী'। আর একটা টকটকে লাল—ছোটবার সময় কেশরগুলো নেচে উঠত যখন, ঠিক মনে হত, আগুনের শিখা কাঁপছে কতগুলো। তারও নামকরণ ঠাকুরমাই করেছিলেন খুব সম্ভব, 'লালু'।

প্রকাণ্ড দুটো ঘোড়া, অনেক দাম, বাবার খুব শখের জিনিস। আমাদের বুড়ো হিন্দুস্থানী সহিস রামযশ বলত: 'একদম মিল্‌টারী'। যতদূর মনে আছে—নেকমর্দন ফকিরের মেলা থেকে ও-দুটোকে কিনে আনা হয়েছিল, উত্তর বাংলায় অত বড়ো মেলা তখন আর ছিল না।

ওই ঘোড়ায় চড়ে বাবা মফঃস্বলে যেতেন। রেকাবে পা দিয়ে জিনে উঠে বসতে না বসতেই উল্কার বেগ লাগত ঘোড়ার সর্বাঙ্গে। টকাটক্-টকাটক্-টকাটক্। চক্ষের পলকে থানার সামনের দেবদারু আর বকুলবন পার হয়ে, ডাকবাংলোর পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে, দূরের মেটে লাল পথ দিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যেত, পেছনে পাক খেয়ে উঠতে থাকত রাঙা ধুলোর ঘূর্ণি। আবার দূরের তালবনের মাথায় পড়ন্ত বেলা যখন শেষ আলো আর ছাড়া-ছাড়া মেঘে যেন শকুনের রক্তমাখা ডানা ছড়িয়ে দিত, তখন তেমনি করে ধুলোর ঝড় উঠত, ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ স্পষ্ট হতে থাকত, তখন পরিষ্কার দেখতে পেতুম বাবা ফিরে আসছেন। চাঁদকপালী কিংবা লালু যেই হোক, বাড়ির সামনে পৌঁছেই দাঁড়িয়ে পড়ত লক্ষ্মীছেলের মতো, বাবা টুপ করে নেমে আসতেন, বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ঘোড়াটা ল্যাজ নাড়ত আর তার ঘামের একটা অদ্ভুত মাদক গন্ধে ভরে যেত জায়গাটা।

রোজ সকালে পড়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর স্কুলে যাওয়ার মাঝের সময়টুকু আমি এসে একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে বসতুম আমাদের সেই মস্ত পেয়ারা গাছটার তলায়। একসঙ্গে দুটো কাজ হত। ছুতোর মিস্ত্রি তারিণী তার হাতুড়ি-করাত-র‍্যাঁদা নিয়ে ঠকঠাক্ ঘস ঘস করে কাজ করত সেখানে—আমাদের বাড়িতে প্রায় বারো মাসই বাঁধা ছিল সে: কখনো ঠাকুরমার পুজোর ঘরের সিংহাসন তৈরী করত, কখনো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করত হলদে রঙের কাঁটালকাঠের পিঁড়ি, কখনো গড়ত পিলসুজ, কখনো বা আরো জন-দুই লোক জড়ো করে আলমারী-টালমারী বানাত; বাবা কাছাকাছি না থাকলে দা-কাটা কড়া তামাকে টান দিয়ে খক খক কাশত, আর আমাকে বকবক করে বোঝাত: 'ছোটবাবু, ছুতোরের কাজ ভারী শক্ত—জাত গুণী না হলে এ-কাজে হাত আসে না। আরে র‍্যাঁদা ঘষতে জানলেই যদি মিস্তিরি হত, তা হলে দুনিয়ায় আর দুঃখু ছিল না।' আমি মধ্যে মধ্যে ওর যন্ত্রপাতি টানাটানি করলে হাঁ হাঁ করে উঠত: 'হাত দিয়ো না—হাত দিয়ো না, ও করাতে ক্ষুরের মতন ধার—আঙুলে একবার লাগলে ঘ্যাঁচ করে বেরিয়ে যাবেন!'

তারিণী আমার উপলক্ষ্য ছিল বটে, কিন্তু আসল লক্ষ্য ছিল রামযশ। সামনের আস্তাবল থেকে সে তখন চাঁদকপালী আর লালুকে বের করে এনে প্রাণপণে দলাইমলাই করত। চটাস্ চটাস্ করে এমন জোরে চড় মারত যে আমি শিউরে উঠে ভাবতুম, ও রকম একটি চাঁটি গায়ে

www.boiRboi.blogspot.com

লাগলেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব। অথচ ঘোড়া দুটোকে দেখতুম সম্পূর্ণ নির্বিকার—চোখ বুজে ঘাসটাস কী সব চিবিয়ে চলত—বরং খুব আরাম পাচ্ছে বলেই মনে হত তখন। এমন কি, তারিণী পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠত এক-এক সময়।

—কী আরম্ভ করলে হে রামযশ? চড়িয়ে চড়িয়েই বাবুর ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেলবে নাকি?

রামযশ জবাব দিত না। একবার অবজ্ঞা-ভরে চেয়ে দেখত কেবল।

তামাকে টান দিয়ে খক খক করে কাশতে কাশতে চোখে জল এসে যেত তারিণীর। এক হাতে চোখ মুছে নিয়ে আবার বলত: অত যে মারধোর করছ ঘোড়াকে—একদিন এক চাঁটিতে চোয়াল উড়িয়ে দেবেন—বুঝবে তখন।

রামযশ বলত: ঠকঠক করতেছো—কিয়ে যাও। ঘোড়েকা মতলব তুমি কী সমঝাবে?

—না, ঘোড়া তো আমরা কখনো দেখিনি। আজই তুমিই প্রেথম দেখালে!—তারিণী ব্যঙ্গ করত।

—আরে তুমি যা দেখিয়েসো, ওসব ঘোড়া নেহি—গাধ্‌ধেকা বাচ্চা। এমন ঘোড়া তুমি কাঁহাসে দেখবে? এ-সব হোলো ওয়েলার ঘোড়া—একদম মিল্‌টারী! কামানের গোলীমে ভি কুছু হোয় না—দলাইমলাইসে কী কোরবে—আঁ?

—সেই কবে ঘি খেয়েছিল—বলে থেমে যেত তারিণী, শিরিষ কাগজ ঘষে ঘষে কাঁটাল কাঠের হলদে পিঁড়েগুলোকে সোনার মতো চকচকে করে তুলত। কিন্তু আর কথা বাড়াতো না রামযশের সঙ্গে। বয়েসকালে রামযশ দমদম-মে ছিল, কলকত্তে-মে ভি, গোরা সাহেবলোগো কি ঘোড়া-উড়ার তত্ত্বাবধান করত সে। মিলিটারীর খবর—কলকাতার হালচাল তার নখদর্পণে। নিতান্তই পাড়াগাঁয়ের ছুতোর মিস্ত্রি তারিণী—যে কলকাতা দূরে থাক, দিনাজপুর সদর পর্যন্ত চোখে দেখেনি, সে আর ঘাঁটাতে সাহস পেতো না রামযশকে।

আমি কখনো কখনো রামযশের কাছে মিলিটারী ঘোড়ার গল্প শুনতুম। কেমন করে ব্যাণ্ডের তালে তালে তারা নেচে ওঠে, কেমন করে গড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে তারা টগবগিয়ে ছুটে যায়, কেমন করে লাটসাহেবের গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলে গোরা ঘোড়সোয়ার—এই সব বিবরণ শুনতে শুনতে আমার ভাবনা অনেক দূরে ভেসে চলে যেত। তখন মধ্যে মধ্যে মনে হত—আমাদের বাড়ির আস্তাবলে ওরা যেন বেমানান, মিলিটারী বাজনার তালে তালে নাচতে না পারলে ওদের জীবনই যেন বৃথা।

তারিণী ঈর্ষাভরা চোখে তাকাত। গ্রামের নদীতে কুমির আসবার একটা রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়ে আমাকে অভিভূত করতে যাচ্ছিল, রামযশের ঘোড়া কুমিরের পিঠের ওপর টেক্কা দিয়ে চলে যেত দেখে তার বিরক্তির আর সীমা থাকত না।

—বুড়োর কথা শোনো কেনে ছোটবাবু! গপ্প মারে দই!

গল্প হোক আর যাই হোক, তারিণীর চাইতে রামযশের ওপরেই আকর্ষণ আমার ছিল বেশি। আস্তাবলের পাশেই একটা ছোট ঘরে বাঁশের মাচার ওপর ছিল রামযশের আস্তানা, কত ছুটির দুপুরে আমি পালিয়ে পালিয়ে যেতুম সেখানে—আর রামযশের গল্প শুনতুম। বয়েস বোধ হয় তখন পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে রামযশের, পাকা গোঁফ, মাথার ছাঁটা-ছাঁটা চুল কদমফুলের মতো সাদা। তবু আশ্চর্য ধারালো ছিল চোখ দুটো, কথা বলতে বলতে জ্বলজ্বল করে জ্বলত আর সেই চোখের আলোয় যেন আমি দিগ্‌দিগন্ত দেখতে পেতুম।

শুধু রামযশই নয়: তখন স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়িয়ে আরো কিছু দূরে এগিয়ে গেছি। পড়েছি সেই সব বর্ণনা—কেমন করে ঘাসে ভরা বিশাল মাঠের ভেতর দলে দলে বুনো ঘোড়া চরে বেড়ায়, কী করে নেতা হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করে—কেমন করে হঠাৎ

খেয়ালখুশির আনন্দে তীরের মতো ছুটে যায় তারা। পড়েছি সেই সব কাহিনী, কিভাবে রেড ইণ্ডিয়ানরা পলকের টুপি মাথায় পরে পোষা ঘোড়া ছুটিয়ে তাড়া করে তাদের আর ল্যাসো ছুঁড়ে দিয়ে উদ্ধাগতি বুনো ঘোড়াকে বন্দী করে তারা।

আস্তাবলে ঘোড়ারা বড়ো বড়ো পাত্র থেকে ভিজে ছোলা খেত, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। মোটা মোটা নাকের ফুটো দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস পড়ত,প্রকাণ্ড চোয়ালের পাশ দিয়ে চিবুনো ছোলা গলে পড়ত কখনো কখনো, কী মনে করে অনেকগুলো দাঁত হাসির ভঙ্গিতে মেলে দিয়ে ই-হি-হি করে ডেকে উঠত আর চামরের মতো ল্যাজ দুলিয়ে দিয়ে মাছি তাড়াত। সমস্ত জায়গাটা আচ্ছন্ন হয়ে উঠত চিবুনো ছোলা আর ঘোড়ার গন্ধে—আমি দেখতুম—স্পষ্ট দেখতে পেতুম, অস্ট্রেলিয়ার সেই অসীম-অশেষ তৃণপ্রান্তর দিয়ে ঘোড়ার পাল ছুটছে, শুকনো ছেঁড়া ঘাসের শিসের ঘূর্ণি উঠছে তাদের পায়ে পায়ে, আর তাদের দলে একটা বিদ্যুতের চমকের মতো লালু আর চাঁদকপালীকে আমি দেখতে পেতুম এক একবার।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ কাণ্ড ঘটল একটা।

বেদের দল এল গ্রামে—এদেশের লোক যাদের বলত ইরানী। সেই পীর মুর্শিদের প্রকাণ্ড বটগাছটা—অনেকখানি জুড়ে ঠাণ্ডা নীলচে ছায়া ছড়িয়ে আর বড়ো বড়ো জট নামিয়ে যেটা দাঁড়িয়ে আছে, যার ঘুপচি পাতার আড়ালে কখনো কখনো মাঝরাতে শকুনের ছানা ডুকরে কেঁদে উঠে আমাদের ভয় ধরিয়ে দিত, যার তলায় কখনো কখনো শিরনী চড়াত গ্রামের মুসলমানেরা আর আমরা গিয়ে বাতাসার লোভে ভিড় করে দাঁড়াতুম, সেখানেই এসে তারা তাঁবু ফেলল।

পা-জামা, কালো কুর্তা, মাথায় পাগড়ি, কানে বীরবৌলি—পুরুষের দল ; মেয়েদের পরনে মস্ত মস্ত রঙবেরঙের কুচি-দেওয়া ঘাগরা, গলায় পুঁতি আর পাথরের মালা, মাথায় রঙিন রুমাল। ছুরি-ছোরা, শেকড়-বাকড়, নানারকমের ওষুধ, আরো কী সব টুকিটাকি জিনিসপত্র বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বেড়াত। অনেক রাত পর্যন্ত ঢোল-করতাল বাজিয়ে গান বাজনাও চলত তাদের।

একদিন কার সঙ্গে ছুরি-কাঁচির দরাদরি নিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে উঠল তাদের একজন, ফস করে একখানা ছোরা বের করে ফেলল—খুন করেই বসে আর কি ! বাবা তক্ষুনি ইরানীদের ডাকিয়ে আনালেন, সেই লোকটাকে নাকে খত দেওয়ালেন, হুকুম করলেন, কাল ভোর হওয়ার আগেই ওদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

শেষ রাতেই চলে গেল বেদেরা।

কিন্তু সেদিন সকালে লালুকে জিন পরাতে গিয়েই এক বিপর্যয় কাণ্ড !

কথা নেই, বার্তা নেই—হঠাৎ চিঁ-হি-হি করে একটা বিকট চিৎকার ছাড়ল লালু—তার অমন বেয়াড়া বিদকুটে ডাক আমি কোনোদিন শুনিনি। তারপরেই ঘোড়া তড়াক তড়াক তড়াক করে লাফাতে আরম্ভ করল, লাথি ছুঁড়তে লাগল পাগলের মতো। 'আরে বাপ্‌রে',—বলে লাফিয়ে সরে গেল মিল্‌টারী-ফেরৎ রামযশ—আর একটু হলেই একটা লাথি সোজা গিয়ে লাগত তার মাথায়।

তারিণী সেই পেয়ারা গাছটার তলায় বসে তুরপুন চালিয়ে কাঠ ছেঁদা করছিল। ঠাট্টা করে বলতে গেল : কেমন—হল তো ? আরো দলাই-মলাই করো ঘোড়াকে ? এবার—

মুখের কথা মুখেই রইল তারিণীর। ঘোড়াটা এবার বোঁ করে তার দিকে ঘুরে গেল, উৎকট হাসির ভঙ্গিতে প্রকাণ্ড মুখের সব ক'টা দাঁত ছড়িয়ে দিয়ে ই-হি-হি করে এমন একটা ডাক ছাড়ল যে বুকের রক্ত চমকে গেল আমাদের।

—ওরে সব্বনাশ !

যন্ত্রপাতি ফেলে, তিন লাফে উঠোন পেরিয়ে তারিণী এসে বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল। থর

থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললে, এ ঘোড়া পাগল হয়ে গেছেন গো—একেবারে পাগল হয়ে গেছেন !

পাগল ছাড়া কী আর ! রামযশ কাছে এগোতে পারল না, বাবাকে দেখলে যে ঘোড়ার চোখ পর্যন্ত খুশিতে ভরে ওঠে বলে মনে হত আমার—সে যেন কাউকেই আর চিনতে পারছে না। কিছুক্ষণ দাপাদাপি করল, সেই রক্ত জমানো বিকট চিৎকারে থেকে থেকে সারা পাড়া কাঁপিয়ে দিলে, দুই লাথিতে বাগানের বাঁকারির অর্ধেক বেড়া উড়িয়ে দিলে, তারপর হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করল। করতোয়ার পাশ দিয়ে, ঈশানীর কালীমন্দির ছাড়িয়ে যেন একটা লাল আগুনের ঝলক মিলিয়ে গেল—মনে হল, তার পায়ের নিচে এখন আর বাংলা দেশ নেই, অস্ট্রেলিয়ার সেই বিশাল তৃণপ্রান্তর দিয়ে কোন্ দূর-দুরান্তে সে ছুটে চলল।

বাড়িতে হৈ-হৈ শুরু হয়ে গেল। ঠাকুরমা হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন, বাবা থমথমে মুখে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন তাঁর ইজিচেয়ারটায়। ঘোড়ার সন্ধানে লোক ছুটল, চৌকিদার ছুটল, কিন্তু লালুকে যে আর ফিরে পাওয়া যাবে—এমন আশাই করতে পারল না কেউ।

চোখ মুছতে মুছতে রামযশ সামনে এসে দাঁড়ালো। যেন সমস্ত অপরাধ তারই।

—হুজুর, আমার কিছু মালুম হচ্ছে না। কাল রাততক ঘোড়া একদম ঠিক ছিল—লেকিন—

প্রতিবেশী ওভারসিয়ারবাবু বললেন, এ নিশ্চয় ইরানীগুলোর কাণ্ড মশাই। আপনি ওদের তাড়ালেন গ্রাম থেকে, তাই শোধ নেবার জন্যে রাত্তিরে চুপিচুপি এসে ঘোড়ার খাবারে কিছু বিষ-টিষ মিশিয়ে দিয়েছে। ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে বাবা বললেন, তাই সম্ভব।

ওভারসিয়ারবাবু আবার বললেন, ওই বেদেগুলোকে কনস্টেবল পাঠিয়ে ধরে আনান, আচ্ছা করে চাবকে দিন। দেখবেন—

বাবা বললেন, কী হবে ?

তারপর সেই ঘটনাটা ঘটল।

যেটা বলবার আগে আর একটা কথা বলা দরকার। আমার বয়েস তখন তেরো। নতুন সাঁতার শিখে করতোয়ার জল তোলপাড় করি, গাছের ডালে ডালে পাকা ফল আর বুলবুলির বাচ্চা খুঁজে বেড়াই, মাঠ পেরিয়ে চণ্ডীর বিলে চলে যাই—সেখানে পেত্নী আর কেউটে সাপের ভয় আছে জেনেও শিঙাড়া তুলে আনি, আনি পদ্মচাকী। এ-সব দুরন্তপনায় বাবা পারতপক্ষে কখনো বাধা দিতেন না ! খুব সম্ভব নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত তাঁর—ঠাকুরমার মুখে তাঁর অনেক বেপরোয়া কীর্তিকাহিনীই আমরা শুনেছিলুম।

শুধু একটা জায়গায় বাধা ছিল বাবার। তাঁর ওই বড়ো বড়ো ঘোড়া দুটোয় কিছুতেই চাপতে দিতেন না আমাকে। রামযশ আমার হয়ে দু-একবার ওকালতি করতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এসেছিল।

বাবা বলতেন, ও ঘোড়ায় চড়বার মতো বয়েস হোক—তখন দেখা যাবে।

কিন্তু তেরো বছর কি বয়েস নয় ? মন তখন গল্পের বই পড়ে আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহ আর গরিলা শিকার করে বেড়ায়, সাহারার মরুভূমিতে বেদুয়িনদের ছুটন্ত ঘোড়ায় মরুঝড় পেরিয়ে চলে যায়, ক্ষোনোতোলা নায়েগ্রা প্রপাতে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে চায়, ঝেন হেডিনের সঙ্গে তিব্বতের শ্লেশিয়ার পাড়ি দেয়। অতএব বাবার ঘোড়া না পাই, ঘোড়ায় চড়া বন্ধ হত না। শীতের মাঠে যে-সব ছোট ছোট পাড়াগেঁয়ে নিরীহ ঘোড়া আধমরা ছোলা শাক আর মটরশুঁটি খেয়ে বেড়াত, সুযোগ পেলেই তাদের ন্যাড়া পিঠে সোয়ার হতুম আমি। কঞ্চির চাবুক চালিয়ে অনিচ্ছুক ঘোড়াগুলোকে যথাসম্ভব দৌড় করাতুম, আর ভাবতুম, লালু কিংবা চাঁদকপালীর পিঠে যদি কোনো দিন চাপতে পাই—তা হলে মরুভূমির বেদুয়িনদের মতো নীল নদীর ধারে

www.boiRboi.blogspot.com

ধারে—পিরামিডের ছায়ায় ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাই।

রামযশকে কতদিন বলতুম, আমাকে একদিন চুপি চুপি ঘোড়ায় চাপতে দেবে রামযশ ?

রামযশ ক্ষিভ্ কাটত : না ছোটবাবু—বড়বাবুর হুকুম আছে—আমি বেইমানি করবে না।

কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখতুম—লালু কিংবা চাঁদকপালীর পিঠে সোয়ার হয়ে আমি ছুটেছি। মরুভূমি, পাহাড়, বন-সব পার হয়ে একদিন ছাড়িয়ে চলে গেলুম পৃথিবীর সীমা, ঝাঁপিয়ে পড়লুম শূন্য আকাশে—নীল, নীল, অনন্ত নীল পেরিয়ে ঘোড়া পক্ষীরাজ হয়ে ছুটল, তারায় তারায় ক্ষুরের শব্দ বাজতে লাগল। এই গ্রাম নয়, স্কুল নয়, শুধু মাঠের ওপারে চণ্ডীর বিলটা নয়—যোগীন সরকারের 'বনে জঙ্গলে' ছাড়িয়ে জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহ-নক্ষত্রে'র অসীম জগতে। কী মুক্তি—কী মুক্তি।

লালু যেদিন তার রাঙা কেশরে আগুনের শিখা উড়িয়ে উল্কার মতো অদৃশ্য হয়ে গেল, সেই দিন বিকেলে তখন আমাদের খিড়কির দিকটায় কেউ ছিল না। তারিণী মিস্ত্রী তার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে, রামযশ খুব সম্ভব লালুকে খুঁজতে বেরিয়েছে, বাবাকে শালিসীর জন্যে ডেকে নিয়ে গেছে। আর সবাই বাড়ির ভেতরে। সেই সময় আমি খিড়কির বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

তখন ভরা করতোয়ার জলে নৌকোর পালে সোনালি রোদ—বকে ফিরছে, মাছরাঙা ফিরছে, কাকেরা ভাঙা গলায় ডাকাডাকি করছে। আমি নদীর দিকে চলেছিলুম বর্ষার জলে শুশুকের ডিগবাজী দেখতে—হঠাৎ পা থমকে গেল আমার।

ঠিক আস্তাবলের সামনে লালু দাঁড়িয়ে। হাঁ-লালুই। কখন ফিরে এসেছে কেউ জানে না। একেবারে মাটির মূর্তির মতো স্থির। বিকেলের আলোয় লাল প্রকাণ্ড শরীরটা অপরূপ দেখাচ্ছে তার—মনে হল ওটা একটা আগুনের ঘোড়া।

কিসের আকর্ষণে জানি না—আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলুম তার দিকে। সকালে তার রুদ্র ভয়ঙ্কর মূর্তি আমি দেখেছি, দেখেছি তার ক্ষুরে ক্ষুরে কিভাবে মাটি ঠিকরে ঠিকরে উঠছিল—শুনেছি, কী হিংস্র গর্জন করছিল সে ! তবু আমার ভয় করল না। আমি তার কাছে গেলুম, তার লম্বা খরখরে গলায় হাত বোলালুম অনেক ধীরে, তার মসৃণ পেটের স্পর্শ অনুভব করলুম, তার রোমকূপ থেকে ঘামের একটা আশ্চর্য মাদক গন্ধ ধীরে ধীরে আমাকে অভিভূত করতে লাগল।

জিন পরাই ছিল, সেই অবস্থাতেই সকালে ছুটে পালিয়েছিল সে। নিজের অজ্ঞাতেই একটা অন্ধ উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসল, রেকাবটা আমার পক্ষে বেশ উঁচু হলেও খানিকটা চেষ্টা করতেই দেখলুম—কখন আমি সোজা লালুর পিঠে উঠে বসেছি।

তারপরেই লালুর পেটে পায়ের একটা ঠোকর দিয়ে বললুম, এই—চল—চল—

আবার সেই অদ্ভুত আওয়াজ—যেন একটা পাগল আমার কানের কাছে তীক্ষ্ণ বিকল গলায় হি-হি করে হেসে উঠল। আর লালু ছুটল। লাল আগুনের হলকা ছুটল—মাটি দিয়ে নয়, আকাশ বেয়ে। যেন টান-করা ধনুকের ছিলে থেকে তীর উড়ল !

সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছি আমি—কী ভুল করেছি, কী মারাত্মক ভয়ঙ্কর ভুল ! এ তো শীতের মাঠে-চড়া নিরীহ বেঁটে বেঁটে টাট্টু ঘোড়া নয়—এ সেই শক্তির তরঙ্গ, যা সাহারার মরুঝড় পাড়ি দিয়ে ছুটে যায়, যার পায়ের নীচে অসীমেরও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি থেকে শুকনো ঘাসের শিস্ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঘুর্ণি হয়ে চলে। বাতাস এসে আমার দুই কানে ধাক্কা দিতে লাগল, মনে হতে লাগল যে-কোনো সময় একটুকরো ছেঁড়া কাগজের মতো উড়ে যাব আমি। আর তার অর্থ যে কী তা-ও বুঝতে বাকী নেই আমার।

পেছন থেকে যেন অনেকগুলো গলার চিৎকার কানে এল : খোকন—লালু—লালু—

অর্থাৎ লোকে দেখতে পেয়েছে—রামযশের স্বরও চিনতে পারলুম আমি। কিন্তু বর্ষার করতোয়ার জলে যেমন ভুস করে একটা শুশুক ভেসে উঠেই আবার অতলে তলিয়ে যায়, তেমনি করে কয়েক সেকেণ্ডের বুদ্বুদ তুলেই শব্দটাও নিশ্চিহ্ন হল—হারিয়ে গেল ঘোড়ার পায়ের আওয়াজে—ভেসে গেল হু-হু করা বাতাসের স্রোতে।

আমি তখন শুয়ে পড়েছি ঘোড়ার ওপর। লাগাম ছেড়ে দিয়ে দু হাতে গলা জড়িয়ে ধরেছি তার, মুখ গুঁজছি সেই নেশাধরানো উত্তেজক ঘামের গন্ধের ভেতর। চেতনা আর অচেতনার একটা কেন্দ্রবিন্দুতে সমস্ত মন মেটরগাড়ির স্পীডোমিটারের মতো কাঁপছে, দুলছে, শিউরে উঠছে। চেতনা বলছে, আমি পড়ব না, কিছুতেই পড়ব না ; আর সেই খসখসে কেশরের ভেতর—সেই উগ্র গন্ধের নেশায় সব যেন নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে—আমার মরা-বাঁচার সব প্রশ্নই নিরর্থক সেখানে।

কোথায়—কতদূর চলেছি আমি ? জানি না—জানবার উপায় নেই। চোখের দৃষ্টি আমার অন্ধ। একটা কালো আকাশ বেয়ে তারায় তারায় ছুটে চলেছি এখন, সময় নেই, সীমা নেই, বিরতি নেই। তবু ভয়—মৃত্যুর ভয় থেকে থেকে আমার ঝোড়ো হৃৎপিণ্ডে এক একটা বরফের স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে, এমন দুরন্ত হাওয়ার ভেতর দিয়েও সারা গা বেয়ে ঘামের স্রোত নামছে আমার।

লালু ছুটছে। ছুটছে তারায় তারায়। একবার চোখ চাইতে চেষ্টা করলুম—কয়েকটা ছায়ামূর্তির মতো কী পাক খেয়ে গেল পাশ দিয়ে। কারা যেন আবার চিৎকার করে উঠল। তারপরে সেই একটানা ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ, সেই চেতন-অচেতনের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা স্পীডোমিটারের কাঁটার মতো কাঁপতে থাকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে রুখবার জন্যে দু-হাতে গলা জড়িয়ে কেশরের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা, আর অনুভব করা : বাতাস প্রতি মুহূর্তে দস্যুর মতো ঘোড়ার পিঠ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

তারপর হঠাৎ কিসের ঠোক্কর খেয়ে ঘোড়াটা আচমকা শূন্যে লাফিয়ে উঠল, তার গলা থেকে দুর্বল হয়ে আসা হাতের বাঁধন ছিটকে খুলে গেল আমার, আর—

যখন চোখ চাইলুম তখন মনে হল গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। আমি যেন একটা কুয়ার ভেতরে উবুড় হয়ে পড়ে আছি। কী অসম্ভব, কী অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা আমার বাঁ পায়ে—আমার বুকের পাঁজরাতে। এমন যন্ত্রণা—জাঁতার ভেতরে শরীরটাকে তিলে তিলে পিষে দেবার মতো এমন দুঃসহ শারীরিক কষ্ট যে বিশ্বসংসারের কোথাও থাকতে পারে, আমার এই তেরো বছর বয়েসের ভেতরে আমি তা কোনোদিন কল্পনাও করিনি !

আমি আর্তনাদ করতে গেলুম, গলা থেকে চাপা গোঙানির মতো কী একটা বিসদৃশ ধ্বনি বেরিয়ে এল। পেটের তলায় একটা হাত চাপা পড়েছে, সেটাকে টেনে বের করতে চাইলুম, পারলুম না। কিন্তু এই শারীরিক চেষ্টা আর অনুভূতির ফলে আমার জমাট হয়ে যাওয়া স্তব্ধ মস্তিষ্কটা এতক্ষণে একটু একটু করে সক্রিয় হয়ে উঠল। তখন দেখলুম—অন্ধকার নয়, মেটে মেটে অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। আমার সামনে অসংখ্য মাটির ঢিবি, ইতস্তত কয়েকটা ভাঙা বাঁশ। আর আমার বাঁদিকে—হাত তিনেক দূরে একটা নিশ্চল বিরাট ছায়া। এই বিবর্ণ জ্যোৎস্নাতেও তার উজ্জ্বল লাল রং—তার সিংহের মতো কেশর, তার পিঠের ওপর চকচকে বাদামী চামড়ার জিন। লালু !

লালু দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর রাঙা আগুন নয়—যেন পোড়া মাটির তৈরী একটা বিরাট ঘোড়া। নড়ছে না—ডাকছে না—ল্যাজটা পর্যন্ত দুলছে না এতটুকুও। একটা অটল, অচল মূর্তি।

www.boiRboi.blogspot.com

সারা শরীরে আবার সেই যন্ত্রণা—সেই জাঁতার মধ্যে পিষে যাওয়ার দুঃসহতম উপলব্ধি ! আমি প্রাণপণে চিৎকার করতে গিয়েও থমকে গেলুম। সামনে ও কী জ্বলছে ? ও কিসের চোখ ?

এক নয়, দুই নয়, আট-দশ, হয়তো আরো বেশি। আধ ইঞ্চি এক ইঞ্চির ব্যবধানে জোড়ায় জোড়ায় সবুজ আগুন—কী নিষ্ঠুর ভাবেই জ্বলজ্বল করছে। আমি বুঝতে পারলুম—আমিই ওই চোখগুলোর লক্ষ্য—দৃষ্টির ভেতর দিয়ে যেন কতগুলো লাল জিভ আর ধারালো দাঁতের ছোঁয়া আমার সারা শরীরকে স্পর্শ করতে লাগল !

সেই ঘোড়া ছোটবার সময় একটা ভয় আমাকে অচেতনার সীমান্তে পৌঁছে দিয়েছিল, এখন আর একটা ভয় আমার সর্বাঙ্গের যন্ত্রণার ভেতরে আরো দুঃসহ আতঙ্কের সঞ্চার করল। আমি বুঝতে পারলুম, ওরা শেয়াল। আমার মনে পড়ল বাবার মুখে শোনা সেই লোকটার কথা—হাট থেকে ফিরতে ফিরতে যার কলেরা হয়েছিল, রাতের বেলা পথের ধারে যে একটা বটতলায় পড়ে ছিল, আর জ্যান্ত অবস্থাতেই শেয়ালেরা যাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল !

ওরা আসবেও খেতে আসছে। জোড়ায় জোড়ায় সবুজ চোখের ভেতর আমি কতগুলো ধারালো দাঁতকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি !

পলকহীন দৃষ্টিতে আমি দেখলুম—এক জোড়া সবুজ চোখ একটু একটু করে এগোচ্ছে আমার দিকে। চিৎকার করতে চাইলুম, স্বর ফুটল না। শুধু আমার স্থির চোখের তারার ওপর সেই হিংস্র সবুজ আলো দুটো স্থির হয়ে রইল—ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টিকে গ্রাস করল, সেই সবুজের ভেতরে আবার চেতনা ডুবে চলল—আমার সমস্ত জগৎ সেই নিষ্ঠুরতম সবুজের ভেতরে বিন্দুর মতো মিলিয়ে যেতে লাগল !

তখন—সেই সময়, আবার সেই শব্দ। সেই পাগলের হাসির মতো একটা তীক্ষ্ণ ঈ-হি-হি !

পোড়া মাটির ঘোড়াটা নড়ে উঠল। তিন লাফে এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে পা ছুড়ল পেছনে। সবুজ চোখের সম্মোহন কেটে গেল আমার—দেখলুম, অনেকখানি নিরাপদ দূরত্বে তারা সরে গেছে, লালুর পায়ের সীমানার কাছেও দাঁড়াবার সাহস নেই তাদের ! তারপরে সমস্ত রাত।

সামনের আকাশ দিয়ে মেঘের পর মেঘ ভাসল, তারার পর তারা ডুবল, আমার কোন্ পাশে কখন যেন মেটে-আলো ছড়ানো চাঁদটা উধাও হল কোনখানে। যন্ত্রণায় কখনো কখনো আমি চিৎকার করতে লাগলুম, পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল বলে ভিজে মাটি কামড়ে নিলুম কতবার, কতবার থেকে থেকে মৃত্যুর মতো অবসাদ এসে কিছুক্ষণের জন্যে আমার সব বোধ লুপ্ত করে দিতে লাগল। আর থেকে থেকে সেই ঈ-হি-হি করে রক্তজমানো হাসির শব্দ, একবার লালু সামনে ছুটে যাচ্ছে, একবার পেছনে, একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে। সবুজ চোখগুলো যেন আমার চারদিকে ঘিরে ঘিরে লুকোচুরি খেলছে, আর লালু আমাকে বাঁচাচ্ছে—আমাকে বাঁচাচ্ছে সেই রাশি রাশি ধারালো দাঁতের অন্ধ আদিম হিংসা থেকে !

হঠাৎ লালুর ক্ষুরের ধাক্কায় কী একটা গড়াতে গড়াতে চলে এল আমার দিকে। ঠক্ করে লাগল আমার কপালে। আমি দেখতে পেলুম—আমার চোখে সেই সব সবুজ চোখের আলো প্রতিফলিত হতে হতে নিশাচরের মতো আমার দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল—আমি দেখলুম, সেটা সাদা একটা নরমুণ্ড। ভূতুড়ে গল্পের বইয়ের ছবিতে যেমন দেখা যায়—ঠিক তাই !

আমার কপালে সেই নরমুণ্ডের ঠাণ্ডা কঠিন স্পর্শ অনুভব করে—শেষবার চিৎকার তুলে, আমি জ্ঞান হারালুম।

আর একটা বিকট শব্দে দ্বিতীয়বার চোখ চাইলুম আমি। সকালের রোদ ঝলমল করছে চারদিকে। একটা কবরখানার মধ্যে পড়ে আছি আমি। অনেকটা দূরে বাবাকে দেখতে পাচ্ছি, রামযশকে দেখছি, দেখতে পাচ্ছি আরো আরো অনেক লোকজনকে। বাবার হাতের বন্দুকটা থেকে ধোঁয়া উঠছে তখনো, আর আমার পাশেই নিজের টকটকে লাল শরীরকে রক্তে আরো রাঙা করে দিয়ে—মাটিতে কাত হয়ে পড়ে পা ছুঁড়ছে লালু, প্রকাণ্ড মসৃণ পেটটা শেষ নিঃশ্বাসের টানে টানে ঢেউয়ের মতো ওঠা-পড়া করছে !

তিন মাস পড়ে থাকতে হয়েছিল আমাকে। বুকের পাঁজরার দুটো হাড় ভেঙে গিয়েছিল, খুলে গিয়েছিল বাঁ হাঁটুর জোড়টা। তবু তার মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বলেছিলুম, কেন মারলে—লালুকে কেন মারলে তুমি ?

জবাব দেওয়ার আগে বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। ধরা গলায় বলেছিলেন, আমাদের দিকে তেড়ে আসছিল যে ! আমরা ভেবেছিলুম পাগল হয়ে বুঝি ও তোকে মেরেই ফেলেছে !

বাইরে বর্ষণমুখরিত রাতের কলকাতা। ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার, বাড়িগুলো যেন রাশি রাশি কবর। কাচের শার্সির ভেতর দিয়ে রাস্তার সারবাঁধা ইলেকট্রিকের আলোগুলো নিশাচরদের সবুজ চোখের মতো জ্বলছে। আমার সামনের টেবিলে সেই বিলিতী পত্রিকাটা—একটা লাল ঘোড়া একখানা আগুনের মতো ছুটে যেতে চাইছে আকাশের দিকে।

লালু কেন অমন করেছিল সেদিন ? সত্যিই কি ইরানীরা বিষ খাইয়েছিল তাকে ? অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমি—না সাহারার ডাক শুনেছিল সে ? কোন্ যুদ্ধের দামামা তালে তালে সেদিন বেজে উঠেছিল তারি বুকের রক্তে ?

কিন্তু আজ যেন দুটি সত্য একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি তার ভেতর। মৃত্যু আর মুক্তি। মুক্তি আর মৃত্যু।

কিংবা দুই-ই এক।

www.boiRboi.blogspot.com

সেই ছেলেটা

সিনেমার শো শেষ হতে প্রায় দশ-পনেরো মিনিট দেরি আছে এখনো। নাইট শো। ফাঁকা লবিতে সারি সারি রঙীন ছবি জ্বলছে বিদ্যুতের আলোয়। আর দেওয়ালে হেলান দিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে বারো-তেরো বছরের সেই ছোট ছেলেটি !

ফর্সা রোগা চেহারা। ভয়ের ছায়া জড়নো দুটি ডাগর চোখ। সেই আধময়লা নীল রঙের প্যান্ট, গায়ে ছিটের শার্ট, পায়ে চটি।

কাউন্টার থেকে হাই তুলতে তুলতে বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক।

—কি খোকা, আজও দাঁড়িয়ে যে ?

ছেলেটির মুখখানা একটু বিবর্ণ হয়ে উঠল।

—মাকে নিয়ে যেতে এসেছি। এত রাতে মা তো একা ফিরতে পারবেন না।

—তোমার মা-র এই ছবিটা খুব ভালো লেগেছে দেখছি। পরশুও তো এসেছিলেন—তাই না ?

চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ছেলেটি।

—ভালো—ভালো।—ভদ্রলোক একটু হাসলেন : এ-রকম দু চারজন খদ্দের না থাকলে সিনেমাই বা চলবে কী করে ? তা, এ ছবিটা তো কিছু খারাপ নয়। তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকো কেন ? মা-র সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেই পারো।

—মা ছোটদের ফিলিম দেখা পছন্দ করেন না।—আস্তে আস্তে জবাব দিলে ছেলেটি।

—এরকম ট্রেনিং ভালোই। কিন্তু মা-রও এত ঘন ঘন ছবি দেখা উচিত নয় তাহলে। তাতে উপদেশের দাম থাকে না।

ছেলেটি জবাব দিল না, চোখ নীচু করে তেমনি চেয়ে রইল আলো পিছলে পড়া মোজেয়িকের মেজেটার দিকে। ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না। সিগারেট ধরিয়ে কোন দিকে চলে গেলেন।

সামনের বড় ঘড়িটা টক টক করে চলল একটানা। রঙীন ছবিগুলো জ্বলতে লাগল চারপাশে। রাত আরো ঘন হলো। 'লাস্ট কারের' বোর্ড ঝুলিয়ে নিয়ে টিং টিং করতে করতে বেরিয়ে গেল শেষ ট্রামটা।

হাউসের ভেতর থেকে চড়া বাজনার একটা গুম গুম শব্দ ভেসে এল বাইরে। দুটো বন্ধ দরজা খুলে গেল, সামনের কোলাপ্‌সিবল গেটটাকে একজন দরোয়ান হড় হড় করে দুপাশে টেনে দিলে।

দরজা দুটোর কালো পর্দা সরিয়ে, ডানধারের দোতলার সিঁড়ি বেয়ে পিল্‌পিল করে মানুষ বেরিয়ে এল লবিতে। সেই ভীড়ের ভেতরে খোকাকে আর দেখা গেল না।

॥ দুই ॥

বিকেল বেলা। কলেজ স্ট্রীটে মানুষের স্রোত। ট্রামে-বাসে অফিস-ফেরতের দল সারি সারি কাঁটালের মত ঝুলছে। ফুটপাথ জুড়ে বসেছে ধূপকাঠিওলা, জুতো-বুরুশ, সস্তার টুকিটাকি মনোহারির দোকান। একজন একটা কাগজের সাপ খেলিয়ে খেলিয়ে পথ-চলতি মানুষগুলোকে চমকে দিচ্ছে কখনো কখনো।

ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে 'অন্নরোগের অব্যর্থ মহৌষধে'র বিজ্ঞাপন আঁটা একটা থামের গায়ে পিঠ রেখে। দৃষ্টি পড়ে আছে সামনের বড় দোকানটার শোকেসের দিকে—যেখানে দুটি 'ডামি' শৌখিন শাড়ি পরে খরিদ্দারের মন ভোলাচ্ছে। ছেলেটি তাদের দেখছে অথচ দেখছে না। তার চোখ দুটো যেন কাচ দিয়ে গড়া। একটার পর একটা ছায়া পড়ছে, কিন্তু ধরা থাকছে না কোনোটাই। তারই দুটি ক্লাসের বন্ধু আসছিল পথ দিয়ে।

—এই, এখানে দাঁড়িয়ে যে ?

ছেলেটি বিষণ্ণমুখে তাকালো তাদের দিকে।

—মা ঢুকেছে এই সামনের দোকানটায়। শাড়ি কিনতে।

বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি-বিনিময় করে নিলে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল একজন।

—কিনুক শাড়ি।—একজন ছেলেটির কাঁধে হাত রাখল : চল্ আমাদের সঙ্গে।

—না, মা রাগ করবে।

—করবে না। চল্—ডালমুট খাওয়াবো, তেলেভাজা খাওয়াবো।

—না, আমি কিছু খেতে চাই না।

আর একজন বললে, বিজুর বড়দা সন্ধ্যেবেলা প্রোজেক্টার দিয়ে পাখির ছবি দেখাবে বলেছে। চল্ না ভাই।

ছেলেটি তেমনি শক্ত হয়ে রইল। এক চুলও নড়ল না।

—আমি পাখির ছবি দেখতে চাই না। মা রাগ করবে। আমি যাব না।

বন্ধুরা অর একবার এ ওর দিকে তাকালো—ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল দুজনেই, তারপর এগিয়ে চলল। আর ছেলেটির কাচের মত চোখে একটার পর একটা ছায়া পড়ে সরে যেতে লাগল। তার পায়ের কাছ দিয়ে সেই চমক লাগানো কাগজের সাপটা কখন যে সর সর করে চলে গেল, সে টেরও পেলো না।

॥ তিন ॥

আলোজ্বলা বিয়ে-বাড়ি। লোকজনের ব্যতিব্যস্ত যাওয়া-আসা। ঝাঁকে-ঝাঁকে মেয়ে-পুরুষ ঢুকছে বেরুচ্ছে—শাড়ি-গয়না চমকাচ্ছে, ফুল, এসেন্স, মশলা দেওয়া পান আর সিগারেটের গন্ধে ভরে গেছে চারিদিক। রাস্তার ধারে ঝুড়ি বোঝাই করে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে কলাপাতা, মাটির গ্লাস, এঁটো খাবার। তল্লাটের যত কুকুর জড় হয়েছে সেখানে—চিৎকার আর মারামারি চলছে।

এরই মধ্যে একজনের চোখ পড়ল। গেট থেকে একটু সরে এসে, দেওয়ালের সঙ্গে শরীরটাকে প্রায় মিলিয়ে দিয়ে একটি বারো-তেরো বছরের ছোট ছেলে।

—কী খোকা, তুমি যে এখানে দাঁড়িয়ে ?

ছেলেটি ম্লান চোখ তুলে ধরল।

—মা ভেতরে খেতে গেছে। এলে এক সঙ্গে যাব।

—তুমি খেয়েছ তো ?

মাথা নেড়ে ছেলেটি জানালো, সে খেয়েছে।

—তাহলে মুখ অমন শুকনো কেন ? পেট ভরে খাওনি বুঝি ?

—পেট ভরেই খেয়েছি।

—রান্না ভালো হয়েছিল ?

—খুব ভালো।

সেই সময় বাড়ির সামনে একটা বড় মোটর থামল। নামলেন মোটাসোটা এক ভদ্রলোক, গায়ে সিল্কের চাদর পাঞ্জাবী, চকচকে জুতো। সঙ্গে আরো মোটা তাঁর স্ত্রী—সারা মুখটা পাউডারের গামলায় যেন চুবিয়ে আনা হয়েছে—কানে জ্বলছে হীরের গয়না। দু-তিনটে গোলগাল ছেলেমেয়েও নামল রঙীন প্রজাপতির মত—হাতে তাদের ফুল আর উপহারের বাক্স।

—আরে-আরে, এই তো মল্লিকমামা এসে পড়েছেন। আসুন—আসুন—এত দেরি যে ?—লোকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে মোটরের দিকে ছুটলেন। ছেলেটির কথা আর তাঁর মনেও রইল না।

সে তার মায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

ছেলেটির কলেজে-পড়া পিসিমা আর থাকতে পারল না। ছুটে এল বড় ভাইয়ের ঘরে।

—রুণুকে নিয়ে তো আর পারছি না দাদা। রাতে কখন টুপ করে বেরিয়ে যায়—পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে যেখানে-সেখানে। বলে, 'আমার মা-র জন্যে অপেক্ষা করছি।'—পিসিমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল : তুমি আবার বিয়ে করো দাদা—ওর মা এনে দাও। ছেলেটা যে পাগল হয়ে গেল।

রুণুর অধ্যাপক বাবা পড়ার টেবিল থেকে মুখ তুললেন এবার। দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল সামনের দেওয়ালে।

স্ত্রীর বড় ছবিটার গলায় শুকনো মালাছড়া হাওয়ায় দুলছে। হাসিতে উজ্জ্বল একটি সুন্দর মুখ। সে মুখে সৌভাগ্যের দীপ্তি, বেঁচে থাকার আনন্দ। একটা ছোট অপারেশন করতে গিয়ে এক বছর আগে সে যে এমন করে হারিয়ে যাবে—এ কথা বিশ্বাসও করা যায় না।

বোন চোখ মুছতে মুছতে বললে, দাদা, নিজের বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে থাকলেই চলবে? একটা মাত্র ছেলের দিকে ফিরেও তাকাবে না? দোহাই তোমার—ওকে মা এনে দাও।

রুণুর বাপ জবাব দিলেন না। আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন টেবিলে। এখনো রুণুর মন থেকে তার মা হারায়নি—এখনো একটা অসম্ভব আশা নিয়ে ভাবে—যে-কোনো জায়গা থেকে যে-কোনো সময় তার মা এসে হয়তো বলবে—এই তো রুণু, এই যে আমি এসে গেছি।

কিন্তু নতুন মা এলে মা-কে সে হারিয়ে ফেলবে না তো? হারিয়ে ফেলবে না চিরদিনের মত?

আর রুণু তখন শেয়ালদা স্টেশনের গেটের সামনে। টিকেট কালেক্টারের প্রশ্নের উত্তরে তেমনি ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বলছে : আমার মা আসবে পরের ট্রেনে, তাই অপেক্ষা করছি। মা আবার একলা ফিরতে পারবে না কিনা!

ক্রিকেট মানে ঝিঁঝি

ডেসিম্যালের পরে আবার একটা ভেক্কুলাম, তার সঙ্গে ভগ্নাংশ। এমন জটিল জিনিসকে সরল করা অন্তত আমার কাজ নয়। পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে সিঙি মাছের ঝোল খাই—এ-সব গোলমালের মধ্যে পা বাড়িয়ে আমার কী দরকার?

পণ্ডিতমশায় যখন দাঁত খিচিয়ে লৃট-লুঙকে মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করেন, তখন আমি আকুল ভাবে 'ঘিনুণ' আর 'আলু' প্রত্যয়ের কথা ভাবতে থাকি। ওর সঙ্গে যদি 'দাদখানি চাল' প্রত্যয় থাকত—তাহলে আর কোন দুঃখ থাকত না। তবে 'চাঁটি' আর 'গাঁট্টা' প্রত্যয়গুলো বাদ দেওয়া দরকার বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু অঙ্ক আর সংস্কৃতর ধাক্কা যদি বা সামলানো যায়—ক্রিকেট খেলা ব্যাপারটা আমার কাছে স্রেফ রহস্যের খাসমহল। 'ক্রিকেট' মানে কী? বোধহয় ঝিঁঝি? দুপুরের কাটফাটা রোদ্দুরে চাঁদিতে ফোস্কা পড়িয়ে ওসব ঝিঁঝি খেলা আমার ভাল লাগে না। মাথার ভেতরে ঝিঁঝি করতে থাকে আর মনে হয়—মস্ত একটা হাঁ করে কাছে কেউ ঝিঁঝিট খাম্বাজ গাইছে। অবশ্য ঝিঁঝিট খাম্বাজ কী আমার জানা নেই—তবে আমার মনে হয় ক্রিকেট অর্থাৎ ঝিঁঝি খেলার মতোই সেটাও ভয়াবহ।

অথচ কী গেরো দ্যাখো! পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাকেই ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে। গোড়াতেই কিন্তু বলে দিয়েছিলুম—ওসব আমার আসে না। আমি খুব ভাল 'চিয়ার আপ' করতে পারি, দু-এক গেলাস লেমন কোয়াশও নয় খাব ওদের সঙ্গে—এমনকি লাঞ্চ খেতে ডাকলেও আপত্তি করব না। কিন্তু ও-সব খেলা-টেলার ভেতরে আমি নেই—প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু প্রাণ যাওয়ার আগেই কান যাওয়ার জো! আমাদের পটলডাঙার টেনিদাকে মনে আছে তো? সেই খাঁড়ার মতো উঁচু নাক আর রণডম্বরুর মতো গলা—যার চরিতকথা তোমাদের অনেকবার শুনিয়েছি? সেই টেনিদা হঠাৎ গাঁক-গাঁক করে তার আধ মাইল লম্বা হাতখানা আমার কানের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—খেলবিনে মানে? খেলতেই হবে তোকে। বল করবি—ব্যাট করবি—ফিল্ডিং করবি—ধাঁই করে আছাড় খাবি—মানে যা যা দরকার সবই করবি। সই না করিস, তোর ঐ গাধার মতো লম্বা লম্বা কানদুটো একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে নেব—এই পাকা কথা বলে দিলুম!

গণ্ডারের মতো নাকের চাইতে গাধার কান ঢের ভাল, আমি মনে মনে বললাম। গণ্ডারের নাক মানে লোককে গুঁতিয়ে বেড়ানো, কিন্তু গাধার কান ঢের কাজে লাগে—অন্তত চটপট করে মশা মাছি তো তাড়ানো যায়!

কিন্তু সেই কানদুটোকে টেনিদার হাতে বেহাত হতে দিতে আমার আপত্তি আছে। কী করি, খেলতে রাজি হয়ে গেলাম।

তা, প্যান্ট-ট্যান্ট পরতে নেহাত মন্দ লাগে না। বেশ কায়দা করে বুক চিতিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা বললে, তোকে খাসা দেখাচ্ছে প্যালা!

—সত্যি?

একগাল হেসে ওকে একটা চকোলেট দিতে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললে—বেগুনক্ষেতে কাকতাড়ুয়া দেখেছিস? ঐ যে মাথায় কেলে হাঁড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকে? হুবহু তেমনি মনে হচ্ছে তোকে। আমি ক্যাবলাকে একটা চাঁটি দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তার আর দরকার হল না। হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে—'আর তোরে ক্যামন দেখাইতে আছে? তুই তো বজ্রবাঁটুল—পেন্টুল পইর‍্যা ্যান চালকুমড়া সাজছস!'

ক্যাবলা স্পীকটি নট। একেবারে মুখের মতো। আমি খুশি হয়ে চকোলেটটা হাবুল সেনকেই দিয়ে দিলাম।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন টেনিদার হুঙ্কার শোনা গেল—এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ভাজছিস প্যালা? প্যাড পর—দস্তানা পর—তোকে আর ক্যাবলাকেই যে আগে ব্যাট করতে হবে।

আমাকে দিয়েই শুরু! পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলেটা ধপাৎ করে লাফিয়ে উঠল একবার।

টেনিদা বললে, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? যেই বল আসবে ঠাঁই করে পিটিয়ে দিবি। অ্যায়সা হাঁকড়াবি যে এক বলেই ওভার বাউণ্ডারি—পারবি না?

www.boiRboi.blogspot.com

—পারা যাবে বোধহয়—কান-টান চুলকে আমি জবাব দিলাম।

—বোধহয় নয়, পারতেই হবে। তাড়াতাড়ি যদি আউট হয়ে যাস, তোকে আর আমি আস্ত রাখব না! মনে থাকবে?

এর মধ্যে হাবুল সেন আমার পায়ে আবার প্যাড পরিয়ে দিয়েছে, সেইটে পরে, হাতে ব্যাট নিয়ে দেখি নড়াচড়া করাই শক্ত!

কাতর স্বরে বললাম: হাঁটতেই পারছি না যে! খেলব কী করে?

—তুই হাঁটতে না পারলে আমার বয়েই গেল! টেনিদা বিচ্ছিরি রকম মুখ ভ্যাংচালো: বল মারতে পারলে আর রান নিতে পারলেই হল!

—বা রে, হাঁটতেই যদি না পারি, তবে রান নেব কেমন করে?

—মিথ্যে বকাসনি প্যালা—মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার। হাঁটতে না পারলে দৌড়োনো যায় না? কেন যায় না—শুনি? তাহলে মাথা না থাকলেও কী করে মাথাব্যথা হয়? নাক না ডাকলেও লোকে ঘুমোয় কী করে? যা—যা, বেশি ক্যাঁচম্যাচ করিস নি! মাঠে নেমে পড়!

একেবারে মোক্ষম যুক্তি।

নামতেই হল অগত্যা। খালি মনে মনে ভাবছি প্যাড-ফ্যাড-শুদ্ধু পড়ে না যাই! ব্যাটটাকে মনে হচ্ছে ভীমের গদার মতো ভারি—আগে থেকেই তো কব্জি টনটন করছে! আমি ওটাকে হাঁকড়াব না ওটাই আমায় আগে হাঁকড়ে দেবে—সেইটেই ঠাহর করতে পারছি না।

তাকিয়ে দেখি, পেছনে আর দু-পাশে খালি চোরবাগান টাইগার ক্লাব! ওদের সঙ্গেই ম্যাচ কিনা!

কিন্তু এ আবার কী রকম ঝিঁঝি খেলা? ফুটবল তো দেখেছি সমানে সমানে লড়াই—এ ওর পায়ে ল্যাং মারছে—সে তার মাথায় ঢুঁ মারছে—আর বল সিধে এসপার ওসপার করবার জন্যে দুই গোলকীপার দাঁড়িয়ে আছে ঘুঘুর মতো। এ পক্ষের একটা চিত হলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও পক্ষের আর-একটা কাত। সে একরকম মন্দ নয়।

কিন্তু এ কী কাপুরুষতা! আমাদের দু-জনকে কায়দা করবার জন্যে ওরা এগারো জন! সেইসঙ্গে আবার দুটো আমপায়ার! তাদের পেটে পেটে যে কী মতলব তা-ই বা কে জানে! আমপায়ারদের গোল গোল চোখ দেখে আমার তো প্রায় ভ্যামপায়ার বলে সন্দেহ হল!

তারপরে লোকগুলোর দাঁড়িয়ে থাকার ধরণ দ্যাখো একবার! কেমন নাড়ুগোপালের মতো নুলো বাড়িয়ে উবু হয়ে আছে—যেন হরির লুটের বাতাসা ধরবে! সব দেখে-শুনে আমার রীতিমতো বিচ্ছিরি লাগল।

এই রে—বল ছোড়ে যে! ব্যাট নিয়ে হাঁকড়াতে যাব—প্যাড-ট্যাড নিয়ে উলটে পড়ি আর কি! বলটা কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল দমদম বুলেটের মতো—একটু হলেই কানটা উড়িয়ে নিত। একটা ফাঁড়া তো কাটল! কিন্তু ওকি? আবার ছোড়ে যে!

জয় মা ফিরিঙ্গি পাড়ার ফিরিঙ্গি কালী! যা হোক একটা কিছু এবার হয়ে যাবে! বলি দেবার খাঁড়ার মতো ব্যাটটাকে মাথার ওপর তুলে হাঁকিয়ে দিলাম। বলে লাগল না···স্রেফ পড়ল আমার হাঁটুর ওপরে। নিজের ব্যাটাঘাতে বাপরে বলে বসে পড়তেই দেখি, বলের চোটে স্টাম্প-ফাম্পগুলো কোথায় উড়ে বেরিয়ে গেছে।

—আউট—আউট!

চারিদিকে বেদম চিৎকার। আমপায়ার আবার মাথার ওপরে একটা হাত তুলে জগাই-মাধাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে।

কে আউট হল? ক্যাবলা বোধহয়? আমি তক্ষুনি জানতাম, আমাকে কাক-তাড়ুয়া বলে গাল দিয়েছে—আউট না হয়ে যায় কোথায়!

www.boiRboi.blogspot.com

হাঁটুর চোটটা সামলে নিয়ে ব্যাট দিয়ে স্টাম্পগুলো সব ঠিক করতে যাচ্ছি—হঠাৎ হতচ্ছাড়া আমপায়ার বলে বসল—তুমি আউট, চলে যাও।

আউট? বললেই হল? আঁউট হবার জন্যেই এত কষ্ট করে প্যাড আর পেন্টলুন পরেছি নাকি? আচ্ছা দ্যাখো একবার! বয়ে গেছে আমার আউট হতে!

বললাম, আমি আউট হব না। এখন আউট হবার কোন দরকার দেখছি না আমি।

আমি ঠিক বুঝেছিলাম ওরা আমপায়ার নয়, ভ্যামপায়ার। কুইনিন চিবোনোর মতো যাচ্ছেতাই মুখ করে বললে: দরকার না থাকলেও তুমি আউট হয়ে গেছ। স্টাম্প পড়ে গেছে তোমার।

—পড়ে গেছে তো কী হয়েছে—আমি রেগে বললাম, আবার দাঁড় করিয়ে দিতে কতক্ষণ? ওসব চালাকি চলবে না স্যার—এখনো আমার ওভার বাউণ্ডারি করা হয় নি!

কেন জানি না, চারিদিকে ভারি যাচ্ছেতাই একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। চোরবাগান ক্লাবের লোকগুলোই বা কেন যে এরকম দাপাদাপি করছে, আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

তার মধ্যে আবার চালকুমড়ো ক্যাবলাটা ছুটে এল ওদিক থেকে।

—চলে যা—চলে যা প্যালা! তুই আউট হয়ে গেছিস।

আর কতক্ষণ ধৈর্য থাকে এ অবস্থায়? আমি চেঁচিয়ে বললাম, তোর ইচ্ছে থাকে তুই আউট হ-গে! আমি এখন ওভার বাউণ্ডারি করব!

আমার কানের কাছে সবাই মিলে তখন সমানে কিচির-মিচির করছে। আমি কান দিতাম না—যদি না কটাং করে আমার কানে টান পড়ত।

তাকিয়ে দেখি—টেনিদা।

ধাঁই করে আমার কাছ থেকে ব্যাট নিয়ে কানে একটা চিড়িং মেরে দিল—তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

—যা—গা উল্লুক! বেরো মাঠ থেকে। খুব ওস্তাদি হয়েছে, আর নয়!

রামছাগলের মতো মুখ করে অগত্যা আমায় চলে যেতে হল। মনে মনে বললাম, আমাকে আউট করা! আউট কাকে বলে সে আমি দেখিয়ে দেব!

গিয়ে তো বসলাম—কিন্তু কী তাজ্জব কাণ্ড! আমাদের দেখিয়ে দেবার আগেই চোরাবাগানের টাইগার ক্লাব আউট দেখিয়ে দিচ্ছে। কারুর স্টাম্প উল্টে পড়েছে, পেছনে যে লোকটা কাঙালী-বিদায়ের মতো করে হাত বাড়িয়ে বসে আছে, সে আবার খুট্‌স করে স্টাম্প লাগিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা মারবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে বল লুফে নিচ্ছে। খালি আউট—আউট—আউট! এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা!

আমাদের পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব ব্যাট বগলে যাচ্ছে আর আসছে। এমন যে ডাকসাইটে টেনিদা, তারও বল একটা রোগাপটকা ছেলে কটাৎ করে পাকড়ে নিলে। হবেই তো! এদিকে মোটে দু-জন—ওদিকে এগারো, সেইসঙ্গে আবার দুটো আমপায়ার। কোন ভদ্দরলোকে ঝিঁঝি খেলতে পারে কখনো!

ঐ চালকুমড়ো ক্যাবলাটাই টিকে রইল শেষ-তক। কুড়ি না একুশ রান করল বোধহয়। পঞ্চাশ রান না পেরুতেই পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব বেমালুম সাফ।

এইবার আমাদের পালা। ভারি খুশি হল মনটা। আমরা এগারো জন এবারে তোমাদের নিয়ে পড়ব। আমপায়ার দুটোও দেখি ওদের দল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে ভিড়েছে। কিন্তু ওদের মতলব ভাল নয় বলেই আমার বোধ হল।

ক্যাপ্টেন টেনিদাকে বললাম, আমপায়ারদুটোকে বাদ দিলে হয় না? ওরা নয় ওদের সঙ্গেই ব্যাট করুক?

টেনিদা আমাকে রদ্দা মারতে এল। বললে, বেশি ওস্তাদি করিস নি প্যালা ? ওখানে দাঁড়া। একটা ক্যাচ ফেলেছিস কি ঘ্যাচ করে কান কেটে দেব। ব্যাট তো খুব করেছিস—এবার যদি ঠিকমতো ফিল্ডিং করতে না পারিস, তাহলে তোর পালাজ্বরের পিলে আমি আস্ত রাখব না !

হাবুল সেন বল করতে গেল।

প্রথম বলেই—ওরে বাপরে ! টাইগার ক্লাবের সেই রোগা ছোকরাটা কী একখানা হাঁকড়ালে ! বোঁ করে বল বেরিয়ে গেল, একদম বাউণ্ডারি। ক্যাবলা প্রাণপণে ছুটেও রুখতে পারলে না।

পরের বলেও আবার সেই হাঁকড়ানি। তাকিয়ে দেখি কামানের গুলির মতো বলটা আমার দিকেই ছুটে আসছে।

একটু দূরেই ছিল আমাদের পাঁচুগোপাল। চেঁচিয়ে বললে, প্যালা—ক্যাচ—ক্যাচ—

—ক্যাচ ! ক্যাচ ! দূরে দাঁড়িয়ে ওরকম সবাই-ই ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করতে পারে ! ঐ বল ধরতে গিয়ে আমি মরি আর-কি ! তার চাইতে বললেই হয়, পাঞ্জাব মেল ছুটছে প্যালা লুফে নে ? মাথা নিচু করে আমি চুপ করে বসে পড়লাম—আবার বল বাউণ্ডারি পার।

হৈ হৈ করে টেনিদা ছুটে এল।

—ধরলি নে যে ?

—ও ধরা যায় না !

—ধরা যায় না ? ইস—এমন চমৎকার ক্যাচটা, এক্ষুনি আউট হয়ে যেত !

—সবাইকে আউট করে লাভ কি ? তাহলে খেলবে কে ? আমরাই তো আউট হয়ে গেছি—এখন খেলুক না ওরা !

—খেলুক না ওরা !—টেনিদা ভেংচি কাটল—তোর মতো গাড়োলকে খেলায় নামানোই আমার ভুল হয়েছে ! যা—যা—বাউণ্ডারি লাইনে চলে যা !

চলে গেলাম। আমার কী ! বসে বসে ঘাসের শীষ চিবুচ্ছি। দুটো একটা বল এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, ধরার চেষ্টা করেও দেখলাম। বোঝা গেল, ওসব ধরা যায় না। হাতের তলা দিয়ে যেমন শোল মাছ গলে যায়—তেমনি সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে পিছলে বাউণ্ডারি লাইন পেরিয়ে যেতে লাগল।

আর সাবাস বলতে হবে চোরাবাগান টাইগার ক্লাবের ঐ রোগা ছোকরাকে ! ডাইনে মারছে, বাঁয়ে মারছে, চটাং করে মারছে, শাঁই করে মারছে, ধাঁই করে মারছে ! একটা বলও বাদ যাচ্ছে না। এর মধ্যেই বেয়ালিশ রান করে ফেলেছে একাই। দেখে ভীষণ ভাল লাগল আমার। পকেটে চকোলেট থাকলে দুটো ওকে আমি খেতে দিতাম।

হঠাৎ বল নিয়ে টেনিদা আমার কাছে হাজির।

—ব্যাটিং দেখলাম, ফিল্ডিংও দেখছি। বল, করতে পারবি ?

এতক্ষণ ঝিঁঝি খেলা দেখে আমার মনে হয়েছিল—বল করাটাই সবচেয়ে সোজা। একপায়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম—খুব পারব। এ আর শক্তটা কী ?

—ওদের ঐ রোগাপটকা গোঁসাইকে আউট করা চাই। পারবিনে ?

—এক্ষুনি আউট করে দিচ্ছি—কিছু ভেবো না !

আমি আগেই জানি, আমপায়ারদুটোর মতলব খারাপ। সেইজন্যেই আমাদের দল থেকে ওদের বাদ দিতে বলেছিলাম—টেনদা কথাটা কানে তুলল না। যেই প্রথম বলটা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে বললে—নো বল !

নো বল তো নো বল—তোদের কী ! বলতেও যাচ্ছিলাম, কিন্তু গোঁসাই দেখি আবার ধাঁই করে হাঁকড়ে দিয়েছে, বাউণ্ডারি তো তুচ্ছ—একেবারে ওভার বাউণ্ডারি !

আর চোরাবাগান টাইগার ক্লাবের সে কী হাততালি ! একজন তো দেখলাম আনন্দে ডিগবাজি খাচ্ছে !

এইবার আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে আগুন জ্বলে গেল। মাথায় টিকি নেই—যদি থাকত, নিশ্চয় তেজে রেফের মতো খাড়া হয়ে উঠত। বটে—ডিগবাজি ! আচ্ছা—দাঁড়াও ! বল হাতে ফিরে যেতেই ঠিক করলাম—এবার গোঁসাইকে একেবারে আউট করে দেব ! মোক্ষম আউট !

প্যাডটা বোধহয় ঢিলে হয়ে গেছে—গোঁসাই পেছন ফিরে সেটা বাঁধছিল। দেখলাম, এই সুযোগ। ব্যাট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালে কিছু করতে পারব না—এই সুযোগেই কর্ণবধ !

মামার বাড়িতে আম পেড়ে পেড়ে হাতের টিপ হয়ে গেছে—আর ভুল হল না। আমপায়ার না ভ্যামপায়ার হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই বোঁ করে বল ছুঁড়ে দিলাম।

নির্ঘাৎ লক্ষ্য ! গোঁসাইয়ের মাথায় গিয়ে খটাং করে বল লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই—'ওরে বাবা !' গোঁসাই মাঠের মধ্যে ফ্ল্যাট !

আউট যাকে বলে ! অন্তত এক হপ্তার জন্যে বিছানায় আউট !

আরে—একি, একি ! মাঠশুদ্ধ লোক তেড়ে আসছে যে ! 'মার মার' করে আওয়াজ উঠছে যে ! অ্যাঁ—আমাকেই নাকি ?

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। কান ঝিঁঝি করছে, প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এবারে টের পাচ্ছি—আসল ঝিঁঝি খেলা কাকে বলে !

www.boiRboi.blogspot.com

করিম মিঞা

সংক্ষেপ হইয়া গেল।

আজ সোমবার, এই গেল শুক্রবারের হাটেও লোকটা টাটকা এক চিতল মাছ কিনিয়াছিল। কিন্তু খালি মাছ কিনিলে চলে না। বাড়ীতে কাঠ নাই যে উনান ধরিবে। গৃহিণী তাই হাই হাই করিয়া পড়িলেন মাছ দেখিয়া। তাই আবার হাটে আসিতে হইল। দুই বোঝা কাঠ যতক্ষণ সে কুলির মাথায় চাপাইয়া ঘরে ফিরিয়াছে ততক্ষণে সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু গড়াইয়া গুইলেও উপায় নাই কুড়াল লইয়া কাঠ চিরিতে হইল। তাহার পরেই কেমন করিয়া দুর্ঘটনা। হঠাৎ হাত হইতে কুড়াল ফসকাইয়া এক চোট এবং এক মোক্ষম চ'টেই কুপকাৎ।

সে রত্রে দেখিতে দেখিতে হাত ঢোল হইয়া ফুলিয়া উঠিল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফটানি, চীৎকারে পাড়ার শান্তি ভঙ্গ করিয়া সারা রাত্রি তিনি ডাঙায় তোলা কাতলার ন্যায় আকুলি বিকুলি করিলেন। পরের দিন আসিলেন ডাক্তারখানায় গরুর গাড়ী চড়িয়া।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ডিস্পেনসারী দরিদ্র রোগীর জনতায় বেষ্টিত হইয়া ডাক্তার খগেন সেন অক্লান্ত শ্রমে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া যান। কাহারো পেটটেপা, কাহারো প্রতি কুঞ্চিত ভ্রূর কটিল দৃষ্টিক্ষেপ, কাহাকে বা ষ্টেথস্কোপের নির্দয় খোঁচায় ভীতসন্ত্রস্ত করিয়া তিনি জমজমবত

বিরাজমান। এমন সময় কাহার গাড়ী দরজায় দাঁড়াইল।

দর্শন মিলিল। ডাক্তার সেন নির্মম ভাবে হাতখানা বার দুই টিপিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন : অপারেশন। হইলও এবং সংক্ষেপে। তাহার পর আরো সংক্ষেপে। তৃতীয় দিন দুইটা দশ মিনিটে।

মরিল বলিয়া দুঃখ নাই। কিন্তু প্রাণে সে দারুণ দাগা লইয়া গেল। অমন সংকট মুহূর্তে ডাক্তার তাহার প্রতি যে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে তাহার মনে দারুণ একটা প্রতিশোধ স্পৃহা তাহাকে বারবার উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার ভারি আরাম লাগিতেছে। চমৎকার আরাম লাগিতেছে—অতি চমৎকার আরাম।

ঝরঝরে লঘু দেহ, ভারহীন স্বচ্ছ শরীর অনায়াসে কেমন চালিত করা যায় পরম বিস্ময় আনন্দে কয়েক মুহূর্ত সে অভিভূত হইয়া রহিল। ইচ্ছা হইল তিড়িং করিয়া খানিকটা লাফালাফি করিতে। ঐ তাল গাছের মাথায় শকুনের ছানা দুইটাকে শম্ভুমূদীর তেলের টিনে চুবাইয়া রাখিলে কেমন হয়। অথবা আকাশে উড্ডীয়মান ঐ চিলের লেজে একটা ছোট্ট বিড়ালছানা অতি সন্তর্পণে ঝুলাইয়া দিলে ঘটনাটা কেমন ঘটিবে দেখিবার জন্য তাহার মর্ন অত্যন্ত লোলুপ হইয়া উঠিল।

কিন্তু দুত্তোর, এ কী বাজে ছেলেমানুষী চিন্তা কাজের কথা ফেলিয়া বাজের আরাধনা।

ডাক্তার ডিষ্টিক্ট বোর্ডের মাহিনা করা ডাক্তার। অহঙ্কার আর আত্মমর্যাদার ফানুসে যে লোকটা ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া থাকে সেই নৃশংস ডাক্তারকে সে একবার দেখিয়া নিবে। অবিচলিত নির্মম হাতে সে অতবড় ফুলাটা ছুরি চালাইয়া সমানে হাতটা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছে। তাহার কাতর আর্তনাদে সহানুভূতির পরিবর্তে বারম্বার হুঙ্কার আর তিরস্কার। —উঃ, অসহ্য—অসহ্য। আবেগে তিড়িং করিয়া গা ঝাড়া দিয়া করিম মিঞা কবর হইতে লাফাইয়া উঠিল—পরে আসিল সোজা ডিস্‌পেনসারীর বারান্দায়। কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। জনতার ভীড়ে সে অদৃশ্য এবং অস্পৃশ্য, কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। অসীম অনুকম্পা লইয়া করিম মিঞা একটা খালি চেয়ারে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল।

ডাক্তার অবিরাম সিগারেট টানিয়া খস খস লিখিয়া যান। মাঝে মাঝে নতুন রুগীর টিকিট কাটিয়া পয়সা পকেটে ফেলে দেন, রোগীর ভীড় ক্রমে বাড়িতে থাকে। কম্পাউন্ডার অক্লান্ত হস্তে, নিঃশব্দে ওষুধ সরবরাহ করে, দুরাগত গ্রামের রোগী বিস্ময় কৌতূহলের রহস্য মিশ্রিত দৃষ্টি ফেলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া নীরবে চাহিয়া থাকে।

ভৃত্য মাথুর চা লইয়া আসিল।

অকস্মাৎ করিম মিঞা কী মনে করিয়া নীরবে নিদারুণ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। হাসি আসিলে খানিক চিন্তা করিয়া আবার হাসিতে লাগিল। আবার হাসি, আবার চিন্তা। হ্যাঁ, ঠিক গ্লানিময় জগতের মোহ সে ছাড়িয়া আসিয়াছে। এখানে আসিয়াও যদি পরের অনিষ্ট আর হিংসার প্রশ্রয় সে দেয় তাহা হইলে কী আর উন্নত স্তরের হইল সে? ডাক্তারকে সে ক্ষমা করিয়াছে। শুধু চলিয়া যাইবার আগে একটু রসিকতা, অনাবিল নির্দোষ রসিকতা করিয়া যাইবে।

সাথে সাথে টুপ করিয়া একটি শব্দ। চায়ের কাপে একটি কুইনাইনের বড়ি।

একটি ছেলে অদূরে বলির পাঁঠার ন্যায় কাঁপিতেছিল, ডাক্তার জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন : ইধার আও। ডর মৎ করো। তাহার হাতে ইনজেকসনের সিরিঞ্জ।

ছোকরা সুপুষ্ট উদরে হাত বুলাইয়া করুণ নেত্রে সিরিঞ্জের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ডাক্তার ধৈর্য ক্ষণভঙ্গুর এবং স্বর ক্রমবর্ধমান। বৃথা সময়ের অপব্যবহার তিনি সইতে

পারেন না। চেয়ার ঠেলিয়া হিড়হিড় করিয়া আসামীকে টানিয়া আনিলেন। পাশের টুলে বসাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন : হতভাগা বজ্জাত।

ভয়ে সে কাঁদিতে পারিল না কাঁপিতে লাগিল। ইনজেকসনের ভয়ানক কাণ্ডটা তাহাকে না দেখিতে হয় তাই গামছা দিয়া সজোরে চোখ ঢাকিয়া রাখিল।

ডাক্তার ইউরিয়া ষ্টিবাসিনের ফাইল খুলিয়া কিন্তু বিস্মিত হইলেন। সব ফাইল টিউবের মুখ খোলা—কোথাও ওষুধ নাই। ডাক্তার ডাকিলেন : কম্পাউন্ডার— ?

আসিলেনতিনি। কিন্তু একি অদ্ভুত বেশ। কপালে বরিক পাউডারের ত্রিপুণ্ডক উভয় গালে রসকলি তিলক আকারে একটা লোহিত বর্ণের জলীয় পদার্থের বিন্দু ফোঁটা। খানিকটা কালি লেপিয়া ওষ্ঠের নিম্নদেশে অতি চমৎকার অঙ্কিত একটি নূর। ডাক্তার কহিলেন : এ কী ? মাথা খারাপ হল নাকি আপনার ?

মানে ?

তাকিয়ে দেখুন একবার আয়নার দিকে। "যত সব"—বলিয়া কী মনে করিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়াই গর্জন করিয়া উঠিলেন : মাথুর।

সে গর্জনে আসন্ন বিপদ। প্রতীক্ষমান চোখ বাঁধা অসহায় ছোকরা মনে মনে প্রমাদ ঘটিল এবং হঠাৎ ভয় পাইয়া ঝপাৎ করিয়া সশব্দে নীচে ছিটকাইয়া পড়িল। ততক্ষণে মথুর ছুটিয়া আসিল।

এবং তাহার পরেই হুলুস্থুল ধুন্দমার কাণ্ড।

চা তৈরী করিতে অপারগ বলিয়া ডাক্তার কন্যা তিরস্কৃত হইয়া শয্যা লইল—কিন্তু খাইল না। জ্বালাতনের অপরাধে ছোট মেয়েটা মার খাইল। কম্পাউণ্ডারের অমনোযোগ এবং অন্যায়ের প্রচুর উদাহরণসহ দীর্ঘ লিপি ডাকঘরে পড়িল এবং ডাক্তার রাগে গর গর করিতে করিতে তাঁহার অতিপ্রিয় দাবার ছক দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং এবার তাঁহার রাগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল।

অদূরে হরিদ্রাভ দন্তে হাস্যের দীপ্তি তুলিয়া করিম মিঞা এ সব দেখিয়া প্রচুর আনন্দ পাইতে লাগিল।

---

*লেখাটি দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত। মাত্র ৭/৮ বৎসরের ছেলের পক্ষে এ ধরণের লেখা পরবর্তী কালের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের চিন্তার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালের টেনিদার গল্পের কৌতুকপ্রিয়তার আঁচ পাওয়া যায় গল্পটিতে। লেখাটি ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত।

www.boiRboi.blogspot.com

ডক্টর জাকির হোসেন (স্মৃতিকথা)

আমাদের রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন কিছুদিন আগে দেহত্যাগ করেছেন, এ তোমরা সকলেই জানো। তাঁর জীবনী, তাঁর কীর্তি তাঁর মহত্বের খবরও তোমাদের অজানা নেই। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন মহান নেতা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ এবং আদর্শচরিত্র মানুষকে হারালো।

আমাদের এই ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-ক্রীশ্চান-পার্শী—যে কোনো ধর্মের, যে কোনো বিশ্বাসের মানুষের এখানে সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। আর ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে তো তাই। রবীন্দ্রনাথের 'ভারত-তীর্থ' কবিতাটি তোমরা নিশ্চয় পড়েছ, হয়তো গানও শুনেছ। আমাদের এই দেশ এক মহাতীর্থ। সব ধর্ম, সব জাতি, সব দেশের মানুষ যুগে যুগে এখানে মিলে গিয়ে যে মহামানবতাকে গড়ে তুলেছে—যে ঐক্য রচনা করেছে, তাই তো মনুষ্যত্বের আদর্শ হওয়া উচিত।

আমরা ভুল করি তখনই—যখন বাইরের কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানকেই আমরা ধর্ম বলে ভাবি। তাই নিয়ে হানাহানি করি, কাটাকাটি করি, ভাইয়ের রক্তে মাটি ভিজিয়ে দিই। এর চাইতে বড়ো অন্যায় আর নেই—এত বড়ো অপরাধ আর হতেই পারে না। কিন্তু 'ধর্ম' শব্দের অর্থই হল ঃ 'যা ধরে রাখে'—মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়ে এক করে, সকলকে ভালোবাসতে শেখায়।

সম্রাট অশোকের কথা তো জানো। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর যে-সব শিলালিপি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়—সব ধর্মের মানুষকে তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন, সমান সম্মান দিয়েছেন। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন বিখ্যাত মুসলিম কবি ও সাধক সন্ত কবীর—তাঁর বাণীই হল ঃ 'এক রাম রহিম'। রামে-রহিমে কোনো তফাত নেই। কবীরের জীবন ছিল অসাম্প্রদায়িকতার একেবারে আদর্শ। ভারতের আর একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে সারা দেশের সব ধর্মমতকে মিলিয়ে একটি মানবতারই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাই। মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত জীবনের সাধনাও এই—আর রবীন্দ্রনাথকে তোমরা তো জানোই।

এঁরা সবাই ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু ধর্মের বাইরের রূপটাকেই একমাত্র সত্য বলে মানতেন না। তাই এঁরা মানুষে মানুষে কোন ভেদ রাখেননি, কোনে সাম্প্রদায়িক নীচতাকে প্রশ্রয় দেননি। এঁরা জানতেন—বাইরে থেকে যত তফাতই থাক, সব ধর্মের মূল কথাই হল মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণের জন্যে জীবন উৎসর্গ করে দেওয়া।

আমাদের রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তাঁর জীবনের প্রধান অংশই কেটেছে শিক্ষাবিদ এবং স্বদেশকর্মী রূপে। শিক্ষাদাতা জাকির হোসেন চিরকাল তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছেন ধর্মের এই সার কথাটি : সাম্প্রদায়িকতার কদর্য ভুলকে কখনো প্রশ্রয় দিয়ো না—মানুষকে ভালোবাসো—স্বদেশের কল্যাণ করো—জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সেবা করে ধন্য হও।

এমন মানুষই তো বিশাল দেশ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্য।

ডক্টর জাকির হোসেন চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর মহত্বের মৃত্যু নেই। আমরা চিরদিন তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারব।

www.boiRboi.blogspot.com

ছোটবেলার স্মৃতি (আত্মজীবনী)

১৩২৫ সালে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের বালিয়াডিঙিতে আমার জন্ম। আদি বাড়ি বরিশালের নলচিরায় নিজের লেখা গল্প লেখার গল্প ২৫শে নভেম্বর ১৯৪৫ সালে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত। তাতেও নিজের কথা বলেছিলাম। আমার গল্প লেখার ইতিহাস অবশ্য আছে। কিন্তু কি ইতিহাস বলব? পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন নিজের বিচিত্র স্বপ্নাতুর কৈশোর জীবনটাকে দেখতে পাই, তখন গল্প লেখার ব্যাপারটা নিজের কাছেই যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর মনে হয়।

বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। আজ নয়, বিশ থেকে ত্রিশ বছর আগে এবং সে সময়ের ওই সম্প্রদায়টার সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে দেবীটি আর যিনিই হোন তিনি যে সরস্বতী নন সে সম্বন্ধে বোধহয় সাক্ষী প্রমাণ দরকার হবে না। শুনেছি সে যুগে বেশী পড়াশুনো বা ভালো ইংরিজি লেখার ক্ষমতাটা পুলিশ বিভাগে অযোগ্যতার নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হতো।

বাবা ছিলেন আশ্চর্য সুপুরুষ। যেমনি চেহারা তেমনি ধবধবে গায়ের রং—দীর্ঘ দেহ তেমনি নাক চোখ। মনে পড়ে শিবরাত্রের দিনে রাতে প্রহরে প্রহরে পুজো সেরে বাবা যখন পায়ে খড়ম—লাল রেশমের ধুতি পরে গায়ে শুভ্র উপবীত—খড়মের খট্ খট্ শব্দ তুলে আসতেন তখন একটা দেখবার জিনিস ছিল। তিনি যেমন সংযমী তেমনি নিষ্ঠাবান এবং ভারী সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং সে যুগের তাঁর বিদ্যা-মনীষা-সততা তাঁর চাকরীর ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু তাঁর চরিত্র সব দিক থেকেই ব্যতিক্রম ছিল। তিনি সবরকম অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারতেন। বাবা কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন। ছাত্র হিসেবে খুব ভালই ছিলেন। তাঁর পরিণত বয়সে যে স্মৃতিশক্তি দেখেছি তাতে চমৎকৃত না হয়ে পারেনি। বাবার চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। বাবাকে দেখেছি সেখানে দিনরাত পড়াশুনা করতে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে। তাঁকে অনায়াসে অনর্গল আবৃত্তি করতে শুনেছি। তাঁর ধারণা ছিল ইংরিজি সাহিত্য ভাল করে না পড়া থাকলে জীবনের অনেক জানাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সৎ সাহিত্য সব সময়েই পড়তে হবে।

সবরকম বই-এর ওপরেই তাঁর আগ্রহ গিল প্রবল। তাঁর বিরাট লাইব্রেরীতে মাসে মাসে নানা ধরনের বই আসতো। বাংলা দেশের যত রকমের দৈনিক সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকা ছিল সব কটারই তিনি গ্রাহক ছিলেন। শুধু গ্রাহকই ছিলেন না এক নিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন। আমাদের মত ছোটদের জন্যে আসতো অধুনা লুপ্ত খোকাখুকু, সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী। আজও আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগে এ লোকটি কেমন করে পুলিশের চাকরীতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। পড়াশুনা ছাড়া কোন সখই তাঁর ছিলনা। নেশা বলতেও ওই বই। পান, তামাক অস্পৃশ্য বোধ করতেন এবং জন ষ্টুয়ার্ট মিল থেকে মিলটন, সেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থের নির্ভুল উদ্ধৃতি মৃত্যুর আগেও তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

মনে পড়ে ত্রিশ মাইল দূর থেকে ডাকাতের আড্ডায় রেইড করে তিনি ফিরে আসছেন সম্রাটের মত বিজয় গৌরবে।—মাঠের ওপারে সাদা আরবী ঘোড়ার ওপরে দেখা যাচ্ছে ইউনিফরম পরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এই পুরো পাঁচ হাত মানুষটিকে। সহিস ছুটে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরল। জিনের থেকে সোজা নামলেন ওপর থেকে। নেমেই প্রথম প্রশ্ন : ভি· পি·

এসেছে। যদি শুনলেন এসেছে তবে কোন্‌টা এলো কোন্‌টা এলো না খুলে দেখতে লাগলেন। আর যদি শুনলেন আসেনি তা হলেই চিন্তিত হয়ে পড়তেন। কেন এল না—, কেন এত দেরী হচ্ছে জানবার জন্য ব্যগ্র হতেন। তখনও সারা গায়ে তাঁর উত্তরবঙ্গের লাল ধুলো—কপালে শ্বেত চন্দনের মত বিন্দু বিন্দু ঘাম। পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ। তবু সেই কৌতূহল।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা আসক্তি বা অনুরক্তি একান্তভাবে তা আমি বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। আমার ভাই বোনের মধ্যে আমি অষ্টম গর্ভের সন্তান। আমরা ছোটবেলায় দিনাজপুরেই থেকেছি —পাহাড়পুরে। ওখানকার সরকারী জেলা স্কুলের ছাত্র আমি। মনে পড়ে সেই দিনটির কথা যেদিন আমাদের হাতেখড়ি হলো।

আমি আর মেজদা পিঠেপিঠি ভাই। মেজদা আমার ওপরের ভাই—। পিঠেপিঠি বলে মেজদার সঙ্গে আমার দারুণ ভাব। কাউকে ছেড়ে কেউ থাকতে পারি না। হরিহর আত্মা।

সরস্বতী পুজোর দিন মেজদার হাতেখড়ি হবে। হাতেখড়ি হলেই মেজদা স্কুলে যাবে। আর আমি থাকবো পড়ে। সকাল থেকে আমি কান্না জুড়ে দিলাম :"ওরে আমারও হাতে পায়ে খড়ি দিয়ে দাও আমি মেজদার সঙ্গে স্কুলে যাব।"

আমার একটানা চিৎকার আর কান্নায় বাবা বিব্রত হয়ে গেলেন। রেগেমেগে বললেন : এখন স্কুলে যাবার জন্য কাঁদছিস পরে না যাবার জন্যে কাঁদবি। দাও গোপালের সঙ্গে নারুরও হাতেখড়ি। ও-ও যাক মেজদার সঙ্গে স্কুলে।

যথাসময়ে সহাস্যে খাতা বই নিয়ে স্কুলে চললাম মেজদার সঙ্গে। সেদিনের সে উত্তেজনা আমি কখনও ভুলব না। বর্ণ পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকালপক্কতা অর্জন করেছিলাম কিছুটা। খোকাখুকুর পাতায় আমার মন বসতো না। চুরি করে ভারতবর্ষের পাতা থেকে পড়তাম "শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" (গোড়াতে বইটার ওই নামই ছিল) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' কাগজ থেকে পড়তাম "স্বামী"। কতটুকু বুঝতাম জানি না। কিন্তু আশ্চর্য দোলা লাগতো মনে। এখন শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে উত্তর বাংলার নগণ্য একটা গ্রাম। আমাদের বাসার সামনে রক্তমঞ্জুরীতে কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটা আকুল হয়ে থাকতো—আর তার ওপর দিয়ে বয়ে যেত আত্রায়ের নীলধারা। তার ওপারে গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথ—ঘন বাঁশ আর আখের বনের ভেতর দিয়ে কোথায় যে দিকচিহ্নহীন দিগন্তে মিলিয়ে গেছে জানতাম না। আর সেই আশ্চর্য পটভূমিতে এই আশ্চর্য লেখাগুলো আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখতো। মনে হত এই অজানা পথটা আর এই লেখাগুলোর মধ্যে কী যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, কি যেন যাদু আছে— নইলে আমায় এমন পাগল করে রাখে কি করে?

পৈতে হবে আমাদের। এ সম্পর্কে ঠাকুমা ভারি তৎপর। ব্রাহ্মণ-বটুদের দণ্ড দিয়ে মারামারি করা বারণ। ঠিকমত জপ-সন্ধ্যা আহ্নিক হচ্ছে কিনা তদারক করা—ঠাকুমা আমাদের তাঁর মনের মত করে মন্ত্র পাঠ করাতেন : ক, কৃষ্ণায় নমঃ অমনি আমার প্রশ্ন কৃষ্ণা কি জিনিস ঠাকুমা।—কৃষ্ণো? বলার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুমা রেগে আগুন:ওটা তো "কৃষ্ণ"; সে যাইহোক আমি যা কই তাই ক।-ক—ক্যারক্যারায় নমঃ।—বলব না। ক্যারক্যারা আবার কি? ও তো কুমড়ো।ঠাকুমা রাগ করে বলতেন : পুঁথি লেখা পণ্ডিত আইচে।—এমনি করলে কি মন্ত্র পাঠ করা যায়। জন্মের সময় থেকেই আমার নাকে চশমা পড়ার দাগের মত একটা দাগ ছিল। তাই ঠাকুমা বলতেন "পুঁথি পড়া পণ্ডিত"।

পৈতের পর আমাদের ভারি কষ্ট। সব সময় পঞ্জিকা নিয়ে দেখি কবে একাদশী—। কার সায়ং সন্ধ্যা নাস্তি। নাক টিপে প্রাণায়াম করতে করতে জান যেন কয়লা হয়ে যেত।

ঠাকুমার প্রাণ ছিলাম আমরা। কিন্তু আমি ঠাকুমাকে বিরক্তও করতাম খুব। নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ বিধবা ঠাকুমার হবিষ্যি রান্নাঘরের গায়ে থাকতো আমার অস্ত্রাগার। মাছের নানা মাপের কাঁটা সাজিয়ে আমি সেখানে অস্ত্রাগার তৈরী করতাম। যখন ওটা ওঁর চোখে পড়তো রাগে দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করতেন : মর—মর। আমি যখন বলতাম : কি বলছো, আমাকে মরতে বললে? : অমনি ঠাকুমা কান্নায় ভেঙে পড়তেন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে : আমি কি তাই বলেছি—ষাট—ষাট। একশো বছর পরমায়ু হোক আমার মাথার যত চুল—

ও ঠাকুমা, তোমার মাথায় তো চুলই নেই। অমনি বৃদ্ধা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন। ঠাট্টাটুকুর রস তিনি আস্বাদন করতে পেরেছেন।

প্রথম লিখতে শুরু করি যখন আমরা মোটামুটি ভাবে স্থায়ী বাস্তু বেঁধেছি—দিনাজপুরে এসে। ইস্কুলের ছাত্র এবং নিচু ক্লাশে পড়ি। প্রথম সাহিত্যিকের আসক্তি জ্যামিতিক নিয়মে কাব্য চর্চার ওপর গিয়ে পড়লো।

আমার প্রথম হাতেখড়ি কবিতায়। কবিতা লিখি—কিন্তু কোথাও পাঠাই না। একদিন সাহস করে "মাসপয়লায়" একটি কবিতা পাঠিয়ে দিলাম। তখন মাসপয়লার খুব নামডাক। এর সম্পাদক ছিলেন ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য ও অখিল নিয়োগী।

কবিতাটি পাঠিয়ে অপেক্ষায় আছি—সম্পাদকের মতামতের জন্য হঠাৎ দেখি ১৩৩৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এবং আমি ছোটদের বিভাগের পুরস্কারটি পেলাম। কবিতাটির নাম "ডাক"—

ঘরের কোনে থাকতে বসে
চায় না যে আজ মন,
হাতছানি দে' ডাকে আমায়
মাঠ ঘাট, পথ বন।
অনেক দূরের তারার মালা
নীল আকাশের গায়,
মিটমিটিয়ে ডাকছে যেন
চোখের ইসারায়।
শন্‌শনিয়ে বাতাস যখন
দূরের পথে ধায়
সঙ্গে যেতে আমায় যেন
ডাকটি দিয়ে যায়।
লহর তুলে নদীর বারি
সাগর পানে ধায়,
সেও যেন ডাকছে আমায়
"আয়রে ওরে আয়"
আজ আমারে বিশ্বজগৎ
ডাক দিয়েছে ভাই,
সকল ছেড়ে আজকে আমি
বাইরে ছুটে যাই॥

আমি চিরকাল নিরালা মানুষ—কবিতা লেখায় হাত দিয়ে নিজেকে নিজে যেন আরো বেশী সংকুচিত করে ফেললাম। লেখা সম্পর্কে যেমন সংশয় ছিল তেমনি ছিল লজ্জা। অপরাধবোধ তো ছিলই। চোরের মত লিখতাম ছিঁড়ে ফেলতাম সঙ্গে সঙ্গেই। নিজের লেখার প্রতি বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না আমার।—ভাগ্যক্রমে সেটা আজও নেই।

www.boiRboi.blogspot.com

নিভৃত সাধনার জন্য নিভৃত স্থান দরকার। কোথায় পাওয়া যায় সেটা ? খুঁজতে খুঁজতে চমৎকার একটা জায়গা বার করলাম।—সে রকম সাহিত্য সাধনার রাজাসন পৃথিবীতে কারো জন্যে জুটেছে কিনা জানি না।

বাড়ীর এক পাশের বারান্দার ভাঙাচুরো কাঠ কুটরো আর কেরোসিনের কাঠের প্যাকিং বাক্সের একটা স্তূপ ছিল। শুধু স্তূপ বললে কম হয়, সেটা প্রায় ছাদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছিয়ে ছিল। তার নিচে বাগান থেকে সংগৃহীত কাঁঠালের একটা পিরামিড, তা থেকে নিঃসারিত হত অপূর্ব সুরভি। বাক্সগুলোর তলায় ইঁদুর স্বেচ্ছাসুখে বিচরণ করত। শব্দে আর গন্ধে বেশ মনোরম একটি পারিপার্শ্বিক যে সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ কী। আমি খাতা আর কলম নিয়ে সেই স্তূপের শিখরে আরোহণ করলাম। বাড়ি ভর্তি লোক।—আমি যেখানেই যাব কারু না কারু নজরে পড়েই যাব। তাই এমন একটা জায়গা বেছে বার করতে হলো সেখানে কারু নজর পড়বে না। সে জন্যেই এ জায়গাটার নির্বাচন। বাড়ীর লোকের নজরে সহজে পড়বো না, যদি হঠাৎ কেউ দেখেই ফেলতো অনুমান করতো কাঁঠাল খাচ্ছি।

আমাদের বাড়ীর পেছনে ছিল মস্ত বাগান। তাতে প্রচুর আম কাঁঠাল ফলতো। তাই কাঁঠাল সম্পর্কে বাড়ীর কারু কার্পণ্য ছিল না এবং ছোটবেলায় দিনাজপুরের ম্যালেরিয়ায় আর পেটের অসুখে এত ভুগতে হয়েছে যে আমাকে বাড়ীর সকলে ঈশ্বরের করুণার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে পেটে চিগড়িগে পিলে। কঙ্কালসার দেহ—তার ওপর পেটের দারুণ অসুখ। বাব মা এবং ঠাকুমা সে জন্যে আমাকে খরচের খাতায়ই লিখে রেখেছিলেন।

কিন্তু আমি কাঁঠাল খাব কি ? আমি তখন কাঁঠালের চাইতেও উঁচু দরের রসের সন্ধান পেয়েছি। কেরোসিন কাঠের বাক্সে গলা অবধি ডুবিয়ে দিয়ে বেদব্যাসের কলম চলছে। কবিতা, গান, রাজকুমার মেঘেজ্জিতের সঙ্গে রাজকন্যার সুবর্ণার প্রেম ও মহাযুদ্ধমূলক মহাকাব্য, একলব্যের গুরুভক্তি অবলম্বনে জ্বালাময়ী নাটক—তার খানিকটা গৈরীশী ছন্দে। নিজে পড়ি—নিজে ছিঁড়ি আবার নতুন করে লিখি। এটা আমার পরবর্তী কালেও ছিল। কোন লেখা লিখে আশাকে না শুনিয়ে আমি কখনও কোথায় ছাপতে পাঠাতাম না। কারুকে না শোনালে যেন আমি লিখে কোন তৃপ্তি পেতাম না। নিজের লেখা নিজে পড়ার মধ্যে নিজেকে নতুন করে আস্বাদন করবার একটা তৃপ্তি যেন ছিল তাতে।

রবিনসন ক্রুসোর মতো নিজের আবির্ভূত জগতের সীমা সংকীর্ণ হয়ে সৃষ্টি এবং তার বিনিময়ে আনন্দ একাধারে উপভোগ করে যাই।

তখনকার দিনে আনন্দ লহরী সিরিজের কতকগুলো রোমাঞ্চকর বই বেরুতো। সেগুলো আমি পড়ে ফেলেছিলাম। মাথার মধ্যে ক্রাইম নভেলগুলো একটা নতুন উন্মাদনা এনে দিল। আমার সাহিত্য সংসার থেকে একটা নতুন সাহিত্য পত্রিকা "চিত্র-বৈচিত্র্য" নাম দিয়ে বের করলাম। ছোটবেলার সেই দিনগুলো যেন ছিল একান্ত নিজের জন্য। সেখানে যে কারখানা তাতে যে সৃষ্টি হতো তা একেবারে একান্ত নিজের আনন্দের সৃষ্টি। সে সময়ের যেন আমি সম্রাট—একাধারে সবকিছু আমার রচনার ভাল মন্দ বিচার থেকে শুরু করে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রা পর্যন্ত—সবই আমি।

আমাদের দিনাজপুরের সেই বাড়ি। বাড়ির কথা মনে পড়লেই আগে মা'র কথা মনে পড়ে। মা ছিলেন সংসারের লক্ষ্মী প্রতিমার মত। ছায়ার মত নিঃশব্দে মা'র চলাফেরা ঘোমটার আড়ালে কখনও কখনও দেখা যেত তাঁর সুচিশুভ্র ললাটে সকালের আকাশের সূর্যের মত লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ। মা মস্ত বড় করে সিঁদুরের টিপ করতেন।

প্রবল প্রতাপান্বিত ঠাকুমার আদরের বৌমা ছিলেন মা। সকালে সূর্য ওঠবার আগে কখন মা

www.boiRboi.blogspot.com

ঘরের বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেন আমরা টেরও পেতাম না। আবার বেশী রাতে সমস্ত ঘরের কাজ সেরে যখন মা ঘরে এসে বিছানা নিতেন তখন আমরা ঘুমিয়ে কাদা। মা যে কখন তাঁর স্নেহের-আদরের স্পর্শ আমাদের মাথায় বুলিয়ে দিতেন টেরও পেতাম না। ঠিক অবনীন্দ্রনাথের "খাতাঞ্চির খাতায়" যেমন বর্ণনা আছে ঠিক তেমনি করে—"ছেলেরা যদি জেগে থাকতে পারতো তবে তারা দেখতে পেত। সব কচি ছেলেকে তাদের মা চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়িয়ে আস্তে আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে সবার মনের মধ্যকার ছোট খাট সিন্দুকগুলি খুলে পরের দিনের জন্য বেশ করে গুছিয়ে রাখছেন—ঠিক যেন তাঁর পেটরার কাপড় গোছান হয় তেমনি। সমস্ত দিন খেলায় ধুলায় ছেলেরা যে কোথায় কি ছড়িয়ে ফেলে তা তাদের মনেও থাকে না। মা সেগুলি যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দেন মনের সিন্দুকে যদি কোথাও পোকার মত দুষ্টবুদ্ধি দেখেন তো মা সেটি আস্তে আস্তে টেনে ফেলেন ; ভাল বুদ্ধিগুলিকে যত্ন করে কাগজে মুড়ে মখমলের কাপড়ের মধ্যে ঝেড়ে ঝুড়ে পোঁটলা বেঁটে তুলে রাখেন"—আমার মা বুঝি আমার সেই সব দুষ্টু বুদ্ধি বাছবার সময় হঠাৎ তাঁর আদরের আতিশয্যে জেগে উঠতাম তাই সেগুলো ঠিক মত আর বাছা হত না। তার কারণ ছিল সারাদিন মা থাকতেন সংসারের কাজে ব্যস্ত তাই আমরাও মাকে পেতাম না—মা-ও আমাদের একটু বুকে নিতে পারতেন না।

মা যে বাড়িতে আছেন সেটা প্রথম অনুভব করলাম যখন মা হঠাৎ চলে গেলেন চিরদিনের মত। আশ্চর্য—মা চলে যাওয়ায় যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা—যেন একেবারেই অসহ্য। বাড়ীর সবাই যেন কেমন মুসড়ে পড়লেন। মা'র শোকেই প্রায় ঠাকুমা অধীর হয়ে পড়লেন। বাবা কেমন মন-ভেঙে পড়লেন—বড়দির বিয়ে অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। মেজদির বিয়ে হয়ে গেল। আমরা ক'জন ছেলেপুলের অভিভাবক ছোড়দি—সে আমাদের চেয়ে কিছু বড়। কাজেই আমাদের বাড়ির অবস্থা যাকে বলে লক্ষ্মীছাড়া তাই। মা'র জন্য আমার ভারী কান্না পেত। মাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম—

"কুয়াশাতে দিক ছেয়েছে নিথর শীতের রাত
চাঁদ ডোবা এক নিতল কালো
দূর শ্মশানে চিতার আলো
মরণ বুড়ি বাড়ায় যেন শীতল দুটো হাত
ঘুম ভাঙা সেই ভয়ের মাঝে তখন খুঁজি কাকে ?
ছোট্টবেলায় হারিয়ে যাওয়া সেই যে আমার মাকে।"

(হারিয়ে যাওয়া মা)

দিনাজপুরের বাড়ির পিছনে ছিল ঘন ছায়া আম বাগান, খিড়কির ওপার থেকে আসতো বাতাবী ফুলের গন্ধ। ঠাকুমার ভারি আচার কাসুন্দির করবার বাতিক ছিল। সেগুলো সব সময়েই রোদে শুকোতো আর আমরা তার ওপর ডাকাতি করতাম ঠাকুমাকে চটাবার জন্যে। ঠাকুমা রেগে গিয়ে না বকলে আমাদের ভাল লাগতো না। নইলে ইঁদারার পাশে বাড়ীর ঝি বুধনী কানে বড় বড় রূপোর গয়না পরে বিকৃত মুখে বাসন মাজতো তারও পেছনে লাগতাম। আমাদের বড়দা নিখিলের গান বাজনার ভারি সখ ছিল। তার সঙ্গীত চর্চার কর্ণপটাহবিদারী শব্দে বাড়ীর সকলেই অস্থির হয়ে পড়তো। তাঁর ছিল প্রবল থিয়েটারের সখ—বাঁশী বাজানর সাধ ; আরো অনেক কিছু। থিয়েটারের কল্যাণে বোনেদের এবং বৌদির কত শাড়ী গেছে তার হিসেব নেই।

আমি আর মেজদা ছিলাম একেবারে ভিন্ন ধরনে। মেজদা বরাবরই পড়াশুনা বিশেষ করে অঙ্কে পারদর্শী—। মনে পড়ে স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসবের কথা আমি আর মেজদা এত পুরস্কার পেতাম যে বাড়ীর চাকর দিয়ে বয়ে আনতে হতো। গুড কণ্ডাক্টের পুরস্কার থেকে প্রায়

সবই আমরা নিয়ে নিতাম। সবাই বলতো সব পুরস্কার কি তোমরাই নেবে ?

মেজদা পড়তো বিজ্ঞান আমি সাহিত্যের ছাত্র। আমি ছোটবেলা থেকে একটু আত্মমগ্ন ধরনের। আমি বাবা মা'র অষ্টম গর্ভের সন্তান। সরস্বতী পুজোর পরদিন আমার জন্ম। বাবা মা'র ধারণা বিশেষ করে অষ্টম গর্ভের সন্তান—স্বল্পায়ু হয়। আর আমি ছোটবেলায় উত্তরবঙ্গের ম্যালেরিয়ায় একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। বাঁচবার কোন আশাই আমার ছিল না। বাবা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে আমাকে বেলুড়ে কিছু দিন রাখবার ব্যবস্থা করলেন। তখন বেলুড় ভারি সুন্দর ছিল। পাশে গঙ্গা—স্বামীজীরা বললেন : গঙ্গার হাওয়া বাতাসে ওর শরীর তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে। আমি ওখানে সবার যে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি তার তুলনা নেই—শিবানন্দ স্বামীজী—মহাপুরুষ মহারাজ নামে যিনি জ্ঞাত, তাঁর আশীর্বাদ আর স্নেহচ্ছায়ায় আমি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠলাম। আমার হাতের লেখা ছোটবেলা থেকেই খুব ভাল। তিনি আমাকে দিয়ে ওখানকার প্রকাশিত পত্রিকার নানা চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়াতেন। আমাকে ডাকতেন "বাচ্চা-সন্ন্যাসী" নামে। চিপিত্র লিখে শেষ করলে দু' পকেট ভর্তি বড় বড় ফেণী বাতাসা দিতেন। একটি দৃশ্যের কথা আমার মনে পড়ে—উনি মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন। তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুত। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। মানুষ এমন জ্যোতির্ময় হতে পারে ?—না দেখলে যেন বিশ্বাস করা যায় না। আমি তাঁর কাছে দীক্ষা পাই।

ওখানে থেকেই আমার ম্যালেরিয়া পালিয়েছিল। আমি ভারি সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করলাম ওখান থেকেই।

বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ী ফিরে আবার সেই নিঃসঙ্গ নিরালায় সাহিত্য সাধনা চলতে লাগলো। সাধনা নীরবেই চলছিল হঠাৎ একদিন বাচ্চু এসে পড়লো। আমার লেখার প্রথম গুণ-মুগ্ধ পাঠক। আমার একটা লেখার কথা "গল্প লেখার গল্পে" উল্লেখ আছে আর একটি গল্প যার মধ্যে আমার ছেলেবেলার দুষ্টু বুদ্ধির ছাপ আছে।

এক ডাক্তারের চেম্বারে এক রুগী এলো। তার এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ডাক্তার তখন অন্য রুগী দেখছেন। ওই রুগীর দিকে ফিরেও তাকালেন না। লোকটা চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু ডাক্তার তার দিকে কোনই নজর দিলেন না। শেষে বিনা চিকিৎসায় লোকটা মারা গেল।

একদিন ডাক্তার রুগী দেখছেন বুকে টেথোস্কোপ লাগিয়ে একটা অদৃশ্য হাত তার টেথোস্কোপ টেনে ফেলেছিল। কম্পাউন্ডার ওষুধ করছেন ওষুধে কে যেন পারগেটিভ মিশিয়ে দিল। এমনি করে সে লোকটার প্রেতাত্মা ডাক্তারকে নাজেহাল করে কাঁদিয়ে ছাড়লো।

লেখার মধ্যে নানা দুষ্টু বুদ্ধি তখন থেকেই আমার মাথায়। পরবর্তী কালে আমার লেখায় এরা এসে হাজির হয়েছে বিশেষ করে ছোটদের লেখায়।

ছোট বেলাতেই আমি রাজনীতিতে যোগ দেই। প্রথম প্রথম দাদাদের কাছে নানা রকম সাহসের পরীক্ষা দেওয়া ; বাজেয়াপ্ত বই লুকিয়ে সরবরাহ করা এবং নিজে পড়া। অন্য বাড়ী হলে এক কথা। পুলিশের দারোগার বাড়ীর ছেলের পক্ষে এ সব কাজ করা গুরুতর অপরাধ বৈকি !

আমার বাবা ছিলেন আশ্চর্য একটি মানুষ। এ সব তিনি জানতেন তবু কখনও আমাকে বারণ করেননি। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। একদিন সকালে বাড়ী ঘিরে ফেললো পুলিশ। আমরা বই কাগজপত্র লুকোবার সময় পেলাম না। কি করে ছোট বোন আনু আর ডাবু কিছু কিছু বুকের ভেতর করে পাচার করলো। কিন্তু বেশীর ভাগই বাড়ী-তে রয়ে গেল। আমরা গত্যন্তর না দেখে উঠোনের মাঝখানে রাখা উঁচু খড়ের তলায় চাপা দিয়ে রাখলাম। বাড়ীতে পুলিশ এলো সার্চ করলো—কিন্তু উঠোনের ওপর নিজেদের টুপি খুলে রেখে।

কাজেই কিছুই পাওয়া গেল না। বেশ মনে আছে আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে বেদম প্রহার করেছিল। বাবা থানার ঘরে জানালার কাছে বসে পেছন ফিরে থেকেছেন। একবারও বলেননি আর মেরো না ছেড়ে দাও আমার ছেলেকে।

মনে আছে মার খেয়ে আমার জ্বর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এত মার দিয়েও একটি কথা বের করতে পারেনি মুখ দিয়ে।

ঠাকুমা কেঁদে পড়েছেন : তুই কেমন বাবা ? ছেলেটাকে এত মার মারলো তুই বসে বসে দেখলি। কিছু বললি না। বাবা মুখ ঘোরালেন—মার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন : অন্যের ছেলেদের যখন এমনি করে থানায় এনে পিটাই ; তখন ?—

সাহিত্য চর্চা কিন্তু থামেনি। চলছেই—কবিতা লিখি। আস্তে আস্তে বয়েস বাড়ছে। সাপ্তাহিক "দেশে" আমার কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তৎকালীন "দেশে"র সহ সম্পাদক। "দেশ" আমাকে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। ব্রজমোহন কলেজে আই. এ. পড়ি তখন দেশ গল্প চেয়ে চিঠি দিল। উত্তর দিলাম—

গল্প লিখবো। কি গল্প লিখবো। অথচ "দেশ" লেখা চেয়েছে দিতেই হবে। ফরিদপুরে থাকতে কিছু কিছু গল্প লিখেছি। সেগুলো নিতান্তই বালখিল্যের হাতমক্স করা। অথচ মনের ভেতর দারুণ আত্মপ্রকাশের বেদনার যন্ত্রণা বোধ করছি। মনটা ছিল তখন প্রচণ্ড রোমান্টিক ধরনের কারণ বয়েস তখন সতোরো কি আঠারো। দেশের পাতায় আমার "নিশীথের মায়া" বেরুল।

লেখা সবারই ভাল লাগলো। এবার জোয়ার এলো মনের গাঙে—দেশ থেকে বিচিত্রা—বিচিত্রা থেকে শনিবারের চিঠি। শনিবারের চিঠির সজনীদার স্নেহ ভোলবার নয়।

জীবনের সবার কাছ থেকে অজস্র স্নেহ ভালোবাসায় আমি ধন্য হয়েছি। তিরস্কারের চেয়ে পুরস্কারই লাভ করেছি বেশী—সে পুরস্কার এ পৃথিবীর আপামর জনগণের অকৃপণ ভালোবাসা-যা আমার জীবনে দুর্লভ প্রাপ্তি।

www.boiRboi.blogspot.com

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900